ধনবিজ্ঞানে সাক্রেতি

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত এম এ, বি, এল,
অ্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট ; বি সি এস (জুডিসিয়াল) ;
ধনবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, ডায়োসেশান কলেজ,
কলিকাতা ; বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ,
রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটি
প্রভৃতির সভ্য

কলিকাতা
১৩৩৮

প্রকাশক—শ্রীমাখমলাল পিপ্‌লাই
নিউ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী
২৫।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য দুই টাকা

কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
প্রিণ্টার—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৩০নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

আমার ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা সুরু হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের বি এ শ্রেণীতে। আধুনিক জীবনে ধনবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা শৈশব হইতে আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাছে শুনিতাম। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অধিকতর অনুরাগ থাকিলেও, প্রধানতঃ তাঁহার বিরাগভাজন হইবার ভয়েই ধনবিজ্ঞানে 'অনার্স' পড়িতে আরম্ভ করি। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শেষাশেষি আমার ধনবিজ্ঞান-পাঠে ধৈর্য্য প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া ধনবিজ্ঞানে 'অনার্স' ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা করি। কিন্তু পরলোকগত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাধা দেওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। দুই বছর ধনবিজ্ঞান পড়িবার পরও ধনবিজ্ঞানের প্রতি তেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করি নাই। ধনবিজ্ঞানকে তখন কতকগুলা নীরস সূত্র বা মতের সমষ্টি বলিয়াই মনে হইত। প্রধানতঃ এই কারণেই এম এ পড়িবার সময় ধনবিজ্ঞানের "এ" বিভাগ (ইহাতে ধনবিজ্ঞানের ভাগ বেশী) না লইয়া "বি" বিভাগ (ইহাতে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের ভাগ বেশী) লই।

এম এ পাশ করিবার পর যখন "ল" কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম, তখন ভবানীপুরে একদিন সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের গৃহে এক খণ্ড "আর্থিক উন্নতি" দেখি। তখন "আর্থিক উন্নতি" সবে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাখানির আলোচনা ও তথ্য-সমাবেশের প্রণালী দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হই এবং উহার সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মল্লিক এম এ, বি এল মহাশয় তখন বিনয়বাবুর ছাত্র ছিলেন। ইঁহারই মধ্যস্থতায় একদিন বিনয়বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। বিনয়বাবু তখন জনকয়েক এম এ, বি এল পাশ যুবকের ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা পরিচালিত করিতেছিলেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর এই আড্ডায় ভিড়িয়া যাই এবং আমার ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার আর এক দফা আরম্ভ হয়।

এইবার যে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহার মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলির অথবা ঐ ধরণের বইয়ের স্থান ছিল না বলিলেই চলে। বিনয়বাবুর টোলের বিধানে, প্রায় প্রত্যহ ঘণ্টা দুই করিয়া "কমার্শ্যাল লাইব্রেরী"তে কাটাইতাম। "কমার্শ্যাল লাইব্রেরী"তে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, ব্যাঙ্কিং, বীমা, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় প্রায় ৩০০।৪০০ পত্রিকা দুনিয়ার নানা স্থান হইতে আসিয়া জুটে। এই সব পত্রিকার কোনটি দৈনিক, কোনটি সাপ্তাহিক, কোনটি মাসিক, কোনটি বা ত্রৈমাসিক। পত্রিকাগুলা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া সমসাময়িক আর্থিক জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতাম। মনে পড়ে, প্রথম দিনই আরম্ভ করি বিলাতী মাসিক "বৃটিশ ট্রেড্ রিভিউ" লইয়া। ইহাতে শেফিল্ডের ছুরী-কাঁচির ব্যবসা, চীনে বাইসিক্‌লের ব্যবসা ও যুদ্ধের পর বিলাতে স্বর্ণ-মান প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক খবর পাই। তাহার পর কোন দিন সাংহাইয়ের "ফার ইষ্টার্ণ রিভিউ" পড়িয়া চীনে কাপড়ের কলের নানা তথ্য পাইলাম, কোন দিন মার্কিণ দ্বৈমাসিক "ওয়েষ্টিং হাউস ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল" পড়িয়া বৈদ্যুতিক রেলওয়ের বিস্তারের বিবরণ পড়িলাম, কোন দিন বা "নিয়ার ইষ্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া" পড়িয়া রুম্যানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, টার্কি প্রভৃতি দেশের আমদানি-রপ্তানি, মুদ্রা-ব্যবস্থা ও কৃষি-শিল্পের

কথা জানিয়া লইলাম, কোন দিন বা মার্কিণ পত্র "আমেরিকান এক্সপোর্টার" পড়িয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি রপ্তানির পরিমাণটা দেখিয়া লইলাম। একদিন হয়তো বিলাতের বস্ত্র ও কয়লা-শিল্পের সঙ্কটের কথা পড়িলাম, আর একদিন হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের মোটর-শিল্পের কথা পড়িলাম, কোন দিন বা দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থাটা কিরূপ তাহা জানিয়া লইলাম। যে সব তথ্য, সংখ্যা, মতামত বা খবরাখবর বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হইত, সেইগুলা সংক্ষেপে টুকিয়া লইতাম, পরে বাড়ী আসিয়া সেগুলা অবলম্বন করিয়া বাংলায় প্রবন্ধ বা 'নোট' লিখিতাম।

"আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ" (মার্কিণ ত্রৈমাসিক), "ইকনমিক জার্ণ্যাল" (বিলাতী ত্রৈমাসিক), "জ্যার্ণাল অব পোলিটিক্যাল ইকনমি" (মার্কিণ ত্রৈমাসিক, শিকাগো হইতে প্রকাশিত), ধনবিজ্ঞান-জগতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। ঐ পত্রিকাগুলির কোন নূতন সংখ্যা আসিলেই তাহা আমার হাতে পড়িত। আর প্রত্যেক সংখ্যাতে যে সব প্রবন্ধ ভাল লাগিয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম বাংলায় লিখিয়া ফেলিয়াছি। "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"র কোন সংখ্যা নাড়িতে নাড়িতে হয়তো দেখিলাম "যুক্তি-যোগ ও বেকার-সমস্যা" সম্বন্ধে উহাতে একটি সুযুক্তিপূর্ণ রচনা আছে। প্রবন্ধটি হইতে কয়েকটি দরকারী কথা ও সংখ্যা টুকিয়া লইলাম।

এইরূপ আর এক দিন হয়তো "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল কটন বুলেটিনের" এক সংখ্যা-সংগ্রহ একত্র সন্নিবিষ্ট দেখিলাম। কোথাও কোন লেখকের কোন বক্তব্য নাই, কেবল পাতার পর পাতা নানা সংখ্যায় ভরা! ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সে "ধূল পরিমাণ!" কোন্ দেশ কত তুলা উৎপন্ন করে, কতটা রপ্তানি করে, কতটাই বা আমদানি করে—এ সম্বন্ধে নানা সংখ্যার অপূর্ব্ব সমাবেশ। এক একটি সংখ্যা-তালিকার শিরোনামা দেখিলাম। যে

কয়টি সংখ্যা-সংগ্রহ প্রয়োজনীয় বুঝিলাম সেগুলা টুকিলাম। বাড়ীতে সেইগুলা লইয়া চিন্তা করিতে থাকিলাম।

ধনবিজ্ঞানের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকার নাম আগেই করিয়াছি। এই সব পত্রিকার প্রতি সংখ্যায়, নব প্রকাশিত গ্রন্থগুলার মধ্যে যে কয়টা উল্লেখ-যোগ্য, সেগুলার সারমর্ম্ম ও সমালোচনা নিয়মিত ভাবে বাহির হয়। এই সব সমালোচনা-প্রবন্ধও নিয়মিত ভাবে পড়িতাম। ইহার ফলে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলার সারমর্ম্ম আয়ত্ত হইত। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থগুলার দোষগুণও বিশদ ভাবে জানিতে পারিতাম। এই উপায়ে, জার্ম্মাণীর মজুর-সভা, জাপানের শিল্পোন্নতিতে জাপানী সরকারের প্রয়াস, বিলাতের কয়লার খনির অবস্থা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কিং প্রণালীর গলদ ও তাহা সারাইবার উপায়, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক নূতন কথা জানিয়াছি। বড় বড় ট্রাষ্টগুলাকে সরকারী শাসন ও আমলে আনিবার জন্য আধুনিক দুনিয়ার প্রয়াস, অষ্ট্রেলিয়ার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা, ভারতের লোক-সংখ্যা সমস্যা, যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান নিবারণের ফলাফল, সহুরে জীবনের সু-কু—এই সব বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ তথ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমালোচনা-প্রবন্ধ পড়িয়া জানিয়াছি।

এ পর্য্যন্ত যে বিবরণ দিলাম, তাহা কেবল পড়াশুনা-সংক্রান্ত। বাংলা দেশের আর অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশের দৈনিক সাপ্তাহিক ইত্যাদি কাগজও পাঠচর্চ্চায় বাদ পড়ে নাই। কিন্তু আমার কাজ কেবল লেখাপড়ার গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। কলকারখানা দেখিবার সুযোগ পাইলেই তাহা কাজে লাগাইয়াছি। এইরূপে তেলের কল, চালের কল, ময়দার কল, মোজাগেঞ্জীর কল, কয়লাকাটার কল, বয়লার ও এঞ্জিন, পাওয়ার হাউস প্রভৃতি দেখা হইয়াছে। যখনই ঐ সব কলকব্জা দেখিয়াছি, তখনই যাঁহারা ঐ সব কলকব্জার পরিচালনা বুঝেন, তাঁহাদের সহিত কলকব্জার পরিচালনা প্রণালী, উহাদের পরিচালনের খরচা, মাল

উৎপাদনের খরচা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানের চাষের প্রণালী জানিতে চেষ্টা করিয়াছি। চাষী ও মজুরদের দৈনন্দিন জীবনের সংস্পর্শে আসিবার অনেক সুযোগ জুটিয়াছে।

আমার সহযোগিদের মধ্যে,—সকলেই বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষক নামে পরিচিত,—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় তত্ত্বনিধি বি এ মহাশয় রাজস্ববিজ্ঞান ও ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক লইয়া মাথা খাটাইয়া থাকেন, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম এ, বি এল মহাশয় অন্যান্য কাজের সঙ্গে বিশেষ ভাবে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনুসন্ধান গবেষণা চালাইতে অভ্যস্ত, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে এম এ, বি এল মহাশয় রিকার্ডোর তর্জ্জমা করিতেছেন। তাহা ছাড়া দেশী-বিদেশী অন্যান্য দিকেও তাঁহার চোখ আছে।*

ইঁহাদের সঙ্গে যখনই দেখা ও কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তখনই ইঁহারা নিজ নিজ অর্জ্জিত বিদ্যা, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, কিছু কিছু ছড়াইয়াছেন, আমিও ইঁহাদের প্রয়োজনীয় কথাগুলা নিজ জ্ঞান-ভাণ্ডারে জমাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। যখনই কোন বিষয়ে কিছু লিখিতে গিয়াছি, তখনই আমার মতামত কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া বাজাইয়া লইয়াছি। অধিকন্তু, কোনো কোনো বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার ফলে। সন্ধ্যার সময় গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে খাইতে প্রকাশ বাবুর সঙ্গেও দিনের পর দিন অনেক কথা হইয়াছে।

আলাপ আলোচনা সকল সময়েই যে সমানে সমানে চলিয়াছে, তা

* সুধাবাবুর একটা লেখা বর্ত্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা গেল। তাহাতে আমার নিজের একটা অনুসন্ধান সম্পর্কে বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষণা-প্রণালীর বিবরণ আছে।

নয়। যাঁরা আমার চেয়ে বয়সে, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় বড় এইরূপ অনেকের সঙ্গে সুযোগ পাইলেই মানসিক পাঞ্জা কষাকষি করিয়াছি। কয়লার খনির মজুরদের উন্নতির জন্য কি করা উচিত, এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সহিত বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষদের এক খোলা বৈঠকে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের বাড়ীর বারান্দায় একদিন কথা কাটাকাটি হয়। তাহাতে উপকার হইয়াছে যথেষ্ট। ৺মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের সঙ্গেও বিনয়বাবুর বাড়ীতে আলোচনার সুযোগ পাইয়াছি। তিনি আর্থিক ভারতের ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে আমার নজর সজাগ রাখিবার কাজে সাহায্য করিয়াছেন বলিতে হইবে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় বাংলার জমিজমার আইন কানুন লইয়া অনেক দিন ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৯২৮ সনের সংশোধনের ফলে বাংলার রাইয়ত ও কোর্ফা রাইয়তদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল, তাহা লইয়া শরৎবাবুর সঙ্গে আলোচনা হইয়াছে। স্বাস্থ্য-তত্ত্ব লইয়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র উকীল মহাশয়ের সঙ্গে, আমদানি-রপ্তানি সম্বন্ধে বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে, এবং ভারতীয় কৃষির উন্নতিতে বাধা সম্বন্ধে কৃষিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে কিছু কিছু আলাপ হইয়াছে। বিনয়বাবু যখন দ্বিতীয় বার ইয়োরোপে ছিলেন, সেই সময় বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষদের কোন অধিবেশনে গান্ধিজীর অর্থনৈতিক মতামত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভার আমার উপর পড়ে। আমার বক্তব্য শেষ হইলে পর নানা বিষয়ে সভ্যদের মধ্যে আলোচনা হয়। রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাশ মহাশয় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও আলোচনায় যোগ দেন এবং এমন কয়েকটি কথা বলেন, যাহাতে আমার মত আরও দৃঢ় হয় এবং নিজেকে বিশেষ উপকৃত বোধ করি। কুটীর

শিল্পে সমবায় প্রণালীর প্রয়োগে দরিদ্র মধ্যবিত্তদের কিরূপ আর্থিক সুবিধা হইতে পারে, এ সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার মিঃ কে সি বসুর সঙ্গে কখনও কখনও আলাপ হইয়াছে। কয়লার খনির খাদের উপর সন্ধ্যার সময় চায়ের টেবিলে বসিয়া শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে কয়লার খনি ও খনির মজুরদের সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য আদায় করিয়াছি। দেশ ও দুনিয়া সম্বন্ধে নানা উপলক্ষ্যে স্বয়ং বিনয়বাবুর সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র বিষয়ক বহু কথাই তাহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

১৯২৯ সনে ডায়োসেশনে কলেজে ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হই। অনেক দিন পরে তখন সেলিগ্‌ম্যান, টাওসিগ্, মার্শ্যাল, চ্যাপ্‌ম্যান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বইগুলা আবার হাতে আসিল। ধনবিজ্ঞানকে তখন নূতন ভাবে জানিতে এবং নূতন ভাবে বুঝিতে শিখিয়াছি। ধনবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলা তখন এক নূতন মূর্ত্তিতে আমার সামনে দেখা দিল। 'টেক্‌ষ্টবুক'গুলার ভিতর গ্রন্থকারেরা কোথা হইতে কোন্ তথ্য আনিয়া গুঁজিতে অভ্যস্ত, তাহা ইতিমধ্যে আমার অনেকটা জানা হইয়া গিয়াছে। নামজাদা লেখকদের ভিতরকার কথাও কিছু কিছু নিজ অভিজ্ঞতায় আসিয়া হাজির হইয়াছে। কাজেই বড় বড় বই দেখিবামাত্র আঁৎকাইয়া উঠিবার কারণ আর ছিল না। এই নতুন আবহাওয়ায় এক বছর ধনবিজ্ঞানে অধ্যাপনা করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি আর কিছুতে ততটা আনন্দ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

মুন্সেফি কাজে ঢুকিয়াছি ১৯৩০ সনে। সময়ের অভাবে পড়াশুনায় এবং লেখার ভাগটায় কিছু কম্‌তি পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার কম্‌তি পড়িয়াছে মনে হয় না। বরং, নিজের কাজের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই ধনবিজ্ঞানের মালমশলা ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছি। মনে হয় যেন একটা বিরাট আর্থিক লেবরেটারীর ভিতর দিবারাত্র চলা-ফেরা

করিতেছি। বাংলার রাস্তাঘাট ও যানবাহন, মজুর-চাষী, স্কুল মাষ্টার, কেরানী, ডাক্তার, উকীল প্রভৃতির আয়-ব্যয়, জেলাবোর্ড, লোক্যালবোর্ড, ইউনিয়ান বোর্ড প্রভৃতির গড়ন, কার্য্যক্ষমতা ও কার্য্যপ্রণালী, এই সব বিষয়ে নূতন নূতন তথ্য মস্তিষ্কে আসিয়া জমিতেছে। সমবায় ব্যাঙ্কিং, চাল-ডাল-দুধ প্রভৃতির বাজার দর, সুদের হারের উঠানামা ও স্থানভেদে তারতম্য, জমিদার প্রজার সম্বন্ধ, বাংলার জমিজমার আইন কানুনের সু-কু, প্রভৃতি বিষয়ে দেখাশোনা, চিন্তা ও বোঝাপড়া অনুক্ষণ চলিতেছে। বাংলার পল্লীজীবন বলিতে ঠিক কি জিনিষটি বোঝায়, বাংলার কুটীরশিল্পীদের সাংসারিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য কিরূপ, বাংলার পল্লীজীবনের উপর রেল, ষ্টীমার টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রভাব কি, এসব বিষয়েও সর্ব্বদাই নূতন নূতন তথ্য আমার অভিজ্ঞতার সীমানার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতেছে। তাহার উপর, বাংলা দেশের জেলায় জেলায় তথাকথিত ছোট জাত কেমন আস্তে আস্তে বড় জাতে পরিণত হইতেছে, অবাঙালীও বোধ হয় বাঙালী বনিয়া যাইতেছে, তাহাও একটু আধটু করিয়া মাথায় ঠাঁই পাইতেছে। চোখের সম্মুখে একটা আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব যেন বহিয়া যাইতেছে। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সূত্রপাত। আলাপ-আলোচনার পালাও শেষ হয় নাই। আরামবাগে মুন্সেফবাবুর বাসায় সন্ধ্যার সময় নানা গল্প গুজবের মধ্যে হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের কাছে তথাকথিত ছোট লোকদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিয়াছি, এবং গোপালগঞ্জে (ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে করিতে পূর্ব্ববঙ্গের সমবায় ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার পাল এম এ, বি এল মহাশয়ের সঙ্গে "কৃষির উন্নতির উপায়", "মেয়েদের চাকরি করার সু-কু" "ভারতে জন্ম-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া ভাল কিনা," "বাংলার পল্লীজীবনে

গ্রাম্য মহাজনদের প্রকৃত স্থান", "ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা"—এইরূপ নানা আর্থিক বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। ব্রজেনবাবু ধন-বিজ্ঞানের "ছাত্র" ছিলেন না। কিন্তু, তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বিশেষ প্রখর। চিন্তাশীলতায়ও তাঁহার মৌলিকতা আছে। এই জন্য তাঁহার নিকট অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং অনেক জিনিষ নূতন ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে শেখা হইয়াছে।

গত ৩।৪ বৎসর এইরূপ নানা প্রণালীতে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা চলিয়াছে। যাহা কিছু জানিয়াছি, বুঝিয়াছি, দেখিয়াছি, শুনিয়াছি সব কিছুই প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করা সম্ভব হয় নাই। যে সব লেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ মাত্র এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। যাহা হউক, দেশী বিদেশী পত্রিকা পাঠ, মোলাকাৎ আর পর্য্যটন—এই হইতেছে ধনবিজ্ঞানে আমার হাতে খড়ি। বইয়ের নাম এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। এই গ্রন্থের প্রায় সব কয়টা প্রবন্ধই "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়ার জন্য "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এবং উহার পরিচালক ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশ মহাশয়ের সাহায্য বিনা এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। তাঁহাদের সাহায্যের জন্য তাঁহাদের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বইখানি আগাগোড়া কথ্য-ভাষায় লেখা। আমার ধারণা, কথ্য-ভাষায় আলোচনা চালাইলে ধনবিজ্ঞান অনেকটা সহজবোধ্য ও সরস হয়। এই ধারণা কতদূর সত্য, তাহার বিচারের ভার ধনবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর রহিল।

"বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েজ্ এম্প্লয়িজ্ জার্ণ্যাল" নামক শ্রমিক পত্র,

"ডায়োসেশান কলেজ ক্রনিকল্," "জার্ণ্যাল অব্ দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স", রামকৃষ্ণ মিশনের ইংরেজী মাসিক "প্রবুদ্ধ ভারত" প্রভৃতি পত্রিকায় আমার কয়েকটা ইংরেজী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। "প্রবুদ্ধ ভারতে" মহাত্মা গান্ধী ও অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের অর্থ-নৈতিক মতামত সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছি। সেইগুলা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বাহির হইতেছে।

যশোহর,
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩১

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভারতে বৈদেশিক মূলধন	১
সমবায়ে দোকানদারি	১০
ক্যাপিট্যাল লেভি (সম্পত্তির ওপর চড়া হারে এককালীন কর)	৩৯
ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার বর্ত্তমান ঝোঁক্ কোন্ দিকে	৪৪
মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেকার-সমস্যা	৪৬
ভারতের লোকসংখ্যা-সমস্যা	৫১
সংরক্ষণশুল্কের কুফল	৫৪
র‍্যাশনালিজেশান ও বেকার-সমস্যা	৬১
১৯১১ সনের ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন	৭০
মূলধনের যোগান	১০২
ফ্যাক্টরী-সঙ্ঘ লাভবান্ হয় কখন ?	১০৭
বৈদ্যুতিক রেলওয়ে-বিস্তার অবশ্যম্ভাবী	১০৯
আসামের চা শিল্প	১১১
বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ	১১৭
কয়লার খনির মজুর	১২৭
কিস্তিবন্দিতে ক্রয়-বিক্রয়	১৫৮
ব্যাঙ্ক-যোগে যুবক বাঙলা	১৬৪
বৃটিশ শিল্প-প্রদর্শনীর জন্ম-কথা	১৮৮
বার্ম্মিংহাম চেম্বার অব কমার্স	১৯২

বিষয়	পত্রাঙ্ক
জার্ম্মাণ মজুরদের "কর্ম্ম-সভা"	১৯৫
ব্রজেন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক মতামত	১৯৯
মার্কিণ শিল্পগুলার কি দুর্দ্দিন উপস্থিত ?	২০৫
ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর বিলাতের শিল্পসমূহ	২০৭
রুশিয়ার 'গসপ্ল্যান'	২১২
বাঙ্গালীর দারিদ্র্য ও তাহার প্রতীকার	২১৯
অষ্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রকর্ত্তৃক মজুরি-নির্দ্ধারণ	২২৭
ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা	২৪৬
নয়া বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি ও অর্থশাস্ত্র	২৫১
ডায়োসেশান কলেজের ধনবিজ্ঞান-সমিতি	২৭০
কারখানা-শিল্প বনাম কুটীর-শিল্প	২৭৪
বাংলাদেশের রাস্তা-সমস্যা	২৯৬
বিলাতের বেকার-সমস্যা	৩০১
ম্যালেরিয়া-নিবারণী-সমিতি স্থাপনের সুফল	৩০৭
সংরক্ষণ শুল্ক ও মার্কিণ শ্রমিক-সঙ্ঘ	৩১১
সোহ্বিয়েট রুশিয়ার আর্থিক নীতি	৩১৩
স্থানবদ্ধ শিল্প-সমাবেশের সুফল	৩১৪
নিখিল-জগৎ বাণিজ্য-আদালত	৩১৭

ধনবিজ্ঞানে সাকরেতি

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

আমরা এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বর্ত্তমান জগতের আর্থিক জীবনধারার প্রণালী আয়ত্ত ক'রতে পারি নি। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে, বড় বড় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর দ্বারা যে ধনোৎপাদন ভারতের সর্ব্বত্র হচ্ছে, তার বেশীর ভাগের ওপরই আমাদের কোন হাত নেই। বড় বড় রেল কোম্পানী, ব্যাঙ্কিং কোম্পানী, বীমা কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী, চা বা কফির বাগান, নানা প্রকারের মাইনিং কোম্পানী—এ সকলের অর্থ প্রায় বিদেশ হতেই এসে থাকে। এ কথা যে খুবই সত্য, তার প্রমাণ হচ্ছে যে, বিদেশে রেজিষ্টারি করা যে সকল কোম্পানী ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৭৮০ কোটি টাকা (অবশ্য এর সমস্তটাই যে ভারতে খাটান হয়, তা নয়) আর ভারতে রেজিষ্টারি করা কোম্পানীগুলির মূলধন ১২৩ কোটি টাকা। আমরা বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটাতে সাহস করি না—বড় বড় আর্থিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিই কেবল আমাদের হাতে। জমিজমা কিনে, বাড়ী করে কিংবা গহনা কিনে আমরা টাকা আটকে রাখতেই ভালবাসি। নানাপ্রকারের কাঁচা মাল ভারতে প্রভুত পরিমাণে উৎপন্ন হ'লেও, ভারতে মজুরের অভাব না থাকলেও, আমাদের শিক্ষিতদের মগজে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকলেও, আমরা

বড় বড় কারখানা-শিল্পে টাকা খাটিয়ে দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়াতে অগ্রসর হই না। কারণ আমাদের অভাব প্রথমতঃ, আর্থিক বিষয়ের চিন্তা করবার শক্তির এবং দ্বিতীয়তঃ, বড় বড় কোম্পানী চালাবার উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ অব্যবহৃত হ'য়ে প'ড়ে থাকে নি। আমরা যে সুযোগ হারিয়েছি সেই সুযোগ বিদেশীরা নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। ফল হ'য়েছে এই যে, তাদের ক্রোর ক্রোর টাকা এই দেশে খাটছে, ক্রোর ক্রোর টাকা তারা লাভ ক'রে সাগরপারে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা হাতের কাছে লক্ষ্মী থাকলেও 'হা অন্ন হা অন্ন' করে মরছি।

অর্থনীতির দিক্ থেকে দেখলে বৈদেশিক মূলধন যে একেবারে অপকারী বিবেচিত হয়, তা মোটেই নয়। বরং আর্থিক বিষয়ে পশ্চাৎপদ কোন দেশের পক্ষে বৈদেশিক মূলধন একান্ত আবশ্যক, যদি সেই দেশকে আর্থিক হিসাবে আধুনিক জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। একটি অনুন্নত দেশের পক্ষে, আধুনিক কলকারখানার সাহায্যে কিরূপভাবে বিপুল পরিমাণ ধনোৎপাদন হয়, সেই বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব, যদি বৈদেশিক মূলধন এসে সে সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে সাহায্য না করে। আমরা আজ দেশে থেকেও কারখানাশিল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাচ্ছি, তা অসম্ভব হ'ত, যদি বিদেশীরা এই দেশে এসে নিজেদের টাকা খাটিয়ে ষ্টীমার, রেল, ব্যাঙ্ক, ট্রাম, এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে না তুলত। তা ছাড়া কারখানাশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে মজুরের সংখ্যা বাড়ে। কারখানার মজুরেরা চাষীদের চেয়ে বেশী সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ ক'রতে পারে। তারা বেশী বুদ্ধিমান হয় ও আধুনিক জীবনের মূল তত্ত্বগুলি সহজেই আয়ত্ত ক'রতে পারে। এই

সকল কারণে দেশের রাজনৈতিক উন্নতি আরও শীঘ্র হ'বার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বৈদেশিক মূলধন হ'তে আরও একটি বিশেষ উপকার হচ্ছে এই যে, নানাপ্রকার কলকারখানা দেশের মধ্যে ঐ মূলধনের সাহায্যে চল্‌তে থাক্‌লে নানাপ্রকার নতুন নতুন কাজকর্ম্মের সৃষ্টি হয়, সুতরাং দারিদ্র্য বা কর্ম্মশূন্যতা অনেক পরিমাণে ক'মে যায়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার দিক্‌ থেকে শেষোক্তটিই যে বিশেষ বাঞ্ছনীয়, তা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাঁর 'ইকনমিক্‌ স্কিম্‌ ফর্‌ ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন।

কিন্তু বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য নেওয়ার এক অপ্রিয় দিক্‌ও আছে। বিদেশীরা সাধারণতঃ টাকা ধার দিয়ে সুদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, তারা নিজেরাই টাকা খাটাতে চায়, আর যা লাভ হয় স্ব স্ব দেশে নিয়ে যেতে চায়, কিংবা সেই দেশেই আবার মূলধনরূপে খাটায়। নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা যে দেশে টাকা খাটাচ্ছে সেই দেশের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হয়। কারণ তাদের ভয় যে, সেই দেশ স্বাধীন হ'লে তাদের পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে ফিরে যেতে হ'বে। অনেক বছরের পরিশ্রমের ফলে যা কিছু গ'ড়েছিল সবই ছাড়তে হ'বে। বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে এ ছাড়া আরও কতকগুলি বিশেষ আপত্তির কথা আছে। বিদেশী কোম্পানীগুলি নিজেদেরই ডিরেক্টার মনোনীত ক'রতে চায়। তারা দেশের সামরিক হিসাবে প্রয়োজনীয় শিল্পগুলি নিজেদের আয়ত্তে এনে ফেলে। আর দেশের খনিগুলি—যা একবার ফুরুলে আর পূরণ করবার উপায় নেই—তাও তারা ক্রমে নিঃশেষ ক'রে ফেলে। এই সমস্ত আপত্তিই, ভারতে যে বৈদেশিক পুঁজি নিয়োজিত হ'য়েছে তার সম্বন্ধে অল্পবিস্তর খাটে।

বৈদেশিক মূলধন থেকে উপকার আমরা যথেষ্ট পাই। কিন্তু অপকারের দিক্‌টাও বড় কম নয়। সুতরাং আমাদের বিচার করা দরকার, কি ক'রে আমরা এর খারাপ ফলগুলি যথাসম্ভব এড়িয়ে একে আমাদের কাজে লাগাতে পারি।

এই দেশের ওপর বৈদেশিক মূলধনের আধিপত্যের (কণ্ট্রোল) তারতম্যের অনুসারে 'এক্‌সটারন্থাল ক্যাপিট্যাল কমিটি' বৈদেশিক মূলধনকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন :—(১) গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যে সমস্ত টাকা ধার করে আর জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর ডিবেঞ্চার প্রভৃতি। এই শ্রেণীর মূলধনের জন্তে পুঁজিপতি কেবল সুদ দাবী ক'রতে পারে। (২) বৈদেশিক পুঁজিপতিরা যে সমস্ত টাকা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা-বাণিজ্যে বা উৎপাদনে খাটায়। এই শ্রেণী ও পরবর্ত্তী শ্রেণীর জন্য পুঁজিপতিরা সুদের সঙ্গে লাভও পেয়ে থাকে। (৩) যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক পুঁজিপতিরা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা (যেমন 'বাউণ্টি') পেয়ে বা খনি কি বন প্রভৃতির অধিকার পেয়ে টাকা খাটায়।

প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। এই প্রকারের মূলধন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, আর এর পরিমাণও ক'মে আসছে। অবশ্য এই প্রকারের মূল্‌ধন কমিয়ে আনা একান্ত আবশ্যক না হ'লেও তিনটি কারণে অবাঞ্ছনীয় নয়। (ক) গবর্ণমেণ্টের বা মিউনিসিপ্যালিটির ঋণ দেশের লোকের হাতে থাকলে দেশবাসীর টাকা খাটাবার অভ্যাস বাড়বে। (খ) ঐ সকল ঋণপত্রগুলি ব্যাঙ্কের কাছে বাঁধা রেখে সহজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্তে আবশ্যক টাকার পরিমাণ বাড়াতে পারা যাবে। (গ) মুদ্রা-বিনিময়ের জন্তে যে লোকসান দিতে হয়, সেই লোকসানের হাত থেকেও অব্যাহতি পাওয়া

যাবে। এই তিনটি কথা ভেবে দেখলে মনে হয় যে, যদি দেশের ভিতর ধার ক'রতে কিছু বেশী স্থদও দিতে হয়, তা হ'লেও গবর্ণমেণ্টের ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পক্ষে দেশে ধার করাই ভাল।

বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে যে সব আপত্তির কথা বলা হ'য়েছে, সেগুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মূলধন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কারণ, এই দুই শ্রেণীর মূলধন পুঁজিপতিরা নিজেরাই খাটায়, স্থদের সঙ্গে লাভও আদায় করে, আর যে দেশে টাকা খাটানো হচ্ছে সেই দেশের ওপর ক্রমে ক্রমে প্রভুত্বও বিস্তার করে। আবার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মূলধনের মধ্যে ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলধনের পরিমাণই বেশী। এই জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধে 'এক্সটারন্যাল ক্যাপিট্যাল কমিটি'তে এই দেশের হ'য়ে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন যে, ভারতে যে সমস্ত নতুন জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী কারবার ক'রবে বা কারখানা খুলবে, তাদের সকলেরই এই দেশেই রেজিষ্টারি হওয়া দরকার এবং তাদের মূলধন এই দেশের মুদ্রাতেই প্রকাশিত হওয়া দরকার। অধিকন্তু তাদের নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক ডিরেক্টার এই দেশের লোক হওয়া এবং এদেশের লোকদের কলকারখানার কাজ শেখাবার জন্যে তাদের বাধ্য করবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রত্যেক কোম্পানীর শেয়ারের নির্দ্দিষ্ট অংশ কেবল ভারতীয়দের হাতেই থাকবে অথবা শেয়ারের আবেদন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কেবল ভারতীয়দের কাছ থেকেই নেওয়া হবে—শেয়ার সম্বন্ধে এই দুয়ের মধ্যে এক প্রকার বন্দোবস্ত করা উচিত। বৈদেশিক মূলধনের এদেশে আসবার পথে এই সকল বাধা সৃষ্টি ক'রবার কথার মূলে এই ধারণা রয়েছে যে, এ দেশে যে পরিমাণ মূলধন অনিয়োজিত হ'য়ে আছে, তার পরিমাণ সামান্য নয়। সুতরাং আমা-

দের দেশে কারখানাশিল্পের বৃদ্ধির জন্যে প্রধানতঃ দেশের পুঁজির ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। বৈদেশিক পুঁজি এ বিষয়ে কেবল গৌণ-স্থানই অধিকার ক'রবে। গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ দেশের মধ্যে ঋণ তুলতে পারছেন (১৯১৩ সন হ'তে ১০ বৎসরে এই ঋণের পরিমাণ ১৪৫ ক্রোর টাকা থেকে ৩৫৮ ক্রোর টাকায় দাঁড়িয়েছে), ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলির মূলধন যে পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে (১৯১৩ সন হ্তে ১০ বৎসরের এই মূলধনের পরিমাণ ৮০ ক্রোর টাকা থেকে ২৫৪ ক্রোর টাকায় দাঁড়িয়েছে), আর বৎসর বৎসর যে পরিমাণ সোনা রূপা ভারতে আমদানি হচ্ছে (১৯১৩ সন হ'তে ১০ বৎসরে ভারতে মোট ৪৮২ কোটি টাকার সোনা রূপা আমদানি হ'য়েছে), তাতে মনে হয়, মুখ্যতঃ দেশের মূলধনের ওপর নির্ভর ক'রবার আশা একেবারে আকাশকুসুম নাও হ'তে পারে।

'এক্সটারন্যাল ক্যাপিট্যাল কমিটি' কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলধনের সম্বন্ধে কোনরূপ সর্ত্তের বন্দোবস্তে রাজী ছিলেন না, তাঁরা বলেছিলেন, উপরিউক্ত সর্ত্তগুলি কাজে লাগানো অসম্ভব, আর যেখানে সম্ভব সেখানে ঐগুলিদ্বারা ভারতীয় পুঁজিপতিদেরই স্বার্থের হানি হবে। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে প্রধানতঃ এই কয়টি:—(১) ঐ সর্ত্তগুলি কার্য্যকর হ'তে পারে কেবল নতুন কোম্পানীগুলির সম্বন্ধেই, (২) জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর সংখ্যা ক'মে গিয়ে প্রাইভেট ফার্ম্মের সংখ্যা বেড়ে যাবে, (৩) ভারতীয়েরা শেয়ারের জন্যে বেশী হারে সুদ দাবী ক'রতে পারবে বটে, কিন্তু শেয়ার কেবল ভারতীয়দের কাছেই বিক্রী করা যাবে ব'লে শেয়ারের দাম ক'মে যাবে, এবং তা বেচাও শক্ত হবে, (৪) জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলিকে গবর্ণমেণ্টের কড়া

শাসনে থাকতে হবে, এবং (৫) অংশীদারদের ডিরেক্টার পছন্দ করার ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় উক্ত কমিটির মেম্বার ছিলেন। তিনি অধিকাংশ মেম্বারের সহিত তাঁর মতভেদ জানাবার সময় ঐ আপত্তি-গুলির কথাও আলোচনা ক'রেছিলেন। প্রথম আপত্তিটির সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, ঐ সর্ত্তগুলি অন্ততঃ ভবিষ্যতে যে সব নতুন কোম্পানী স্থাপিত হবে, সেগুলির সম্বন্ধে কার্য্যকর হবেই। সুতরাং বৈদেশিক-দের এদেশের ওপর যে আর্থিক আধিপত্য আছে, তা যাতে আর না বাড়ে, তা আমরা ক'রতে পারবো। প্রাইভেট ফার্ম্মের পক্ষে বড় স্কেলে ব্যবসা-বাণিজ্য করা অসম্ভব। সুতরাং দ্বিতীয় আপত্তিটিও ভিত্তিহীন। যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের শেয়ার ভারতীয়দের জন্যে না রেখে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে কেবল ভারতীয়দেরই শেয়ারের আবেদন গ্রাহ্য করা হয়, তা হ'লে তৃতীয় আপত্তিটির বিশেষ জোর থাকে না। চতুর্থ আপত্তিটি নিতান্তই অসার। দেশের লোক যদি চায় যে, গবর্ণমেণ্ট তাদের স্বার্থের জন্যেই কোম্পানীগুলিকে কয়েকটি ব্যাপারে শাসন ক'রবে, তা হ'লে সে বিষয় গবর্ণমেণ্টের বা কোম্পানী-গুলির আপত্তি থাকা উচিত নয়। পঞ্চম আপত্তিটিও অসার ব'লে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, উক্ত কমিটিই এক শ্রেণীর মূল-ধন (গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ-সাহায্যপ্রাপ্ত) সম্বন্ধে ঐ প্রকার ব্যবস্থা করতে দ্বিধা করেন নি। যাই হোক, দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলধন সম্বন্ধে অন্ততঃ যদি এই ব্যবস্থা করা যায় যে, (ক) এই প্রকারের কোম্পানীগুলিকে ভারতবর্ষেই রেজিষ্টারি ক'রতে হবে, এবং (খ) শেয়ারের আবেদন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে ভারতীয়দের কাছ থেকেই কেবল নেওয়া হবে, তা হ'লে, আমাদের মনে হয়, দেশের

স্বার্থও রক্ষা করা হ'বে, আর উপরিউক্ত আপত্তিগুলির একটিও খাটবে না।

তৃতীয় শ্রেণীর বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে উক্ত কমিটি প্রস্তাব ক'রেছিলেন যে, (ক) ঐ মূলধনে চালিত কোম্পানীগুলির নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ডিরেক্টার যেন ভারতীয় হয়। (খ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রবার জন্যে তাদের যেন বাধ্য করা হয়, এবং (গ) কোম্পানীগুলি যেন এই দেশেই রেজিষ্টারি করা হয় ও তাদের মূলধন যেন এই দেশের মুদ্রাতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ সর্ত্তগুলি কেবল যখন গবর্ণমেণ্ট কোন কোম্পানীকে অর্থ সাহায্য করেন তখনই প্রয়োগ ক'রলে যথেষ্ট হ'বে না; যে কোন কোম্পানী ভারতের সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধা ভোগ ক'রছে, তাদের সম্বন্ধে ঐ সর্ত্তগুলি প্রযুক্ত হওয়া দরকার। কারণ সংরক্ষণ-শুল্কের জন্যে আমরা চড়া দরে জিনিষ কিনতে বাধ্য হব, আর তার সমস্ত সুবিধা যদি এদেশীয়দের অধীন কোম্পানীগুলি ভোগ না ক'রে বিদেশীয় মূলধনে স্থাপিত ভারতস্থিত কোম্পানীগুলিই ভোগ করে, তা হ'লে সংরক্ষণ-শুল্কের একেবারেই কোন সার্থকতা থাকে না। উপরিউক্ত সর্ত্তগুলি আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে কতদূর যথেষ্ট সে সম্বন্ধেও আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। শ্রীযুক্ত ওয়াদিয়া ও যোশী তাঁদের 'ওয়েল্‌থ অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন যে, ঐ সর্ত্তগুলি মোটেই সন্তোষজনক নয়। এ দেশে রেজিষ্টারি করা হ'লেও কোম্পানীগুলির বেশীর ভাগ শেয়ারহোল্ডার বিদেশী হওয়া অসম্ভব নয়। বেশীর ভাগ শেয়ারহোল্ডার যদি বিদেশী হয়, তা হ'লে ভারতীয় ডিরেক্টারদের স্বাধীনভাবে কাজ করা অসম্ভব। আর কোম্পানীগুলি যদি প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক হয়, তা হ'লে কেবল নিয়মের চাপে তা দিতে বাধ্য করা অসম্ভব। এই

কথাগুলি ভেবে উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় প্রস্তাব ক'রেছেন যে, যদি সত্য সত্যই বিশেষ সাহায্য-প্রাপ্ত কোম্পানীগুলির লাভ যাতে ভারতের বাইরে না যায়, তা করতে হয়, তা হ'লে ঐ প্রকার কোম্পানীগুলির যাতে কোন বিদেশী শেয়ারহোল্ডার একেবারেই না থাকে সেইরূপ আইন করা একান্ত আবশ্যক।

যে কোন দেশের পক্ষেই বৈদেশিক মূলধন শাসন একটি মস্ত বড় সমস্যা। আবার যদি বৈদেশিক মূলধনের সহায়তা নিতে অনিচ্ছুক দেশটি পরাধীন হয়, তা হ'লে সমস্যা আরও গুরুতর হয়। সুতরাং (১) বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে যতদূর সম্ভব দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করা, এবং (২) বৈদেশিক পুঁজিপতিদের প্রভাব যাতে রাজনৈতিক উন্নতির অন্তরায় না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা—এই দুইটি লক্ষ্য স্থির রেখে বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে আমাদের একটি জাতীয় নীতি স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

সমবায়ে দোকানদারি

সমবায় ভাণ্ডারের অর্থ ও উদ্দেশ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমবায়-প্রণালীর উদ্ভব হ'য়েছিল আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্বল মানুষকে সবল ক'রে তোলবার জন্যে। যারা টাকার অভাবে চাষ ক'রতে বা পণ্য উৎপাদন ক'রতে পারছে না, তারা সমবেত হ'য়ে পরস্পরের দায়িত্ব পরস্পরের ঘাড়ে নিয়ে আবশ্যক টাকা সহজেই সংগ্রহ ক'রতে পারে। যারা শস্য উৎপন্ন ক'র্ছে বা বস্ত্র বা অন্য কোন জিনিষ প্রস্তুত ক'রছে তারা পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন ব'লে হয়ত উৎপন্ন জিনিষের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। তারা যদি পরস্পর মিলিত হ'য়ে একটি বিক্রয়-সমিতি স্থাপন ক'রে তার সাহায্যে বাজারে জিনিষ ঢালে, তবে সহজেই উপযুক্ত দাম আদায় ক'রতে পারে। যারা বিশেষ কোন আর্থিক অসুবিধা ভোগ ক'রছে তারা এই রকম ভাবে সমবায়-প্রণালীর সাহায্য নিয়ে সমবেত হ'য়ে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে সেই আথিক অসুবিধা সহজেই দূর ক'রতে পারে।

সমবায় ভাণ্ডার এই সমবায় প্রণালীরই একটি বিশেষ প্রয়োগ। ব্যবসাদার ও উৎপাদকের হাত থেকে অসঙ্ঘবদ্ধ খাদকদের বাঁচানো এবং তাদের বাঁচাবার জন্যে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রবার উপায়রূপেই সমবায় ভাণ্ডারের সৃষ্টি। ধরা যাক্ একটি গ্রামে একটি ছোট মুদির দোকান আছে। এই দোকানের দোকানদার হয়ত জিনিষ-পত্র তেমন খাঁটি দেয় না, ওজনেও হয়ত কিছু কম দেয়; কিন্তু খাদকরা তার বিরুদ্ধে

কিছু ক'রতে পারে না, কারণ তারা একতাবদ্ধ নয়। কিন্তু যদি তারা সকলে মিলে প্রত্যেকে কিছু কিছু শেয়ার ক্যাপিট্যাল দিয়ে এবং শেয়ার ক্যাপিট্যাল যথেষ্ট না হ'লে তার উপর কিছু ধারও নিয়ে একটি সমবায় ভাণ্ডার সমিতি খোলে, তা হ'লে ঐ ভাণ্ডার সমিতি কর্ত্তৃক স্থাপিত ভাণ্ডারটির রীতিমত দেখা-শুনা করা হ'লে জিনিষ-পত্র খাঁটি পাওয়া যাবে, ওজনেও কোন জুয়াচুরি থাকবে না। তা ছাড়া দোকানদার দোকান চালিয়ে যে লাভটুকু ক'রছিল সে লাভটুকু খাদকেরাই ভোগ ক'রতে পারবে। যদি মুদিটি সাধুও হয় অর্থাৎ যদি সে জিনিষ ওজনে ঠিক দেয় এবং তাতে নিজে কোন রকম ভেজাল না মেশায় তা হ'লেও ভাণ্ডার খুলে খাদকদের লাভ আছে। মুদি নিজে যে লাভটুকু পাচ্ছিল খাদকদের সকলে মিলে সেই লাভটুকুই ভোগ ক'রতে পারবে। তার পর, একটি জেলার প্রত্যেক বা বেশীর ভাগ গ্রামে ও সহরে যদি এই রকম সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হয়, তখন এই ছোট ভাণ্ডারগুলি জেলার প্রধান সহরে একটি পাইকারী ভাণ্ডার খুলতে পারে। এই পাইকারী ভাণ্ডার সোজাসুজি সেই প্রদেশের সব চেয়ে প্রধান ব্যবসাদারদের কাছে অর্ডার দিতে পারবে। সেই জন্যে লাভের পরিমাণ বাড়বে, আর মাঝের অনেক ব্যবসাদারদের হাত এড়ানোর জন্যে জিনিষ খাঁটি পাবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। আবার একটি প্রদেশের প্রত্যেক বা বেশীর ভাগ জেলায় যদি একটি পাইকারী ভাণ্ডার থাকে আর তারা যদি একটি প্রাদেশিক পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপন করে, আর প্রদেশে প্রদেশে একটি ক'রে বড় পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপিত হ'লে তাদের চেষ্টায় যদি সমগ্র ভারতের জন্যে একটী বিরাট পাইকারী ভাণ্ডার খোলা হয়, তখন আবশ্যক জিনিষগুলি আরও বেশী পরিমাণে একসঙ্গে নেওয়া যাবে। এ জন্যে সোজাসুজি বড় বড় উৎপাদকদের (ভারতের বা

ভারতের বাইরের) কাছ থেকে কেনা সম্ভব হ'য়ে উঠবে কিংবা পাইকারী ভাণ্ডার তখন নিজেই বড় বড় কারখানা খুলে অনেক জিনিষের উৎপাদনে হাত দিতে পারবে। এই রকমে খুচরা ভাণ্ডারগুলি যত সঙ্ঘবদ্ধ হ'বে, এক একটি পাইকারী ভাণ্ডার যত বেশী ছোট পাইকারী ভাণ্ডার বা খুচরা ভাণ্ডারকে মেম্বাররূপে পাবে, খাদকদের ও উৎপাদকদের মাঝে যে সারি সারি বড়র পর ছোট, তার পর আরও ছোট ব্যবসাদার রয়েছে—যাদের হাত দিয়ে জিনিষগুলি উৎপাদকদের হাত থেকে খাদকদের কাছে পৌঁছায়—তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। তারা সাধুভাবে যে লাভটুকু কর্‌ছিল সেটুকু খাদকেরাই ভোগ ক'রবে, তারা জিনিষপত্রের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে যে লাভটুকু কর্‌ছিল সেটুকুও বন্ধ করা হ'বে। অধিকন্তু খাদকরা নিজেদের সর্ত্তে উৎপাদকদের রাজী হ'তে বাধ্য ক'রতে পারবে। সুতরাং অল্প কথায় ব'লতে গেলে সমবায় ভাণ্ডারের মানে হচ্ছে—উৎপাদক ও ব্যবসাদারদের অত্যাচার হ'তে বাঁচবার জন্যে খাদকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অল্প দরে খাঁটি জিনিষ পাবার বন্দোবস্ত করা।

বেশী লাভ পাবার কারণ

এ পর্য্যন্ত আমরা ধ'রে নিয়েছি যে একটি সাধারণ দোকান যত লাভ অর্জ্জন ক'রতে পারে একই সাইজের একটি ভাণ্ডার প্রায় তত লাভই অর্জ্জন ক'রতে পারবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটি একই সাইজের ভাণ্ডারেরও একটি সাধারণ দোকানের চেয়ে বেশী লাভ অর্জ্জন ক'রবারই সম্ভাবনা। খাদকদের আবশ্যক দ্রব্যাদি একসঙ্গে কেনার জন্যে যে সুবিধা, সেটি সমবায় ভাণ্ডারের যেমন আয়ত্তের মধ্যে তেমনই সাধারণ দোকানগুলিরও আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু এ ছাড়া এমন কতকগুলি সুবিধা

সমবায় ভাণ্ডারের আছে, যার জন্যে সমবায় ভাণ্ডার সাধারণ দোকানের চেয়ে ঢের বেশী লাভ করতে পারে। সেই সুবিধাগুলি হচ্ছে এই :—

প্রথমতঃ, সাধারণ দোকানদারদের কোনও বাঁধা খদ্দের নেই; অনেক সময় দোকানদারেরা ধারের ওপর ধার দিয়ে খদ্দের হাতে রাখে বটে, কিন্তু এর জন্যে দোকানদারের যেমন সুবিধা হয়, তেমন ক্ষতিও হ'য়ে থাকে। অনেক সময় হয়ত টাকা আদায়ই হয় না। কাজেই সাধারণ দোকানগুলি ক্রেতা সম্বন্ধে যে বেশ অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে তা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমবায় ভাণ্ডারগুলিকে ক্রেতা সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয় না। কারণ সমবায় ভাণ্ডার চালাতে হ'লেই ভাণ্ডারের মেম্বারদের নিম্নলিখিত দুটি নিয়ম পালন ক'রতেই হবে :—(১) তাদের কি কি জিনিষ কি পরিমাণে দরকার, তা পূর্ব্ব হ'তে ভাণ্ডারকে জানানো, (২) তাদের যা কিছু আবশ্যক হ'বে সব ভাণ্ডার থেকেই ক্রয় করা। মেম্বাররা এ দুটি নিয়ম মেনে চল্‌লে ভাণ্ডারকে বিক্রী সম্বন্ধে ভাবতেই হবে না; আর এ দুটি নিয়ম যদি মানা না হয় তা হ'লে ভাণ্ডার চল্‌বেই না।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ দোকানগুলিকে ক্রেতা আকর্ষণ ক'রবার জন্যে বিজ্ঞাপনে অনেক খরচ ক'রতে হয়; তার ওপর অনেক সময় জিনিষ বিক্রী হয় না ব'লে, অথবা বাধ্য হ'য়ে কম দামে বিক্রী ক'রতে হয় ব'লে লোকসানও দিতে হয়। কিন্তু সমবায় ভাণ্ডারে ঐ ধরণের খরচ বা লোকসান হ'বার সম্ভাবনাই নেই; কারণ যেখানে খদ্দের একেবারে বাঁধা বল্‌লেও চলে, সেখানে ক্রেতা আকর্ষণ ক'রবার জন্যে বিজ্ঞাপনে রাশি রাশি টাকা ঢালবার দরকার হয় না; আর খদ্দেরদের কোন্ জিনিষগুলি প্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেক জিনিষটি কত

পরিমাণে দরকার তা আগে থাকতে জানা থাকায় কোনো জিনিষ অবিক্রীত হ'য়ে প'ড়েও থাকে না কিংবা লোকসানে বেচতেও হয় না।

তৃতীয়তঃ, দোকানদারদের দোকান চালাতে হ'লে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ ক'রতে হয়, অনেক মাথা ঘামাতে হয়। কি কি জিনিষ কেনা দরকার, কোথা থেকে সেগুলি কিন্‌তে হবে, কোন্ কোন্ স্থানে দোকান খুল্‌লে সুবিধা হ'বে—এই সমস্ত সমস্যার সমাধান নিজেকেই ক'রতে হয়। কাজেই সে বিক্রীর সময় দোকানে ব'সে জিনিষ বেচা বা বেচার তদারক করার জন্যে যেমন একটা পারিশ্রমিক আদায় করে, তেমন তার ঐ মাথা খাটানোর জন্যেও একটা দর ঠিক ক'রে প্রত্যেক জিনিষ বেচবার সঙ্গে তা কিছু কিছু ক'রে আদায় ক'রে নেয়। কিন্তু সমবায় ভাণ্ডারগুলিতে ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান ভাণ্ডারের সাধারণ মেম্বারদের অথবা সাধারণ মেম্বারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত কমিটির মেম্বারদেরই ক'রতে হয়। অবশ্য ভাণ্ডারের ম্যানেজার থাকে, কিন্তু তার কাজ ভাণ্ডারের কেনাবেচার তদারক করা ও কমিটির উপদেশ মত ভাণ্ডার চালানো। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দোকানদার তার বুদ্ধি চালনার জন্যে যে দাম আদায় করে সমবায় ভাণ্ডারে সেই খরচটুকু বেঁচে যায়।

যে সব কারণের উল্লেখ করা হ'ল ঐ সব কারণেই কতকগুলি খুচরা ভাণ্ডার মিলিত হ'য়ে একটি পাইকারী ভাণ্ডার খুল্‌লে লাভ আরও বেশী পরিমাণ পাওয়া যায়। পাইকারী ভাণ্ডারের বাঁধা খদ্দের হ'ল খুচরা ভাণ্ডারগুলি। কাজেই ক্রেতা সম্বন্ধে কোন উৎকণ্ঠা থাকে না। বিজ্ঞাপনেও কোন খরচ থাকে না; কোন্ জিনিষ কত পরিমাণে খুচরা ভাণ্ডারগুলির দরকার তা' আগে থাকতে জানা থাকায়

দরুণ কোনও জিনিষ প'ড়ে থাকে না বা লোকসানে বেচতে হয় না। পাইকারী ভাণ্ডারটি চালাবার কাজ খুচরা ভাণ্ডারগুলির দ্বারা নির্ব্বাচিত ডিরেক্টাররা ক'রে থাকেন ব'লে মস্তিষ্ক চালনার জন্যেও কোন খরচ পড়ে না। তবে যেখানে ডিরেক্টারদের মাইনে দিয়ে রাখা হয় সেখানে কিছু খরচ পড়ে বটে। একদিকে এতগুলি সুবিধা, অপর দিকে খুচরা ভাণ্ডারগুলির প্রত্যেকটি যত পরিমাণে জিনিষ কেনে, পাইকারী ভাণ্ডারটি তার চেয়ে ঢের বেশী জিনিষ একসঙ্গে কিন্‌বে ব'লে কেনবার সময় আরও লাভ হবে। সুতরাং একটি খুচরা ভাণ্ডার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সাধারণ দোকানের চেয়ে বেশী লাভ করবেই, আর সেই খুচরা ভাণ্ডারটি আরও বেশী লাভ ক'র্‌বে যখন সেটি আরও কতকগুলি খুচরা ভাণ্ডারের সঙ্গে মিলে একটি পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপন ক'র্‌বে।

রক্‌ডেল প্রণালী

ইংল্যাণ্ডের উত্তরে রক্‌ডেল নামে একটি নগর আছে। ১৮৪৩ সনে ঐ সহরের একটি ফ্ল্যানেল মিলের মজুররা মাইনে বাড়াবার জন্যে ও অন্যান্য কারণে ধর্ম্মঘট করে। পরে কর্ত্তৃপক্ষরা কারখানাটি বন্ধ করে দেন। ফলে মজুররা বেকার অবস্থায় ব'সে থাকে। এই সব বেকার মজুরদের মধ্যে জন কয়েক স্থির ক'র্‌ল যে, যদি তারা চেষ্টা ক'রে একটি দোকান খুলে সেই দোকান থেকে নিজেদের আবশ্যক জিনিষ-পত্র কেনে, তবে তাদের মাইনে না বাড়্‌লেও তাদের জীবন ধারণের খরচটা কিছু কমবে। সুতরাং এতে কিছু মাইনে-বাড়ানোর ফলই পাওয়া যাবে। ক্রমে ক্রমে ২৮ জন মজুর এই প্রস্তাবে রাজী হ'ল। তারা স্থির ক'রল প্রত্যেককে এক পাউণ্ড

ক'রে মূলধন দিতে হ'বে। কিন্তু এক পাউণ্ড এক সঙ্গে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয় ব'লে প্রতি হপ্তায় প্রত্যেককে গুটিকয়েক করে পেনি দিতে হ'বে, যে পর্য্যন্ত না এক পাউণ্ড দেওয়া হয়। এই রকম ভাবে ১৮৪৩ সনের কল্পনা-জল্পনার ফলে ১৮৪৪ সনে ভাণ্ডারটি প্রথম খোলা হ'ল রক্‌ডেল সহরের একটি সামান্য গলি টোড্ লেনে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় দোকানটি খোলা হ'ত এবং মেম্বারদের মধ্যেই এক এক জন পালা ক'রে দোকান চালাবার ভার নিত। ক্রমে এই ভাণ্ডারের সভ্যের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এটি ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ সমবায় ভাণ্ডারে পরিণত হ'ল। যে কয়টি বিশেষ নিয়ম পালন করার জন্যে রক্‌ডেল পাইওনিয়ার্সদের এই উন্নতি, সমবায় ভাণ্ডার সফল ক'রতে হ'লে সেই নিয়ম কয়টি মেনে চলা বিশেষ দরকার। ইংল্যাণ্ডের বাইরের সমবায় ভাণ্ডারগুলি সাধারণতঃ ঐ নিয়মগুলি পালন ক'রে থাকে। নীচে সেই নিয়মগুলির উল্লেখ করা যাচ্ছে :—

প্রথম—বাজার দরে বেচা (বাজার দরের চেয়ে সস্তা দরে নয়)। এই নিয়মের সুবিধা অনেক :—(১) যদি উৎপাদনের দরে (জিনিষগুলি সংগ্রহ ক'রবার এবং ভাণ্ডার চালাবার খরচও তার সঙ্গে যোগ দিয়ে) বেচ্‌তে হয়, তা হ'লে উৎপাদনের দর হিসাবের সময় অল্প-বিস্তর এদিক্ ওদিক্ হওয়া অসম্ভব নয়। আর যদি উৎপাদনের দরের চেয়ে অল্প দরে ভুলক্রমে বিক্রী হ'য়ে যায়, তখন ক্ষতি সাম্‌লাবার জন্যে খদ্দেরদের কাছে থেকে বিক্রী হ'বার পরে কিছু আদায় করা শক্ত হ'বে। (২) বাজার দরে বেচ্‌লে যে লাভ হ'বে সে লাভটুকু বছরের শেষে ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিলে লাভের পরিমাণটা বেশ লোভনীয় হ'য়েই দেখা দেবে; কিন্তু প্রত্যেক জিনিষই

যদি বাজার দরের চেয়ে কিছু অল্প দরে দেওয়া যায়, তা হ'লে প্রত্যেক ক্রয়ের উপর লাভের পরিমাণ এত সামান্য হবে যে, লাভের পরিমাণটা মেম্বারদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করানো শক্ত হবে। (৩) বাজার দরের চেয়ে অল্প দরে বেচলে স্থানীয় দোকানদারদের তার চেয়ে অল্প দরে বেচতে হবে। এই রকমে দুই দলে রেষারেষি চল্‌তে থাক্‌লে একটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ পুরাণো দোকান অপেক্ষা একটি নূতন ভাণ্ডারের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং বাজার দরে বেচে দোকানদারদের সঙ্গে রেষারেষি এড়ানোই ভাল।

দ্বিতীয়—নগদ বেচা (ধারে নয়)।

এই নিয়মের সুবিধা হচ্ছে এই যে, ভাণ্ডারের টাকা আট্‌কে থাকে না। শিগ্‌গির হাতে ফিরে আসে। ধারে কিন্‌লে ধারে দেবার জন্যে যেটুকু দর বেশী ক'রতে হয় সেই খরচটুকুও বাঁচে। ভাণ্ডার থেকে ধারে কেনার অসুবিধা এই যে, ধারে দিতে হ'লেই ভাণ্ডারের হিসাব রাখা আরও জটিল হ'য়ে পড়ে এবং তার জন্যে ভাণ্ডার চালাবার খরচও বেড়ে যায়; অনেক সময় টাকা একেবারে আদায়ই হয় না কিংবা মোকদ্দমা করে আদায় করতে হয়; ধারে বেচতে হ'লে ভাণ্ডারকে ধারে কিন্‌তেও হ'তে পারে। কিন্তু ধারে কিন্‌তে হ'লে নগদ কিন্‌লে যেমন সুবিধা দরে পেতে পারা যায়, তেমন দরে মিলে না। আরও একটি অসুবিধা এই যে, ব্যবসাদারদের কাছে ঋণী থাকার জন্যে ভাণ্ডার যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে কিন্‌তে পারে না।

তৃতীয়—মেম্বারদের মধ্যে জিনিষ ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে ("মূলধনের পরিমাণ অনুসারে নয়) লাভ বণ্টন ক'রে দেওয়া।

সমবায় ভাণ্ডার চালানোর খরচ সাধারণ দোকান হ'তে কম। অথচ সাধারণ দোকানগুলি যে দরে জিনিষ বেচে সমবায় ভাণ্ডারও সেই দরে

বেচে। কাজেই হাতে মোটা লাভ থাকে। ‘ডিপ্রিসিয়েশান্’ ও ‘রিজার্ভ ফাণ্ডের’ জন্মে টাকা রেখে সেই লাভ মেম্বারদের মধ্যে ভাগ ক’রে দিতে হবে। কিন্তু কি নিয়মে? ভাণ্ডারের জন্মে যে যেমন পুঁজি দিয়েছে সেই অনুযায়ী লাভ ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, যারা বেশী পুঁজি খাটাচ্ছে, তারা নতুন মেম্বার করতে চাইবে না। কারণ তা হ’লে লাভ আরও বেশী মেম্বারদের মধ্যে ভাগ কর’তে হবে। সুতরাং ভাণ্ডারটি কয়েকজন বড়লোকের স্বার্থেই চালিত হ’তে থাকবে, এর ওপর সকল মেম্বারের সমান কর্তৃত্ব থাকবে না। এ কথাটিও মনে রাখা দরকার যে, যারা কয়েকটি বিশেষ আর্থিক (ইকনমিক্) অসুবিধার জন্মে ভুগ্‌ছে তারা পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা সেই অসুবিধা দূর ক’রবার জন্যেই সমবায় ভাণ্ডারে মিলিত হয়। সুতরাং যারা মেম্বার নয়, তারা মেম্বারদের সঙ্গে একই অসুবিধা ভোগ ক’রলেও, যদি ভাণ্ডার-সমিতিতে তাদের প্রবেশ বন্ধ করা হয়, অর্থাৎ ভাণ্ডারটাকে জনকয়েকের টাকা রোজগারের যন্ত্ররূপেই যদি পরিণত করা হয়, তা হ’লে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাণ্ডারের সৃষ্টি, সেই উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হবে। মূলধন অনুযায়ী লাভ ভাগ করার আরও একটি কুফল এই যে, বিক্রী ক’মে যাবে—কারণ যারা কিন্‌বে তারা যদি সাধারণ দোকানে যে দর সেই দরেই কিন্‌তে বাধ্য হয়, অথচ অন্য কিছু আনুষঙ্গিক সুবিধা না পায়, তা হ’লে ভাণ্ডার থেকে কেন্‌বার জন্মে তারা কোন আকর্ষণই বোধ কর্‌বে না। কেবল যার মূলধন ভাণ্ডারে বেশী খাট্‌ছে সেই বেশী কিন্‌তে প্রলুব্ধ হ’তে পারে। অপরদিকে লাভ যদি ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে ভাগ করা যায়, তা হ’লে বেশী বিক্রী করা—যার উপর ভাণ্ডারের সাফল্য নির্ভর করে—সহজ হ’য়ে আসে, মেম্বাররাও সকলেই (যারা ভাণ্ডারের বেশী মূলধন দিয়েছে, কেবল তারাই নয়) ভাণ্ডার হ’তে কেনার দ্বারা ভাণ্ডারের প্রতি যে অনুরাগ ও

বিশ্বস্ততা দেখায়, সেই অনুসারে পুরস্কৃত হয়। এর আরও একটি সুফল এই যে, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীতে মূলধনের যে প্রভুত্বের স্থান আছে, এতে মূল-ধনকে সেই স্থান থেকে নামিয়ে জিনিষ সরবরাহ বা উৎপাদনের কাজে সেবকরূপে পরিণত করা হয়, ও কেবল সুদ পেয়েই সন্তুষ্ট হ'তে বাধ্য করা হয়।

চতুর্থ—ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে রকৃডেল পাইওনিয়ার্সদের এটী একটি বিশেষ নিয়ম এবং এই নিয়ম সাধারণতঃ সকল সমবায় ভাণ্ডারই মেনে থাকে। এই নিয়ম সম্বন্ধে দুটি নীতি উল্লেখযোগ্য—(১) কোন লোককে সভ্য ক'রবার সময় ধর্ম্ম বা রাজনীতি সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞাসা করা হবে না ; (২) ধর্ম্ম বা রাজনীতি সম্বন্ধীয় মতামতের জন্যে কেউ কোন সুবিধা ভোগ ক'রতে পারবে না।

পঞ্চম—যারা মেম্বার নয়, তাদেরও ভাণ্ডার থেকে জিনিষ-পত্র ক্রয় করবার অধিকার দেওয়া এবং লাভের অর্দ্ধাংশ দেওয়া।

শুধু মেম্বারদেরই বেচা হবে, আর কারুকে ভাণ্ডার থেকে বেচা হবে না—এই ধরণের নিয়ম করা খুবই স্বাভাবিক ; কারণ মেম্বাররা নিজেদের স্বার্থের জন্যেই ভাণ্ডার স্থাপন ক'রেছে। কিন্তু যারা মেম্বার নয় তাদেরও ভাণ্ডার থেকে কেনবার অধিকার দিলে ভাণ্ডারের লাভ বই লোকসান নেই। কারণ, তাতে ভাণ্ডারের জিনিষ-পত্র শিগ্‌গির বিক্রী হবার সম্ভাবনা। সুতরাং যে টাকা ভাণ্ডারে খাটছে, সে টাকা শিগ্‌গির হাতে ফিরে আস্‌তে পারে। তার ওপর তাদের যদি লাভেরও কিছু অংশ দেওয়া যায়, তবে তাদের ভাণ্ডার থেকে কেনবার লোভ বেড়ে যাবে, সুতরাং নতুন মেম্বার পাওয়া সহজ হবে, ভাণ্ডার সম্বন্ধে বেশ সুন্দর একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ারও ফল পাওয়া যাবে।

আর্থিক সুবিধা ছাড়া অন্যান্য উপকার

সমবায় ভাণ্ডার থেকে আর্থিক সুবিধাই একমাত্র লাভ নয়, তা ছাড়া আরও অনেক উপকার পাওয়া যেতে পারে। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(১) স্বায়ত্তশাসনে অভ্যস্ত হওয়া। ভাণ্ডার চালাবার জন্যে প্রথমতঃ থাকে মেম্বারদের সাধারণ-সভা এবং দ্বিতীয়তঃ থাকে সাধারণ-সভার নির্ব্বাচিত একটি কমিটি। ভাণ্ডার প্রত্যক্ষ ভাবে চালাবার জন্যে যা কিছু স্থির করা দরকার, তা কমিটিই করে থাকে। কিন্তু কমিটিকে নিজের বিবেচনার ওপর নির্ভর ক'রতে হ'লেও, সাধারণ মেম্বাররা সাধারণ-সভায় কার্য্যপ্রণালীর যে ধারা স্থির ক'রে দেন, কমিটি তার ব্যতিক্রম করতে সাহস পায় না। কাজেই সাধারণ-সভাই হচ্ছে ভাণ্ডারের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। এই সাধারণ-সভাই ভাণ্ডারের মূল নীতিগুলি ঠিক ক'রে দেয়, আর সেই অনুসারে কমিটিকে ম্যানেজার ও তাঁর সহকারীদের সাহায্যে ভাণ্ডার চালাতে হয়। এই সাধারণ সভায় কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন আধিপত্য নেই। প্রত্যেকেরই একটি ভোট আছে। কারুরই একটীর বেশী ভোট নেই। আর প্রত্যেকেই নিজ মত অসঙ্কোচে অবাধে প্রকাশ ক'রতে পারে। ভাণ্ডার চালানো এমন একটি জটিল ও বিরাট ব্যাপার নয়, বা তাতে এমন কিছু বিদ্যা বা কৃতিত্বের দরকার হয় না যে, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে সাধারণ-সভায় জাহির করা অসম্ভব ক'রে তুলতে পারে। কাজেই ভাণ্ডারের দ্বারা স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে বেশ একটু হাতে খড়ি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

(২) ধারে দেওয়া বন্ধ থাকাতে মেম্বারদের একটি মন্দ অভ্যাসের হাত হ'তে বাঁচানো হয়।

তবে, ধার কখনও দেওয়া হবে না—এমন নিয়ম কার্য্যতঃ পালন

করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। অনেক সময়ে অবস্থাবিশেষে বাধ্য হ'য়ে ধারে দিতেও হয়। সাধারণ দোকানের ক্রেতারা তিনটি কারণে ধার নিয়ে থাকে :—(ক) খুচরা জিনিষ কেনা—যেমন রুটি। ইহা প্রত্যেক বার কেনবার সময় দাম দেওয়া অসুবিধা হয় ব'লে একটি বিশেষ দিনে সমস্ত পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হয়; (খ) হাতে পয়সা থাক্‌লেও এবং খুচরা জিনিষ না হ'লেও অনেক সময়ে কুড়েমির জন্যে নগদ দাম দেওয়া হ'য়ে ওঠে না; (গ) দারিদ্র্যের জন্যে বা সাময়িক অভাবের জন্যে (যেমন অসুখ-বিসুখ, বেকার অবস্থা ইত্যাদি) নগদ দাম দেওয়া অসম্ভব হয়। প্রথম প্রকার ঋণ সম্বন্ধে সমবায় ভাণ্ডারগুলিতে এই রকম ব্যবস্থা করা হয়। একবার একটু বেশী টাকা নিয়ে তারপর সেই টাকার বদলে খুচরা জিনিষ দেওয়া, যে পর্য্যন্ত না সেই জিনিষ-গুলির দাম পূর্ব্বে দেওয়া টাকার সমান হয়। এই নিয়ম কার্য্যকর ক'রবার জন্যে ইংল্যণ্ডে ট্রেড-টিকিট বিক্রী করা হয়। একবার থোক টাকা দিয়ে একটি টিকিট বই কিন্‌তে হয়। তারপর তা থেকে একটি একটি করে টিকিট ছিঁড়ে দিয়ে টিকিটের দাম অনুযায়ী রুটি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ সম্বন্ধে ভাণ্ডারের নিয়ম হচ্ছে এই যে, এই প্রকারের ঋণ আদবে দেওয়াই হ'বে না—আর যদি দেওয়া হয়, তা হ'লে যে মেম্বারটি ধারে নিচ্ছে তার ধারের পরিমাণ যে যত-টুকু শেয়ার ক্যাপিট্যাল দিয়েছে, তার চেয়ে যেন বেশী না হয়। তৃতীয় প্রকার ঋণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা এইরূপ—নিছক গরীব ব'লে কোন মেম্বারকে কখনও ধারে দেওয়া হয় না। কারণ সে যদি এতই গরীব হয় যে, তার দ্বারা ঐ ধার শোধ একেবারেই অসম্ভব, তা হ'লে তাকে ধার দিলে ভাণ্ডারের লোকসান—এমন লোকের ভাণ্ডারের মেম্বার না হওয়াই উচিত। কিন্তু যে মেম্বার ধারে চাচ্ছে, তার অবস্থা সত্য

সত্যই যদি খারাপ না হয়, যদি সে অসুখ বিসুখের জন্যে বা কাজ-কর্ম্ম না থাকার জন্যে ধারের প্রার্থী হয়, তা হ'লে তাকে ধার দেওয়াই শ্রেয়ঃ—কারণ এখানে টাকা একেবারে মারা যাবার ভয় নেই, অথচ ধারে না দিলে একজন নিয়মিত ক্রেতাকে হাতছাড়া করা হয়।

(৩) মেম্বারদের সঞ্চয়ের অভ্যাস বাড়ে। ইংল্যণ্ডে মেম্বাররা প্রথমে যে পুঁজিতে (১ শিলিং) ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করে, সেই পুঁজি ভাণ্ডারের লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত ঐ লাভ মেম্বারদের দেয় শেয়ারের দাম (১ পাউণ্ড) পর্য্যন্ত না পৌছায়, সে পয্যন্ত লাভের টাকা নেবার ক্ষমতা থাকে না। তারপর যে-লাভ জমে, তা মেম্বাররা নিজেরা খরচ ক'রতে পারেন। ঐ লাভ ইংল্যণ্ডে সাধারণতঃ তিন উপায়ে খরচ হ'য়ে থাকেঃ—(ক) তার সাহায্যে ভাণ্ডার থেকে আরো জিনিষ কেনা। এতে ভাণ্ডারের আরও পরিপুষ্টি হয়। (খ) কোন বিল্ডিং সোসাইটি হ'তে টাকা ধার নিয়ে বাড়ী কিনে পরে ঐ লাভের সাহায্যে অল্পে অল্পে ধার শোধ দেওয়া। এই স্বভাবটি মেম্বারদের মধ্যে এত বেশী যে ভাণ্ডারগুলিই বিল্ডিং ফাণ্ড খুলে ঐ ফাণ্ড হ'তে মেম্বারদের বাড়ী ক'রবার টাকা দেয়। এবং পরে তাদের যেমন যেমন প্রাপ্য হয়, সেই লাভ দিয়ে বিল্ডিং ফাণ্ডের ধার ক্রমে ক্রমে শুধে নেয়। (গ) মেম্বাররা কখনও কখনও লাভের টাকা ভাণ্ডারকে ধার (লোন ক্যাপিট্যাল) হিসেবে দেয়, অথবা ভাণ্ডারের আরও শেয়ার কেনে। ভাণ্ডারের শেয়ার কেনার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া থাকে, যার বেশী শেয়ার কেউ কিন্‌তে পারে না; কারণ এই নিয়ম না থাকলে কয়েকটি লোক ভাণ্ডারটিকে নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের প্রতিষ্ঠান ক'রে তুলতে পারে। ইংল্যণ্ডে কোন মেম্বার ২০০ পাউণ্ডের বেশী শেয়ার কিন্‌তে পারে না।

(৪) ইয়োরোপের সকল দেশেই সমবায় ভাণ্ডারগুলি সাধারণতঃ মেম্বারদের শিক্ষার জন্যে কিছু না কিছু বন্দোবস্ত করে এবং তার জন্যে লাভ থেকে একটি বিশেষ অংশ আলাদা ফাণ্ডে জমা দেওয়া হয়।

কিন্তু এই শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য সকল দেশেই এক নয়। বেলজিয়ামে সমবায় ভাণ্ডার শিক্ষা দেয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। জার্ম্মাণি, ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডে শিক্ষা কেবল সমবায় আন্দোলনের প্রসারের উদ্দেশ্যে। ইংল্যণ্ডের ভাণ্ডারগুলির শিক্ষা দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—সামাজিক উন্নতিসাধন।

(৫) ট্রাষ্ট, কার্টেল প্রভৃতি উৎপাদনের বড় বড় প্রতিষ্ঠান সমূহ আধুনিক আর্থিক জগতে নানা শিল্পে দেখা দিয়েছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য হচ্ছে—উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমিয়ে, হয় সমবেতভাবে উৎপাদন করা এবং উৎপাদনের হার ও জিনিষের দাম ঠিক করা, অথবা উৎপাদনের কাজে পরস্পরের স্বাধীনতা বজায় রেখে কেবল উৎপাদনের হার ও জিনিষের দাম সমবেতভাবে ঠিক করা। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান-সৃষ্টির ফল এই হয় যে, খাদকেরা সম্পূর্ণভাবে ট্রাষ্ট ও কার্টেলগুলির দয়ার ওপর নির্ভর ক'রতে বাধ্য হয়। উৎপাদকেরা দলবদ্ধ হ'য়ে খাদকদের শোষণ ক'রতে আরম্ভ করে। অথচ খাদকেরা পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন থাকায় দর সম্বন্ধে বা জিনিষের 'কোয়ালিটী' সম্বন্ধে উৎপাদকদের বাধ্য ক'রে কিছু করাতে পারে না। খাদকদের এই দুরবস্থা থেকে ত্রাণ পাবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে—সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করা। সমবায় ভাণ্ডারের সংখ্যা যত বেশী হবে, আর সেগুলি যত বেশী সঙ্ঘবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত হবে ততই প্রতিযোগিতায় বাধ্য

হ'য়ে ট্রাষ্ট ও কার্টেলগুলি খাদকশোষণকারী নীতি ছাড়তে বাধ্য হবে। এমন কি, উৎপাদনের কাজও ছাড়তে বাধ্য হ'তে পারে।

সমবায় ভাণ্ডারের মন্দ দিক্

সমবায় ভাণ্ডার থেকে কি কি সুবিধা ভোগ করা যায়, তা দেখা হ'য়েছে। এখন এর থেকে কি কি অপকার হ'তে পারে, সেগুলির আলোচনা করা দরকার। প্রধানতঃ তিনটি কুফলের কথাই মনে আসে ঃ—

(১) সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়ার ফলে, ছোট ছোট দোকান-দার ব্যবসাদারদের লোকসান হ'তে থাকৃবে এবং পরে তাদের একে-বারে কাজ ছাড়তে হ'তেও পারে। পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনের ফলে বড় বড় ব্যবসায়ী নিজ নিজ কাজ ক্রমে ছাড়তে বাধ্য হয়। কাজেই সমবায় ভাণ্ডার খোলার ফল হচ্ছে—কতকগুলি লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করা। কিন্তু এতে দুঃখিত হ'বার কোন কারণ নেই। অধিকতর উন্নত আর্থিক প্রণালী অবলম্বন ক'রতে গেলেই যারা পুরাণো প্রণালী অবলম্বন ক'রে উপার্জ্জন করেছিল, তাদের ক্ষতি অনিবার্য্য। কিন্তু এই কারণে উন্নততর প্রণালীটিকে অবহেলা করা নিতান্ত মূঢ়তা।

(২) বড় বড় পাইকারী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হ'লে সাধারণ ব্যবসা-দারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা একেবারে উঠে যেতেও পারে। সেই রকম অবস্থায় ভাণ্ডারের কাজ একেবারে একচেটে হ'য়ে দাঁড়ায়। তাতে একটি খারাপ ফল হ'তে পারে। প্রতিযোগিতার অভাবে ভাণ্ডারটিকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে সুন্দরভাবে চালাবার চেষ্টা ও যত্নের অভাব হ'তে পারে। যদি সমবায় ভাণ্ডার উৎপাদনেও হাত দেয়

এবং উৎপাদকদের প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়, তবে ভাণ্ডার কর্ত্তৃক উৎপন্ন জিনিষ প্রতিযোগিতার চাপে যত ভাল হ'ত, হয়ত তত ভাল হবে না। এই কুফল একেবারে নিবারণ করা অসম্ভব। অনেকটা নিবারণ করা যেতে পারে, যদি খাদকরা যথাসম্ভব ভাণ্ডারটির তদ্বির করে, কমিটির মেম্বারদের কড়া শাসনে রাখে ও ভাণ্ডারের কর্ম্মচারী-দিগকে গুণানুসারে পুরস্কৃত করে।

(৩) সমবায় ভাণ্ডারের কর্ম্মচারীরা ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে কেমন ব্যবহার পাবে, তাও একটি আশঙ্কার কথা। কর্ম্মচারীদের দিক্ থেকে দেখলে, সাধারণ ব্যবসাতে ধনীকে ও মজুরে যে সম্বন্ধ সমবায় ভাণ্ডারের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ অনেকটা সেই রকমই। প্রতি-যোগিতামূলক ব্যবসাতে যেমন লোক মাইনে নিয়ে খাটে, আদত ব্যবসাটির সঙ্গে তার স্বার্থের কোন নিবিড় যোগ থাকে না, তেমনি সমবায় ভাণ্ডারে যারা চাকুরী করবে, তারা মাইনে নিয়েই খাটবে আর তাদের স্বার্থের সঙ্গে ভাণ্ডারের স্বার্থের কোন নিবিড় যোগ যে থাকবেই, তা বলা যায় না, বরং না থাকাই সম্ভব। কারণ, ভাণ্ডার স্থাপিত হয় খাদকদের স্বার্থের জন্যে—কর্ম্মচারীদের স্বার্থের জন্যে নয়। একজন বা জনকয়েক লাভ ভোগ ক'রবে, এই আশায় সাধারণ ব্যবসাগুলি চালানো হয়। সমবায় ভাণ্ডারগুলি স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে যে, লাভ একজন বা জনকয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সকল খাদক সভ্যদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। লাভ একজন বা কয়েকজনের বদলে অনেকে ভোগ ক'রছে ব'লে, যারা লাভ পাচ্ছে তারা যে কম স্বার্থপর হ'বে, তা আশা করা যায় না।

সমবায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হচ্ছে—খাদকদের স্বার্থের পুষ্টিসাধন। কাজেই খাদকদের স্বার্থের পুষ্টি ক'রতে পারলেই সমবায় ভাণ্ডারের

স্থাপন সার্থক হ'য়েছে মেনে নিতে হবে। তার সঙ্গে উৎপাদকেরও সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন হবে, এমন আশা করা সুসঙ্গত নয়। তবে উৎপাদকেরা অর্থাৎ মজুররা অন্যান্য শিল্পে যেসকল সুবিধা ভোগ বা যেমন রোজগার ক'রছে, খাদকরাও স্ব স্ব উপার্জনের ক্ষেত্রে মজুর-হিসাবে যে সকল সুবিধা ভোগ ক'রছে বা যেমন রোজগার ক'রছে, ভাণ্ডারের মজুররা তেমন সুবিধা ভোগ ক'রতে ও তেমন রোজগার ক'রতে পেলেই ভাণ্ডারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রবার কিছু থাকে না।

কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে যে, বিলাতের সমবায় ভাণ্ডারগুলি মজুরের মালিক হিসাবে যে নিতান্ত স্বার্থপর ও হৃদয়হীনের মত ব্যবহার ক'রছে, তা মোটেই নয়। মজুরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডারের ম্যানেজার ও তাঁদের সহকারীদের উপযুক্ত মাইনে দেওয়া হয়। কর্ম্মচারীদের একটি পৃথক্ ট্রেড ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হ'বার অধিকার দেওয়া হ'য়েছে। ট্রেড ইউনিয়ান হারেই তাদের মাইনে দেওয়া হয়। হপ্তায় ৫৫½ ঘণ্টার বেশী কাজ করানো হয় না।

মজুরদের কাজে উৎসাহ দেবার জন্যে অথবা তাদের স্বার্থের সঙ্গে ভাণ্ডারের স্বার্থের একটি নিবিড় যোগ স্থাপনের জন্যে কোন ভাণ্ডারে (যেমন স্কটল্যাণ্ডের পাইকারী ভাণ্ডার) তাদের লাভের কিছু অংশ দেওয়া হয়। লাভের একটু অংশ পেলেই যে মজুররা খুব উৎসাহিত হবে বা ভাণ্ডারটিকে খুব আপনার জিনিষ বলে মনে করবে, তা জোর করে বলা যায় না। পাইকারী ভাণ্ডারের মালিকরা একটি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ স্থানের বাসিন্দা জন কয়েক ব্যক্তি মাত্র নয়, সুতরাং মজুররা তাদের অভাব-অভিযোগ সহজে জানাতে পারে না। কিন্তু পাইকারী ভাণ্ডারের মজুরদের লাভের অংশ দেওয়া হবে, এই নিয়ম করলে লাভ ভাগ করবার

প্রণালী স্থির ক'রবার জন্যে মজুরদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে হবে। সেই সুযোগে তারা তাদের অভাব অভিযোগ তাদের মনিবদের জানাতে পারবে। কেবল এই দিক্ থেকেই পাইকারী ভাণ্ডারে লাভ ভাগ করার সার্থকতা আছে। আর ঐ একই দিক্ থেকে খুচরা ভাণ্ডারে লাভ ভাগ করবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ মজুররা মেম্বারদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়।

উৎপাদন-কার্য্যে সমবায় ভাণ্ডার

সমবায় ভাণ্ডার যদি ব্যবসাদারদের হাত এড়িয়ে উৎপাদকদের কাছে সোজাসুজি গিয়ে যেমন জিনিষের দরকার তাই কিনে আনে তা হ'লেই সমবায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'ল। কিন্তু কার্য্যতঃ, ভাণ্ডার-গুলি কেবল এইরূপ যোগানের কাজেই রত থাকে নি, তারা উৎপাদনের কাজেও নেমেছে। তার কারণ হচ্ছে—যথেষ্ট অর্থলাভ। পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে যে, লাভের টাকা মেম্বাররা সাধারণতঃ ভাণ্ডারেই খাটিয়ে থাকে। কাজেই যখন 'যোগানের' কাজের দিক্ থেকে আর কিছুই করবার থাকে না, অথচ লাভের টাকা জমে, তখন হয় টাকা ফিরিয়ে দিতে হয়, না হয় অন্য কাজে লাগাতে হয়। সাধারণতঃ টাকা ফিরিয়ে না দিয়ে উৎপাদনের কাজেই লাগানো হয়।

ভাণ্ডারের উৎপাদনে হাত দেওয়া সম্বন্ধে দুটি আপত্তির কথা উঠে থাকে। প্রথম, ডিরেক্টাররা কেনাবেচার কাজে পারদর্শী হ'তে পারেন, কিন্তু উৎপাদনের ব্যাপারে কেনাবেচা হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতার দরকার। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, উৎপাদন যাঁরা নিজের হাতে করে না, কেবল দেখাশুনাই করেন, তাঁদের উৎপাদন সম্বন্ধে খুব গভীর জ্ঞান থাকবার বিশেষ আবশ্যকতা নেই; একটু সাধারণ

অভিজ্ঞতা থাকলেই হ'ল। ডিরেক্টাররা যদি বুদ্ধিমান লোক হন, উৎপাদন সম্বন্ধে মোটামুটি একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বেশী দিন লাগবে না। দ্বিতীয় আপত্তিটা এই যে, খাদকদের নানা জিনিষের দরকার হয়। প্রত্যেক জিনিষের নানান্ রকমারি আছে, ছোট ছোট উৎপাদকরাও যদি এক একটি জিনিষের এক একটি বিশেষ রকম প্রস্তুত করায় নিজেদের নিযুক্ত রাখে, তারা যত সস্তায় যত ভাল জিনিষ তৈয়ারী ক'রতে পারবে, একটা বড় পাইকারী ভাণ্ডারের পক্ষেও তা সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। কারণ ভাণ্ডারের মেম্বারদের সংখ্যা এত বেশী হওয়া সম্ভব নয় যে, প্রত্যেক জিনিষের প্রত্যেক রকমটি অনেক পরিমাণে উৎপন্ন করলেও সবই বিক্রী হ'বার নিশ্চয়তা থাকবে। তবে, যদি ভাণ্ডারের সভ্যের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, প্রত্যেক জিনিষের প্রত্যেক রকম বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন ক'রলেও ক্রেতার অভাব হ'বে না, তা হ'লে এই দ্বিতীয় আপত্তিটিও খাটে না।

ভাণ্ডারের কার্য্যক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশ

সমবায় ভাণ্ডারের পক্ষপাতী অনেকের বিশ্বাস যে, ভাণ্ডার-প্রণালীর সাহায্যে একটি নতুন আর্থিক ভিত্তির ওপর সমাজকে গ'ড়ে তুলতে পারা যেতে পারে। তাঁদের ধারণা যে, রাষ্ট্রের সকলেই যদি একটি না একটি ভাণ্ডারের মেম্বার হন, তখন এমন অবস্থা হওয়া অসম্ভব নয় যে, প্রত্যেক লোকই একদিকে খাদক হিসাবে ভাণ্ডারের প্রভু আর একদিকে উৎপাদক হিসাবে ভাণ্ডারের মজুর হবেন। এইরূপ ধরণের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাকে বলা যেতে পারে 'খাদক সমবায়ের রাষ্ট্র' (কনজিয়ুমার্স কো-অপারেটিভ কমনওয়েল্‌থ')।

এই ধরণের রাষ্ট্র গ'ড়ে তুললেই যে খুব সুবিধা হবে, তা মনে করবার

কারণ নেই। এইরূপ রাষ্ট্রের সঙ্গে 'কালেক্‌টিভিষ্ট' ষ্টেট্-এর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 'কালেক্‌টিভিষ্ট ষ্টেটের' বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দ্বারা ২।৪টি শিল্প চালানো অসম্ভব নয়; কিন্তু যত শিল্পের ভার রাষ্ট্রের ওপর চাপানো হ'বে, রাষ্ট্র ততই উন্নতিবিমুখ ও শৃঙ্খলাহীন হ'য়ে পড়বে। এই অভিযোগটি 'খাদক সমবায়ে রাষ্ট্র' সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে।

ভাণ্ডারগুলি সমস্ত শিল্পের ভার আদবে নিতে পারবে কি না, এ বিষয়েও সন্দেহ আছে। শ্রীযুক্ত সি, আর, ফে তাঁর 'কো-অপারেশন অ্যাট হোম অ্যাণ্ড অ্যাব্রড' গ্রন্থে বলেছেন যে, ভাণ্ডারগুলি কেবল নিম্নলিখিত কাজে হাত দিতে পারে—(ক) মজুরদের আবশ্যক জিনিষ যোগানো ও (খ) উৎপাদন করা; (গ) মধ্যবিত্তদের আবশ্যক জিনিষ যোগানো। কিন্তু নিম্নলিখিত কাজগুলি ভাণ্ডারের দ্বারা হ'য়ে উঠা সম্ভবপর নয়ঃ—(ক) উৎপাদনের কাজের আবশ্যক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা। মজুর খাদকদের এ বিষয়ে কৃতিত্ব বা শিক্ষা নেই। (খ) মধ্যবিত্তদের আবশ্যক জিনিষ উৎপন্ন করা। এ কাজে এ পর্য্যন্ত কোন মধ্যবিত্তদের ভাণ্ডার হাত দেয় নাই। মধ্যবিত্তদের আদৌ এ দিকে আগ্রহ বা উৎসাহ আছে কি না সন্দেহ। (গ) মজুর ও মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর জন্য জিনিষ যোগানো। এ দিকে কোন চেষ্টা হয়ওনি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। (ঘ) আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার জন্য উৎপাদন। তাও সম্ভব নয়, কারণ দেশের খাদকদের মধ্যে যারা সভ্য হ'য়েছে, ভাণ্ডার কেবল তাদেরই জন্যে উৎপাদন করে। বিলাতে পাইকারী ভাণ্ডার উৎপাদনের খরচ কমাবার জন্যে অনেক জিনিষ বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করে, আর যেটুকু দেশে বিক্রী না হয়, সেটুকু 'কনটিনেণ্টে' বিক্রীর জন্যে পাঠায় বটে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার জন্যে উৎপাদনই এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়।

(ঙ) জিনিষপত্রের বিনিময়-সাধন (একস্‌চেঞ্জ) বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া (ট্রান্সপোর্ট)। কাজেই উল্লিখিত কাজগুলি সমবায় ভাণ্ডারের আয়ত্তের বাইরে এবং প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা ও উৎপাদনের হাতেই থাকবে ব'লে মনে হয়।

কৃষির সকল কাজও ভাণ্ডারের দ্বারা হ'তে পারে, এমন মনে হয় না। প্রথমতঃ যেখানেই ভাণ্ডার চাষের চেষ্টা করেছে প্রায়ই অকৃতকার্য্য হ'য়েছে (এটি শ্রীযুক্ত সি, আর, ফের মত; এই মত কিন্তু নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া শক্ত; বিলাতে ভাণ্ডারের দ্বারা কৃষিকার্য্য অনেক স্থলে বিফল হ'লেও অনেক স্থানে সফলও যে হ'য়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না)। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে কৃষির জিনিষ-পত্র সস্তায় কেনবার জন্যে বা কৃষিজাত দ্রব্য বেশী দরে বেচবার জন্যে পৃথক্ সমবায় সমিতি আছে, সেখানে ঐরূপ সমিতির সঙ্গেই কৃষকদের গৃহস্থালীর আবশ্যক দ্রব্যাদি সস্তায় কেনবার জন্যে একটি ভাণ্ডার বিভাগ খুললে কৃষকদের যত সুবিধা হয়, একটি পৃথক্ সমবায় ভাণ্ডার খুললে তত সুবিধা হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সকল প্রকার ব্যবসা ও উৎপাদনের কাজ ভাণ্ডার-আন্দোলনের কুক্ষিগত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মিউনিসিপ্যাল ট্রেডিং ও সমবায় ভাণ্ডার

মিউনিসিপ্যালিটিকেই সাধারণতঃ সহরের আলো যোগানো, ট্রাম চালানো, জল সরবরাহ করা প্রভৃতি কাজের ভার নিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির এইরূপ কাজের সঙ্গে সমবায় ভাণ্ডারের কাজের একটা মিল আছে এই যে, যেমন মিউনিসিপ্যালিটির ঐ ধরণের কাজে, তেমনি সমবায় ভাণ্ডারে, খাদকরাই সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে তাদেরই

নির্ব্বাচিত লোকদের দ্বারা তাদের বিশেষ বিশেষ অভাব মেটাচ্ছে, আর তাদের অভাব মেটাবার জন্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলি খাড়া করা হচ্ছে, তা কেবল তাদেরই স্বার্থে চালিত হচ্ছে।

কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে।—

(১) মিউনিসিপ্যালিটি যখন দেখে যে একটু দাম কমালে নাগরিকদের সুবিধা বা আরাম খুব বেশী বাড়ে, তখন খরচের চেয়েও কম দামে যোগানো চলে। ভাণ্ডারগুলির কিন্তু অন্ততঃ খরচ পোষাবার মত দামও চাই-ই। লোকসানের টাকা মিউনিসিপ্যালিটি অন্য ট্যাক্স হ'তে পুষিয়ে নিতে পারে, কিন্তু ভাণ্ডারের সে রকম কোন আয় নেই।

(২) মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তাদের সাধারণতঃ ব্যবসাবুদ্ধি তেমন থাকে না। কারণ কেবল ব্যবসা-বুদ্ধির ওপরই দৃষ্টি রেখে তাঁদের নির্ব্বাচন করা হয় না। সেই জন্যে কর্ম্মচারীদের ওপর তাঁদের অত্যন্ত নির্ভর ক'রতে হয়। কিন্তু ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষদের ব্যবসা-বুদ্ধি বেশী। তাঁদের নির্ব্বাচনের সময় এই গুণটির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। সুতরাং ভাণ্ডারের কর্ম্মচারীদের কড়া শাসনে রাখা সহজ হয়।

(৩) যেগুলি স্বাভাবিক 'একচেটে' ব্যবসা, মিউনিসিপ্যালিটি সেগুলিতেই কেবল হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু ভাণ্ডারকে সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসাতেই নামতে হয়।

(৪) মিউনিসিপ্যালিটির সীমা নির্দ্দিষ্ট, তাকে ইচ্ছামত বাড়ানো চলে না। কিন্তু ভাণ্ডারের সীমা ইচ্ছামত বাড়ানো চলে। একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার ও তার অধীনে অনেকগুলি শাখা ভাণ্ডার খুলে একটি খুচরা ভাণ্ডারের কর্ম্মক্ষেত্রও বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুয়েরই খাদকদল একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বসবাস করে।

ভাণ্ডার আন্দোলন—'ইউনাইটেড্ কিংডম'

জগতে প্রথম ইংল্যাণ্ডেই 'শিল্প-বিপ্লব" অর্থাৎ হাতের সাহায্যে উৎপাদনের স্থানে কলের সাহায্যে উৎপাদন দেখা দেয়। শিল্প-বিপ্লবের আগে রাষ্ট্রই জিনিষপত্রের দর ঠিক করে দিত। কিন্তু ঐ বিপ্লবের পর ফ্যাক্টরী অধিকারীদের আন্দোলনে বাধ্য হ'য়ে রাষ্ট্রকে শাসনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত ক'রতে হয়। রাষ্ট্রকর্তৃক জিনিষপত্রের মূল্য নির্দ্দেশও বন্ধ হ'য়ে যায়। অপরদিকে কারখানার অধিকারীরা ইচ্ছামত দরে নিজেদের ভাণ্ডার থেকে জিনিষপত্র কিনতে মজুরদের বাধ্য ক'রত। এর ফলে মজুররা জিনিষপত্রের দর কমাবার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে বাধ্য হ'ল। এই রকম ক'রে অবস্থার চাপে ইংল্যাণ্ডে সমবায় ভাণ্ডারের জন্ম হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডে সমবায় ভাণ্ডারের কেবল যে জন্মই হ'য়েছিল তা নয়, ইংল্যাণ্ডের ভাণ্ডারগুলিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। অন্য সকল দেশই ইংল্যাণ্ডের সমবায় ভাণ্ডারকে আদর্শ ব'লে মেনে নেয় এবং ঐ মাপকাঠি দিয়েই নিজেদের সাফল্যের বিচার করে থাকে।

ইংল্যাণ্ডের ভাণ্ডারগুলির যে সকল আইনগত অধিকার আছে, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:—(১) যারা মেম্বার নয় তাদের কাছেও জিনিষ বিক্রয় করিবার অধিকার; (২) দেনার জন্যে ভাণ্ডারের সসীম দায়িত্ব (লিমিটেড্ লায়েবিলিটি); (৩) আইনের চক্ষে ভাণ্ডারের ব্যক্তিত্বলাভ। এর ফলে ভাণ্ডার জুয়াচোর কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনতে পারে; (৪) অন্য সমিতিতে যত ইচ্ছা টাকা খাটাতে পারার অধিকার।

১৯২০ সালে বিলাতে ভাণ্ডার আন্দোলনের অবস্থা কেমন ছিল তা নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি থেকে অনুমান করা যাবে:—

সভ্যের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ।

মূলধনের পরিমাণ ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভাণ্ডারের সংখ্যা ১৩৭৯।

খুচরা ভাণ্ডারগুলি মিলিত হ'য়ে ২টি পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপিত করেছে। ইংল্যণ্ডের খুচরা ভাণ্ডারগুলির দ্বারা স্থাপিত হয়েছে 'কনজিয়ুমার্স হোলসেল সোসাইটি'। স্কটল্যণ্ডের খুচরা ভাণ্ডারগুলির চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে 'স্কটিশ হোলসেল সোসাইটি'। খুচরা ভাণ্ডারই কেবল এদের মেম্বার হ'তে পারে। ১৯১৭ সালে প্রথমটির মেম্বারের সংখ্যা ছিল ১১৯২, দ্বিতীয়টির ছিল ২৬৩। প্রথমটির কেন্দ্র হচ্ছে ম্যাঞ্চেষ্টারে, দ্বিতীয়টির গ্ল্যাসগোতে। এ দুটি সহর ছাড়া অন্যান্য সহরে এ দুটি ভাণ্ডারেরই ডিপো আছে। ভাণ্ডার দুটি চালাবার জন্যে একটি ক'রে ম্যানেজমেণ্ট কমিটি আছে। এই ম্যানেজমেণ্ট কমিটির অধীনে ডিরেক্টারেরা ভাণ্ডার চালিয়ে থাকেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের ভাণ্ডার চালাবার জন্যে ৩২টি মাইনে-করা ডিরেক্টার আছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মাইনে বছরে ৯০ পাউণ্ড।

পাইকারী ভাণ্ডার দুটির কাজ হচ্ছে—(১) খুচরা ভাণ্ডারগুলি জিনিষপত্র পাইকারী ভাণ্ডার ভিন্ন অন্যত্র যেন না কেনে, সে বিষয়ে নজর রাখা; (২) পাইকারী হিসাবে জিনিষপত্র কেনা: (৩) কয়েকটি জিনিষ তাদের তত্ত্বাবধানেই উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা; (৪) ক্রীত বা উৎপন্ন জিনিষগুলা খুচরা ভাণ্ডারগুলাকে যোগানো।

জিনিষপত্র কেনবার জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের ভাণ্ডারটি ইংল্যণ্ডের প্রধান প্রধান স্থানে, ইয়োরোপে ও আমেরিকায় এজেণ্ট রেখে থাকে। এই ভাণ্ডারটি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জিনিষ উৎপন্ন করে:—জামা, কাপড়, ধাতুদ্রব্য, বুট ও জুতা, সাবান, তামাক, বিস্কুট ও কেক, ব্রুশ,

আসবাবপত্র। ছাপার কাজ, বই বাঁধাই ইত্যাদিও করে থাকে। এতদ্ব্যতীত ইংল্যণ্ডের ভাণ্ডারটি ইংল্যণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় ময়দার কলওয়ালা, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চা-ব্যবসায়ের ⅙ অংশ এর হাতে; ইংল্যণ্ডে এর ৩০,০০০ একরের উপর জমি আছে। ক্যানাডাতে শস্যক্ষেত্র ও সিলোনে (দুটি ভাণ্ডারেরই) চায়ের বাগান আছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের ভাণ্ডারটি নিজের খুচরা ভাণ্ডারগুলির ব্যাঙ্কিং ও ইন্‌শিওরেন্সের কাজও করে থাকে। ইংল্যণ্ডের পাইকারী ভাণ্ডারটি যে কত বড়, তা এবার বোঝা বোধ হয় শক্ত হবে না।

বিলাতের খুচরা ভাণ্ডারগুলিও উৎপাদনে যোগ দিয়েছে। তাদের সমবেত উৎপাদনের পরিমাণ পাইকারী ভাণ্ডারসমূহের উৎপাদনের তুলনায় নগণ্য ত নয়ই, বরং ১৯১৬ সালে বেশীই ছিল।

কৃষিজাত দ্রব্যাদি সস্তায় পাওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষির কাজে কেবল যে পাইকারী ভাণ্ডারগুলি যোগ দেয় তা নয়, খুচরা ভাণ্ডারগুলিও চাষবাস করে থাকে। ১৯১৮ সালে ১১৬টি ভাণ্ডার সমিতি (খুচরা ও পাইকারী) ১,১৮৩,১৮৫ পাউণ্ড চাষের কাজে লাগায় এবং তাতে লাভ হয় ২৪,৩০৯ পাউণ্ড।

সমবায় ভাণ্ডারগুলি হয় নিজেরাই চাষ করতে চায়, না হয় মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ হয় নি এমন চাষীদের কাছে থেকে সস্তায় শস্যাদি কিনে নিতে চায়। অপরদিকে, চাষীরা নিজেদের কৃষিসমিতি খুলে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে এবং যথাসম্ভব উচ্চ দামে শস্যাদি বিক্রী করতে চেষ্টা করছে। সুতরাং উৎপাদন সমিতি ও খাদক সমিতি এই দুই প্রকারের সমবায় সমিতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হ'য়েছে। সকল প্রকার সমবায়ের মধ্যে শৃঙ্খলা ও একতা আনবার জন্যে এবং সমবায় আন্দোলনের প্রসার সাধনের জন্যে যে কো-অপারেটিভ ইউনিয়নটি ইংল্যণ্ডে আছে, তার অন্যতম কাজ হচ্ছে

কোন উপায়ে এই ঘরোয়া যুদ্ধ নিবারণ করা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যতগুলি উপায় অবলম্বিত হ'য়েছে সবগুলিই ব্যর্থ হয়েছে।

শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে ভাণ্ডারগুলির চেষ্টা নিতান্ত নগণ্য নয়। কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের সেণ্ট্রাল এডুকেশন কমিটি নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছে যে, প্রত্যেক ভাণ্ডারকে লাভের শতকরা আড়াই ভাগ শিক্ষার জন্য খরচ ক'রতে হবে। এ ছাড়া এই কমিটিটি শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে নানা ভাবে চেষ্টা ক'রছে—যেমন বুক-কিপিং ও 'ম্যানেজমেণ্ট' শেখাবার জন্যে এবং উপযুক্ত সেক্রেটারী ও হিসাব-পরীক্ষক তৈরী করবার জন্যে টেক্‌নিক্যাল ক্লাস করা; সমবায় সম্বন্ধে ও সাধারণ ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা; ভাণ্ডার সমিতির স্কুলগুলির জন্যে শিক্ষক তৈরী করা; সাধারণ লেখাপড়ার জন্যে ক্লাস করা। ১৯১৮ সালে ২০ হাজারেরও উপর ছেলের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল। স্থানীয় শিক্ষা কমিটিগুলিকে উপদেশ দেওয়া, বই ও একটি মাসিক ('কো-অপারেটিভ এডুকেটর') প্রকাশ করা; একটি সমবায় কলেজ চালানো ইত্যাদি। স্থানীয় ভাণ্ডারগুলি কিন্তু শিক্ষার যতদূর বন্দোবস্ত ক'রতে পারে তা করে নি—অধিকন্তু, তাদের স্কুলে সাধারণ লেখাপড়ার ওপরই জোর দেওয়া হয়, সমবায় প্রণালী শেখ্‌বার ওপর তেমন জোর দেওয়া হয় না।

ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তার নাম হচ্ছে 'উইমেন্‌স গিল্‌ড্'। এর কাজ হচ্ছে, প্রধানতঃ সমবায় আন্দোলনের বিস্তার করা এবং গৌণতঃ এমন সব সামাজিক ও শিল্পবিষয়ক উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা, যাতে মেয়েদের সুবিধা হ'তে পারে। এই 'গিল্ডে'র সভ্যেরা সমবায় ভাণ্ডারগুলি শিক্ষাবিস্তারের জন্যে যে সব কমিটি ক'রেছে, তাদের মেম্বার হ'য়ে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করে থাকেন।

মহাযুদ্ধের সময় বিলাতের সমবায় ভাণ্ডারগুলি কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য কাজ ক'রেছিল :—(১) জিনিষপত্র তৈরী ক'রতে বা পাইকারী কিনতে ঠিক কত খরচ পড়ে, তা গবর্ণমেণ্টকে জানিয়ে জিনিষপত্রের দামশাসনে সহায়তা ক'রেছিল; (২) ভাণ্ডারের প্রতিযোগিতায় বাধ্য হ'য়ে অনেক স্থানে ব্যবসাদার ও উৎপাদকেরা ইচ্ছামত দাম বাড়াতে পারে নি; (৩) গবর্ণমেণ্ট ভাণ্ডারগুলির উৎপাদন-বিভাগ হ'তে অনেক জিনিষের নিয়মিত সরবরাহ পেয়েছিল।

এ পর্য্যন্ত আমরা ইংল্যণ্ডের যে সমস্ত ভাণ্ডারের কথা বলেছি, সেগুলি খাঁটি সমবায়-প্রণালীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইংল্যণ্ডের বড় বড় সহরে এক প্রকারের সমবায় ভাণ্ডার আছে, যেমন—'আর্ম্মি নেভি ষ্টোরস্', 'সিভিল সার্ভিস্ ষ্টোরস্' প্রভৃতি, যেগুলিকে ঠিক সমবায় ভাণ্ডার বলা চলে না। এগুলি সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টের চাকরোদের দ্বারা স্থাপিত। যাঁরা মেম্বার নন্ এরূপ লোকই এই সকল ভাণ্ডারে বেশী কিনে থাকেন। এই সব ভাণ্ডারের লাভ, ক্রয়ের পরিমাণ অনু-সারে ভাগ করা হয় না। যাদের মূলধন দিয়ে এগুলি স্থাপিত, তাদের ও তাদের বংশধরদের মধ্যেই লাভটা ভাগ হয়।

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও ভাণ্ডার-আন্দোলনের বিস্তার যথেষ্ট হ'য়েছে। ১৯২০ সালে রুশিয়াতে ২৫,০০০, ইতালিতে ৪০০০, ফ্রান্সে ৪০০০, ডেন্মার্কে প্রায় ২০০০, হাঙ্গারীতেও প্রায় ২০০০ এবং জার্ম্মাণিতে ১২৯১টা ভাণ্ডার ছিল। ডেন্মার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়াতে বড় বড় পাইকারী ভাণ্ডারও আছে।

ভারতে ভাণ্ডার-আন্দোলন

১৯২০ সালে ইংল্যণ্ডে ১৩৭৯টা সমবায় ভাণ্ডার ছিল। ভারতে ঐ সালে ৪৭৫টা ভাণ্ডার ছিল। এখন ভারতে ৫৬৮টা ভাণ্ডার আছে।

সংখ্যা দেখলে সহজেই বুঝা যায়, ইংল্যাণ্ডের তুলনায় ভারতের ভাণ্ডার-আন্দোলনের স্থান কোথায়! ভারতের কৃষকদের ধারের পরিমাণ কমাবার জন্যে প্রথম হ'তেই ঋণদান সমিতির দিকে বেশী ক'রে নজর দেওয়া হ'য়েছে। ফলে সমবায়ের এ দিকটাতে একেবারেই মনোযোগ দেওয়া হয় নি।

১৯১৮-১৯ সালের পূর্ব্বে সমবায় ভাণ্ডার ভারতে ছিল না বল্লেই হয়। মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই দৈনিক ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দাম বাড়ার জন্যে ও ব্যবসাদারদের অত্যন্ত লাভ করবার চেষ্টার ফলে ভাণ্ডারের সংখ্যা বেশ বাড়ে। কিন্তু ঐ কারণগুলি অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাণ্ডার স্থাপনের উৎসাহ কমতে থাকে এবং এর সংখ্যারও হ্রাস হ'তে থাকে।

ভারতে যে কয়টি ভাণ্ডার স্থাপিত হ'য়েছে সেগুলি হয় গবর্ণমেণ্ট বা মার্চ্চেণ্ট আফিসের কর্ম্মচারীদের দ্বারা, না হয় কলেজের ছাত্র বা বোর্ডিং হাউসের অধিবাসীদের দ্বারা। মাদ্রাজের 'ট্রিপ্লিকেন আর্ব্যান কো-অপারেটিভ্ ষ্টোর' অমৃতসরের "খালাসা কলেজ কো-অপারেটিভ ষ্টোর' প্রভৃতি বিশেষ সফল সমবায় ভাণ্ডারের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতে যে সমবায় ভাণ্ডার সাধারণতঃ ভাল ভাবে চলে না, তার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে কটিকয়েকের উল্লেখ করছি—(১) কমিটির মেম্বারদের ও সেক্রেটারি-ম্যানেজারের ব্যবসা সম্বন্ধে শিক্ষার অভাব; (২) ভাণ্ডার হয় অতিরিক্ত সাবধানতার সঙ্গে, না হয় অতিরিক্ত বিপজ্জনকভাবে চালানো হয়; (৩) ভাণ্ডারের ভার নেবার উপযুক্ত লোকের অভাব; (৪) এরূপভাবে হিসাব রাখা হয় যে, সন্তোষজনক হিসাব-পরীক্ষা শক্ত হ'য়ে উঠে; (৫) সাধারণ সভ্যদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে কমিটির সভ্যদের মধ্যে উৎসাহ, ও ভাণ্ডার থেকেই কেনার

বিষয়ে বিশ্বস্ততার অভাব; (৬) সাধারণ সভার অধিবেশন ও হিসাব মেলানো অনেকদিন পরে পরে হয়; (৭) ভাণ্ডারের জিনিষপত্রের হিসাব মেলাবার জন্যে শ্রেষ্ঠ প্রণালী অবলম্বন না করা—এতে চুরি বাড়ে; (৮) শেয়ার ক্যাপিটালের জন্যে শুধু সুদ না দিয়ে লাভের শতকরা ১২॥০ ভাগ দিয়ে তার পর ক্রেতাদের মধ্যে লাভ ভাগ করা হবে, সাধারণতঃ এইরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকা।

পাশ্চাত্ত্য দেশে ভাণ্ডার-আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে প্রধানতঃ মজুরদের মধ্যে। ভারতে মজুরদের দ্বারা স্থাপিত ভাণ্ডার নেই বল্‌লেই চলে। মজুরদের মধ্যে ভাণ্ডার-আন্দোলন বিস্তারের পথে যে সব বাধা রয়েছে, যেমন—মজুরদের ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব, শিক্ষার অভাব, তাদের জীবনধারণের মাপকাঠি অত্যন্ত নীচু ইত্যাদি। এই বাধাগুলি একে একে সরাতে চেষ্টা ক'রতে হবে। মধ্যবিত্ত ও ছাত্রদের দ্বারাও যতগুলি ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া উচিত, এখনও তার কিছুই হয় নি। মধ্যবিত্তেরা ও ছাত্রেরা সমবায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ও চালাবার নিয়মগুলি শিখে হাতে-কলমে ভাণ্ডার চালিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ভাণ্ডার আন্দোলনের বিস্তারের চেষ্টা করলে, আমরা যে আমাদের বিষম দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারবো, তার সম্ভাবনা নেই বটে; কিন্তু আমরা আমাদের আর্থিক সমস্যার যে কিছু পরিমাণেও সমাধান ক'রতে পারবো, আমাদের স্থূল ব্যবসা-বুদ্ধি যে কিছু পরিমাণেও সূক্ষ্ম হ'য়ে উঠবে, স্বাবলম্বনের ভাব ও স্বায়ত্তশাসনের অভ্যাস কিছু পরিমাণেও যে আমরা লাভ ক'রতে পারবো, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। সুতরাং ভবিষ্যতে আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা সমবায় ভাণ্ডার সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ ও চেষ্টা দেখাবেন, এই আশা করাটা, মনে হয়, নিতান্ত অন্যায় হবে না।

ক্যাপিট্যাল লেভি (সম্পত্তির ওপর চড়া হারে এককালীন কর)

মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতে মজুরদের ওপর খাজানার হার ক্রমাগতই বাড়ছিল। সমর ঋণও বাড়ছিল। এই দেখে ১৯১৬ সনে সিড্‌নি ওয়েব্ তাঁর "এ রেভোলিউশান্ ইন্ ইন্‌কাম্ ট্যাক্‌স" নামক গ্রন্থে প্রস্তাব করেন যে, এক সঙ্গে এমন মোটা টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যার সাহায্যে সমর ঋণ একেবারে মেটানো যেতে পারে বা অনেকটা কমানো যেতে পারে; নয়তো, সমর ঋণের সুদের বোঝা অনেক বছর পর্য্যন্ত জাতিকে বইতে হবে। এই জন্যে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সকল প্রকার ব্যক্তিগত মূলধন হ'তে শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে রাজস্ব নেওয়া কর্ত্তব্য। ১৯১৯ সনে মজুরদল এই নতুন করের সমর্থন করে। ১৯১৯ সনে বিলাতের রাজস্ব সচিব (অষ্টেন চেম্বারলেন) পার্ল্যামেণ্টে বাজেট পেশ কর্‌বার সময় এই প্রকার করের বিরুদ্ধে বলেন যে, ওতে 'ধন সঞ্চয়' ক'মে যাবে, ধন সঞ্চয় না হ'লে শিল্প কারবারের সমূহ ক্ষতি হবে। ঐ বছরই 'ফিনান্স বিল' পার্ল্যামেণ্টে দ্বিতীয়বার পঠিত হবার সময় 'ক্যাপিট্যাল লেভি'সংক্রান্ত একটি সংশোধিত প্রস্তাব আনা হয়; কিন্তু এটি ভোটে হেরে যায়।

১৯২০ সনে হাউস অব্ কমন্স্ একটি 'সিলেক্ট কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির কর্ত্তব্য ছিল—যুদ্ধের সময়ে যারা লাভ করেছে, কেবল তাদের ওপর বিশেষ উচ্চ হারে কর আদায় করা যায় কি না বিবেচনা করা। এই প্রস্তাব "ক্যাপিট্যাল লেভি"র প্রস্তাব হ'তে কিছু বিভিন্ন। এই প্রস্তাবে

"ক্যাপিট্যাল লেহ্বি"র মত সম্পত্তির কিছু অংশ নেবার কথা থাকলেও এটি কেবল যুদ্ধের জন্যে যাঁরা ধনী হ'য়ে উঠেছেন, তাঁদের ওপর বলবৎ হবার কথা হয়। কিন্তু "ক্যাপিট্যাল লেহ্বি"তে কে যুদ্ধের জন্যে ধনসঞ্চয় ক'রেছে, আর কে তা করে নি তা বিবেচনা ক'রবার আদৌ দরকার নেই। যা হোক কমিটি মত দেন যে, এই ধরণের কর আদায়ের পথে যে সব বাধা আছে সেগুলা একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য নয়। তবে, এই ধরণের খাজানা আদায় করা সঙ্গত হবে কি না, সে বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ আছে। এই কমিটির সিদ্ধান্তগুলা শেষ পর্য্যন্ত কোন কাজেই লাগলো না। রাজস্ব সচিব মহাশয় কমিটির মন্তব্য অনুসারে একটি বিল প্রস্তুতের অনুমতি দেন; কিন্তু পার্ল্যামেণ্টে এই কর সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সময় তিনি অসম্মতি জানালেন।

প্রথম হ'তেই বিলাতের ধনী সম্প্রদায় 'ক্যাপিট্যাল লেহ্বির' বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মতে এই প্রকার কর আদায়ের ফলে শিল্প বাণিজ্যের জন্যে মূলধন পাওয়া শক্ত হবে। তাঁরা বল্‌লেন যে, শীঘ্র ঋণ মেটাবার উপায় হচ্ছে আয়ের ওপর বা লাভের ওপর (মূলধন—যা হ'তে আয় বা লাভ পাওয়া যায়, তার ওপর নয়) অধিকতর উর্দ্ধহারে করস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

১৯২৪ সনে মজুরদল বিলাতের শাসন-যন্ত্র নিজেদের দখলে আন্‌লেন। কিন্তু তবুও তাঁরা যে করের জন্যে এতদিন আন্দোলন করে আস্‌ছিলেন, সেই কর স্থাপন ক'রতে পারলেন না। এর কারণ দুটি—(১) অধিকতর জটিল নানা সমস্যায় মজুরদলকে মন দিতে হয়; (২) যে 'উদার নৈতিক' দলের সাহায্য ব্যতীত মজুরদলের প্রাধান্য বজায় রাখা অসম্ভব ছিল, সেই 'উদার নৈতিক' দল এই করের বিরুদ্ধে ছিলেন।

১৯২৭ সনের প্রারম্ভে 'জাতীয় ঋণ ও রাজস্ব' সম্বন্ধে আলোচনা ক'রবার জন্যে একটি কমিটি (কেল্উইন্ কমিটি) গঠন করা হ'য়েছিল। এই কমিটির অধিকাংশ সভ্য 'ক্যাপিট্যাল লেভির বিপক্ষে মত দেন। 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র ফলে বাজার-দর, শেয়ারের দাম, গবর্ণমেণ্টের ঋণের স্থদের হার ও বিদেশে ঋণ-বিষয়ে পসার কি রকম দাঁড়াবে, তার আলোচনা ক'রে তাঁরা বলেন যে, শিল্প-কারবারের ওপর কর স্থাপনই জাতীয় ঋণ মেটাবার একমাত্র উপায়। যুদ্ধের পরে মজুরদের জীবন-যাত্রার মাপকাঠি নামে নি। স্থতরাং তাদের কাছ থেকে তাদের সাধ্যের অতীত কর আদায় করা হয় নি এবং আরও আদায় ক'রলে অন্যায় হবে না।

কমিটির জন কয়েক মেম্বার কিন্তু অধিকাংশের মতে মত দেন নি। তাঁরা নিজেদের মত জাহির ক'রে একটি 'মাইনরিটি রিপোর্ট' লেখেন। তাঁরা বলেন যে 'ক্যাপিট্যাল লেভি' আদায় করা ন্যায়সঙ্গত। আদায় করা অত্যন্ত দুরূহ হ'লেও, অসম্ভব নয়। যদি জনসাধারণের অধিকাংশ, যারা কর দেবে তারা এবং ব্যাঙ্কগুলি (কর আদায়ের জন্যে যাদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক) এই করের সমর্থন করে, তা হ'লে এটা আদায় করা শক্ত হবে না। ঠিক যুদ্ধের পরে এই কর আদায়ের স্থবিধা আরও বেশী ছিল। কারণ, জাতির জীবন যত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে থাকে, ততই এই ধরণের বিরক্তিজনক কর আদায় শক্ত হ'য়ে ওঠে। যা হোক, সাধারণের আপত্তি না থাকলে ১৯২৭ সনের এই কর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তবে, যদি 'ক্যাপিট্যাল লেভি' স্থাপন করা নিতান্তই অসম্ভব হয়, তা হ'লে তাঁদের মতে নিম্নলিখিত একটি নতুন কর স্থাপন করা যেতে পারে:—(১) যাদের বার্ষিক আয় ৫০০ পাউণ্ডের ওপর তাদের কাছে

এই কর আদায় করা হবে; (২) এই কর 'খাটানো টাকার' আয় ও 'সম্পত্তির' আয় উভয় প্রকার আয়ের ওপরই স্থাপিত হবে; (৩) করের 'হার' আয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তে থাকবে; (৪) নতুন করের 'হার' বর্ত্তমান আয়কর ও 'সুপার ট্যাক্স' উভয়ের হার যে পরিমাণে বাড়ে, অন্ততঃ সেই পরিমাণে বাড়বে। মোটের ওপর এই কর হ'তে বার্ষিক ১০ কোটি পাউণ্ড আয় হবে অনুমান করা হয়।

'ক্যাপিট্যাল লেভির' সঙ্গে প্রস্তাবিত নতুন করের পার্থক্য অনেক। এটা মোটের ওপর আর একটি উচ্চতর হারের আয়-কর ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু 'ক্যাপিট্যাল লেভি' আয়ের ওপর কর নয়, যে মূলধনের সাহায্যে 'আয়' লাভ হয় এটা সেই মূলধনের একটু মোটা অংশ লাভ করবার চেষ্টা।

১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে 'ব্লাকপুলে' মজুরদলের বার্ষিক সভায় উপরি উক্ত নতুন করের সমর্থন করা হয়। যিনি প্রস্তাবটি তোলেন তিনি দেখান যে, এই নতুন করের সুবিধাগুলি এইরকম:—

(১) জাতীয় ঋণ শীঘ্র শোধ করা সম্ভব হবে; (২) দরিদ্রের খাদ্যের ওপর উচু হারে যে কর ব'সেছে, তা তুলে দেওয়া সম্ভব হবে; (৩) বিলাতের সমর-ঋণের বেশীর ভাগ বিলাতেরই ধনীদের প্রাপ্য; যদি 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র সাহায্যে তাদের সব প্রাপ্য এখন চুকিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে টাকার দিক্ হ'তে তারা ঠিক প্রাপ্যটি পেলেও, বাজারদর ইতিমধ্যে কমার দরুণ টাকার ক্রয়-ক্ষমতা বেড়ে যাওয়াতে, তারা তাদের প্রাপ্যের দ্বিগুণ পেয়ে যাবে; 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র বদলে এই নতুন কর স্থাপন করলে তারা এই অতিরিক্ত লাভটি ক'রতে পারবে না; (৪) ৫০০০ পাউণ্ড বা তদতিরিক্ত মূলধনওয়ালা যে আড়াই লাখ লোকের কাছ থেকে ক্যাপিট্যাল লেভি আদায়ের

প্রস্তাব হ'য়েছিল, তাদেরই কাছ থেকে এই নতুন কর আদায় হবে; (৫) এই কর আদায়ের জন্যে নতুন কোন প্রতিষ্ঠান খাড়া ক'রবার দরকার নেই; আয়করের বর্ত্তমান অফিসের সাহায্যেই এটা আদায় করা চলবে; (৬) টাকাওয়ালা লোকদের বা ব্যাঙ্কগুলার এই ধরণের করের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রবার সম্ভাবনা নেই; (৭) মজুরদল এইবার শাসন-যন্ত্রে অধিকার পেলেই প্রথম বছরেই এই ধরণের কর স্থাপন ক'রতে পারবে; (৮) গত ৭ বৎসরের মধ্যে বাজার-দর ক'মে যাওয়ায় দরুণ যাদের ধনসম্পত্তির দাম অত্যন্ত বেড়েছে, সেই সব লোকের টাকা আরও অধিক পরিমাণে জনসাধারণের হাতে আসবে।

অতি অল্পসংখ্যক মজুরই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়; এ দেখে মনে হয় যে, আগামী "সাধারণ নির্ব্বাচনে" মজুরদলের প্রোগ্রামে এই করের প্রস্তাব বিশেষ স্থান পাবে।

যা হোক, মজুরদল এইবার 'ক্যাপিট্যাল লেভি'কে আপাততঃ মুলতুবি রাখলো। ভবিষ্যতে আর কখনও 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র প্রস্তাব উঠবে কিনা তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

ইয়োরোপে ফ্রান্স ব্যতীত প্রায় সব দেশই মূলধন ও ধনসম্পত্তির ওপর উচ্চহারে কর বসিয়ে স্ব স্ব জাতীয় ঋণ কমাবার ব্যবস্থা ক'রেছে। ইংল্যাণ্ডে এ নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা হ'য়েছে বিস্তর; 'তাত্ত্বিক' বিশ্লেষণও বড় কম হয় নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নি। যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তাও আপাততঃ লুপ্ত হ'ল।

ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার বর্ত্তমান ঝোঁক্ কোন্ দিকে ?

ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতেরা কখনও "তত্ত্বের" দিকে ঝোঁকেন, কখনও বা "ঘটনা ও তথ্যের" আলোচনার দিকেই ঝোঁকেন। যখন তাঁরা একটির দিকে ঝোঁকেন তখন অপরটির দিকে তাঁদের প্রায়ই নজর থাকে না। গত দশ বৎসর হ'তে তাঁরা ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার বাস্তব দিক্‌টার আলোচনার ওপরই খুব জোর দিচ্ছেন। "ঘটনা" বা তথ্যের এবং "অঙ্কের" সংগ্রহ যে বিরাটভাবে চল্‌ছে, তার একটি বিশেষ প্রমাণ হচ্ছে গবর্মেণ্টের রিপোর্টগুলা। রিপোর্টগুলাতে জাতির সকল প্রকার আর্থিক চেষ্টা সম্বন্ধেই অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে। নানা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃকও অনেক "অঙ্ক" এবং "তথ্য" সংগৃহীত হ'য়েছে। সত্য কথা বল্‌তে গেলে, ধনবিজ্ঞান বিদ্যার সৃষ্টি হ'তে এ পর্য্যন্ত গবেষণা ক'রবার উপযুক্ত এত মাল পূর্ব্বে আর কখনও সংগৃহীত হয় নি। এইগুলাকে ভালভাবে আলোচনা ক'রতে হ'লে একটা প্রকাণ্ড গবেষক-দলের আমরণ পরিশ্রম আবশ্যক। জনকয়েকের বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় হবে না। কিন্তু সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত গবেষকের দল এখনও দেখা যাচ্ছে না। বিলাতে এই অভাব পূরণ ক'রবার জন্যে স্যর যোশিয়া ষ্ট্যাম্পের নেতৃত্বে একটি "সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ্চ ট্রেনিং কমিটি" স্থাপন করা হ'য়েছে। যাতে ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিদ্যার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নতি সাধন হয়, তার চেষ্টা ক'রবার জন্যেই এই কমিটির প্রতিষ্ঠা। আর্থিক ঘটনাগুলাকে বোঝাবার ক্ষমতা অর্জ্জন ক'রতে হ'লে যে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষার আবশ্যক, তা পেতে সাহায্য ক'রবার জন্যে এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের অর্থসাহায্যও

ক'রবেন। এতদ্ব্যতীত, সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলার মধ্যে যাতে পারিভাষিক ও প্রণালীবিষয়ে ঐক্য রক্ষিত হয়, সেদিকেও তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন।

বিলাতের "লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স অ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল সায়েন্স" লণ্ডন সহরের সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় একটা অনুসন্ধান বা গবেষণা আরম্ভ ক'রবেন স্থির হ'য়েছে। লণ্ডনে যতগুলা শিল্প কারবার আছে সেই সবগুলার প্রত্যেক বিভাগের আলোচনাও করা হবে। বিলাতের জাতীয় স্বাস্থ্য-বীমা আইনগুলা, বার্দ্ধক্য পেনশান্, আইন এবং ফ্যাক্টরী আইনগুলা দারিদ্র্য কতদূর কমাতে পেরেছে, তারও অনুসন্ধান করা হবে। অনুসন্ধানটি শেষ হ'তে ৫ বৎসর লাগবে। * এই ধরণের অনুসন্ধান চালাবার যে চেষ্টা হচ্ছে, এ থেকেই বোঝা যায়, ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দের বর্ত্তমান ঝোঁক কোন্ দিকে।

"ঘটনা" বা "তথ্যের" সংগ্রহ এবং সেগুলার বিশ্লেষণের ফলে ধন-বিজ্ঞানের "তত্ত্বসমূহের" কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু নতুন নতুন "তত্ত্ব" অধিকার ক'রতে হবে বা পুরাতন "তত্ত্ব"গুলাকে পরিবর্ত্তিত ক'রতে হবে, এই উদ্দেশ্যে "ঘটনার" সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ক'রলে চলবে না। জাতির আর্থিক জীবনের স্বাস্থ্য কিরূপে বজায় থাকে? আর্থিক বিপদ্‌গুলা পূর্ব্ব থেকে সময় থাকতে অনুমান ক'রে তাদের নিবারণের কি উপায় করা যায়?—এগুলাই ধনবিজ্ঞানবিদ্যার বর্ত্তমান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই অগ্রসর হচ্ছে। ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা যখন এইভাবে চল্‌ছে তখন সহজেই বলা যেতে পারে যে, জাতির কল্যাণের সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের একটা ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হ'য়েছে।

* এই অনুসন্ধান আরম্ভ হ'য়েছে, একখানা রিপোর্টও বেরিয়েছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেকার-সমস্যা

মাদ্রাজের শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্যা বেশ জটিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নিম্নলিখিত অঙ্কগুলা হ'তে তা বুঝতে পারা যাবে,—

(১) বেকার-সমস্যার অনুসন্ধানের জন্যে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে কমিটি গঠিত হ'য়েছিল, সেই কমিটি জনৈক সরকারী কর্ম্মচারীর সাহায্যে মাসিক ৩৫৲ টাকা মাইনের একটি কেরাণীগিরির বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপিয়ে ৬৬৬টি আবেদন পেয়েছিলেন। আবেদনকারীদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট ৩০ জন, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ ৬১ জন, হাই স্কুল পাশ ৬৯৪ জন, হাই স্কুলে পাশ নহে এরূপ ৩৮১ জন।

(২) একটি ব্যবসাদার কোম্পানী ঠিক ঐরূপ একটি বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ৭৮৭টি আবেদন পেয়েছিলেন।

(৩) মান্দ্রাজে বৎসরে গড়ে প্রায় ১৪০০০ শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক স্কুল কলেজ হ'তে বেরোয়; কিন্তু কাজ খালি হয় গড়ে মাত্র ৭০০টি।

(৪) কেরাণীদের চাকুরীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমছে, অথচ শিক্ষিতদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। ১৯১১ হ'তে ১৯২১ সনে গবর্ণমেণ্টের চাকরেোদের সংখ্যা শতকরা ১১½ ভাগ, মিউনিসিপ্যাল ও লোক্যাল বোর্ডের চাকরেোদের সংখ্যা শতকরা ২১ ভাগ এবং স্বাধীন ব্যবসায়-রত শিক্ষিতদের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ কমেছে; অথচ ১৯১৫ হ'তে ১৯২৫ সনের মধ্যে গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক, ইণ্টার-

মিডিয়েট পাশকরাদের সংখ্যা তিন গুণেরও অধিক এবং হাই স্কুল পাশকরাদের সংখ্যা আড়াই গুণেরও অধিক বেড়েছে।

(৫) গত ৩ বৎসরের অঙ্ক হ'তে দেখা যায় যে, গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ, ইণ্টারমিডিয়েট পাশকরাদের মধ্যে শতকরা ১৬ ভাগ, হাই স্কুল পাশকরাদের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ এবং হাই স্কুল পাশ-না-করাদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ মাত্র স্থায়ী কাজ পেয়েছে।

যারা কোন 'বিশেষ ব্যবসার' জন্য শিক্ষিত, তাদের অপেক্ষা যারা কেবল সাধারণ শিক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যেই বেকার-সমস্যা প্রবলতর। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা কৃষি বা শিল্পের শিক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে বেকার-সমস্যা নেই বললেই চলে।

উকীল ও শিক্ষকদের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত বেশী। এদের মধ্যে বেকার-সমস্যা খুবই প্রবল। ডাক্তারদের মধ্যে বেকার-সমস্যা আছে বটে, কিন্তু তাঁরা সহরে ভিড় না ক'রে প্রদেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লে যথেষ্ট কাজ পেতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারদের বেকার-সমস্যা দেশের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে দূরীভূত হ'তে বাধ্য।

বেকার-সমস্যার কারণগুলা নিম্নরূপ :—

(১) যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্টের অনেক কেরাণী আবশ্যক হ'য়েছিল। যুদ্ধের পর তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়; এই সকল কর্ম্মচ্যুত কেরাণী শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বাড়িয়েছে।

(২) প্রতি বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টকে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের মোটা চাঁদা দিতে হয়। এর জন্যে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে অন্যান্য দিকে খরচ কমাতে হ'য়েছে। ফলে গবর্ণমেণ্ট হ'তে যারা কাজ প্রেত, এরূপ অনেক কোম্পানী বা ব্যবসাদার কাজ কমাতে ও পুরাতন কর্ম্মচারীদের ছাড়াতে বাধ্য হ'য়েছে।

(৩) মাদ্রাজের ব্যবসাদারদের অনেক বাজার হস্তচ্যুত হওয়াতে উৎপাদন কমাতে হ'য়েছে। সুতরাং কাজের অভাব আরও বেড়েছে।

(৪) ঋণ-গ্রহণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে বাজার-দর বেড়েছে। এর ফলে বিনিময় হারের ওলট-পালট হওয়াতে ব্যবসার ক্ষতি ও তার ফলে বেকার-সমস্যার বৃদ্ধি ঘটেছে।

(৫) মাদ্রাজবাসীদের দুটি ভ্রান্ত ধারণা বেকার-সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে:—

প্রথমটি হচ্ছে এই যে, লেখাপড়ার উদ্দেশ্যই হয় চাকুরী করা, না হয় ওকালতি করা। লেখাপড়া না শিখলে চাকুরী পাওয়া যাবে না বা উকীল হওয়া যাবে না; সুতরাং লেখাপড়া শেখা আবশ্যক। এই ধারণার গোড়া পত্তন হয় ১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে, যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে শিক্ষিত কেরাণী এবং বিচারকদের সাহায্যার্থ হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ লোক পাবার জন্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ক'রতে বাধ্য হন। সেই সময় হ'তেই লোকের মন গবর্ণমেণ্টের চাকুরীর দিকে ঝুঁকেছে—কারণ গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পেলে ভাল মাহিনা ও বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌শন্ পাওয়া যায় এবং শীঘ্র কাজ হারাবারও সম্ভাবনা থাকে না। এখনও এই মনোভাব তিরোহিত হয় নি। ওকালতিতে পূর্ব্বে সকলেই দু পয়সা উপার্জ্জন ক'রতে পারত; কিন্তু এখন উকীলদের মধ্যে অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থও অর্জ্জন ক'রতে পারেন না; তবুও যে ওকালতির প্রতি যুবকদের আকর্ষণ ঘোচে না, তার কারণ এই যে ওকালতিতে সুদূর ভবিষ্যতে প্রচুর উপার্জ্জনের আশা আছে, এবং উকীল গোষ্ঠির অন্তর্গত হ'লেই সমাজে সম্মানের আসন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা এই যে, কৃষির কাজ ছোটলোকের কাজ—

ভদ্রলোকের বা শিক্ষিতের যোগ্য কাজ নয়। কৃষির দ্বারা মোটামুটি খাওয়া-পড়া চল্‌তে পারে; কিন্তু বড়লোক হওয়া সম্ভব নয়, এরূপ ধারণাও আছে।

(৬) জাতিভেদ প্রথার দরুণ মজুরের চাহিদা অনুযায়ী মজুরের যোগান নিয়মিত হওয়া অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; এতেও বেকারের সংখ্যা বেড়েছে।

(৭) মাদ্রাজে এখন যে শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে, তা হয়ত ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হ'য়েছে; এখন আবশ্যক, নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা-প্রণালী, যার সাহায্যে যুবকেরা বিবিধ টেক্‌নিক্যাল বিষয় শিক্ষা পেতে পারে এবং চাকুরীর আশায় ব'সে না থেকে নানা প্রকার নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি ক'রতে পারে।

বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য :—

(১) লেখাপড়া যে কেবল চাকুরী বা ওকালতি ক'রবার জন্যে নয় এবং চাষের কাজ যে ছোটলোকের কাজ নয়, তা ছাত্রদের ও অভিভাবকদের বোঝাবার জন্যে খবরের কাগজে লেখালেখি এবং স্কুলে ও স্কুলের বাহিরে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা।

(২) যুবকেরা যাতে কৃষির দিকে মনোযোগী হয় তজ্জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে :—

(ক) ভদ্র-কৃষকদের জন্যে কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করা। নিম্ন-শ্রেণীর কৃষকদের সঙ্গে না মিশে থাকবার সুবিধা পেলে হয়ত ভদ্রলোকের কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে তত দ্বিধা থাকবে না।

(খ) ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কৃষককে বেছে ভারতের বাইরে নানা দেশের কৃষিক্ষেত্র দেখাতে পাঠানো।

(গ) অ-কর্ষিত ভূমি যুবকদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়া এবং ঋণদান ও অন্যান্য উপায়ে তাদের সাহায্য করা।

(ঘ) প্রাথমিক স্কুলসমূহের সংখ্যা বাড়ানো এবং এরূপ প্রাথমিক স্কুলের সৃষ্টি করা, যার দ্বারা ছাত্রদের কৃষি-বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা হয় এবং কৃষির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।

বেকার-সমস্যা অত্যন্ত জটিল সমস্যা। আর্থিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জ্জাতিক নানাবিধ কারণের জন্যে কর্ম্মাভাবের সৃষ্টি হয়। সুতরাং, বেকার-সমস্যার শীঘ্র সমাধান ক'রবার জন্যে কোন বিশেষ একটি উপায় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কারণগুলা বুঝে, এবং কি উপায়ে বেকার-সমস্যা দূরীভূত হ'তে পারে তা জেনে নিয়ে, দেশের লোকদেরই এ বিষয়ে প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রতে হবে।]

ভারতের লোকসংখ্যা-সমস্যা

ভারতের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে অনেক কথাই ভেবে দেখার যোগ্য। কয়েকটির উল্লেখ করা যাচ্ছে :—

(১) এখানে জন্মের হার অত্যন্ত বেশী, মৃত্যুর হারও অত্যন্ত বেশী ; ফলে লোকবৃদ্ধি হয় অত্যন্ত কম পরিমাণে ; ফ্রান্স ব্যতীত অন্য কোনও দেশে এত কম হারে লোক বৃদ্ধি হয় না।

(২) অন্যান্য দেশের তুলনায় মোট লোক-সংখ্যার অনুপাতে এখানে ১০ বৎসরের নিম্নবয়স্কদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অথচ ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্কদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যারা উপার্জ্জনক্ষম নয় তাদের সংখ্যা অধিক, আর যারা অপেক্ষাকৃত বেশী উপার্জ্জনক্ষম তাদের সংখ্যা কম হওয়াতে দেশের যে সমূহ আর্থিক ক্ষতি তাতে সন্দেহ নেই।

(৩) ২০ থেকে ৫০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের (যারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জনক্ষম) সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় মোট সংখ্যার অনুপাতে নিতান্ত কম নয়। এটা মন্দের ভাল।

(৪) এখানে জীবনের স্থায়িত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

(৫) জন্মমাত্র জীবনের আশা, ভারতে ২২॥০ বৎসর ; ইয়োরোপীয় দেশগুলাতে ৪০ বৎসরের কম নয় ; তবে, শিশুমৃত্যুহার অত্যন্ত বেশী ব'লে ভারতে ১০ বৎসর বয়সে জীবনের আশা, শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ে। ইয়োরোপে বাড়ে শতকরা ২৪ ভাগ মাত্র।

(৬) ইয়োরোপের দেশগুলাতে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক ; কিন্তু ভারতে এর বিপরীত। এখানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম।

(৭) ১০ থেকে ২০ বৎসরের স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম। এই বয়সে স্ত্রীলোকদের প্রথম গর্ভধারণ ক'রতে হয় ব'লেই বোধ হয় সংখ্যার এই অল্পতা।

(৮) ২০ থেকে ৩০ বৎসরের পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের তুলনায় কম। এই বয়সে শক্তির তুলনায় পুরুষদের অত্যন্ত বেশী খাটতে হয়। এই জন্যেই বোধ হয় পুরুষদের সংখ্যা কম।

(৯) ৩০ থেকে ৬০ বৎসরের স্ত্রীলোকদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কম। খুব সম্ভবতঃ এর কারণ এই দুটি :—(ক) নিম্নশ্রেণীর পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকদের ঢের বেশী কঠোরতার সঙ্গে যুঝ্‌তে হয় : (খ) মুসলমান ও উচ্চ জাতের হিন্দুনারীদের পর্দ্দা-প্রথা এর জন্যে বিশেষ ক'রে দায়ী। এতে নারীদের স্বাস্থ্য শীঘ্র ভেঙ্গে পড়ে।

(১০) বিধবা-বিবাহ চলন না থাকায় দুটি কুফল দেখা দিয়েছে :— (ক) জন্মহারের হ্রাস হ'য়েছে ; (খ) বিপত্নীকেরা অল্প-বয়স্ক কুমারীদের বিবাহ ক'রতে বাধ্য হচ্ছে।

ভারতের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একটা কথা আমাদের বিশেষ মনে রাখা উচিত। আমরা যখন-তখন ভাবি—ভারতে ত্রিশ-বত্রিশ কোটি লোকের বাস, ভারত কি একটা সহজ দেশ! যখন আমরা এই ত্রিশ-বত্রিশ কোটীর হিসেব করি, তখন আমরা ভুলে যাই যে এই কোটী কোটীর অতি ক্ষুদ্র অংশই স্বাস্থ্যে-শক্তিতে-বীর্য্যে মানুষের মত মানুষ গণ্য হবার মত—অধিকাংশই একেবারে জরাজীর্ণ। জগতের প্রধান দেশগুলার লোকসংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু তাদের কর্ম্মপটু লোকের সংখ্যা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। এই জন্যে ভারতীয়দের স্বাস্থ্য, শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা বাড়াবার উপায় বাৎলানো ও তা কাজে পরিণত করা, আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অনেকের ধারণা যে, ভারতে লোকসংখ্যা বড় বেশী, জন্ম-শাসন ভিন্ন ভারতের গত্যন্তর নেই। এই কথা একেবারে মানা চলে না। বিশেষ বিশেষ পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্যে জন্ম-শাসনের সার্থকতা থাকৃতে পারে, কিন্তু জাতির দিক্ থেকে জন্ম-শাসনের চেয়ে কি ক'রে ধনোৎপাদন বাড়ানো যায়, সেই দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। আর্থিক জীবন আধুনিক উপায়ে সুনিয়ন্ত্রিত হ'লে বত্রিশ কোটী লোককে পোষা ভারতের পক্ষে এমন কিছু শক্ত কথা নয়।

সংরক্ষণশুল্কের কুফল

যুদ্ধের পর জগতে যে আর্থিক বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হ'য়েছিল, তা শোধরাবার জন্যে ১৯২০ সনের ব্রুসেলস্ ইকনমিক কনফারেন্স বল্‌লেন. "যুদ্ধের সময় গবর্মেণ্টগুলার খরচ মেটাবার জন্যে অধিক পরিমাণে মুদ্রা বের করাই এই দুরবস্থার জন্যে দায়ী।" একে একে ইয়োরোপের গবর্মেণ্ট-গুলা নিজ নিজ দেশে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়ে আনলো, কিন্তু তবুও এই আর্থিক দুরবস্থা দূর হ'ল না। তখন বোঝা গেল যে, যুদ্ধের পর আর্থিক বিশৃঙ্খলার স্থষ্টির মধ্যে মুদ্রাধিক্যই একমাত্র কারণ নয়। ১৯২৭ সনের জেনেহ্বার ইকনমিক কনফারেন্স আবার অনুসন্ধান আরম্ভ ক'রলেন এবং কারণগুলা আলোচনা ক'রে ইয়োরোপের আর্থিক রোগ সারাবার উপায়গুলাও ব'লে দিলেন। এই সম্পর্কে জেনেহ্বা কনফারেন্স এই বিশেষ মূল্যবান্ নীতিটি লিপিবদ্ধ করেন—"জগতের এক দেশের আর্থিক স্বাস্থ্য-লাভ অন্যান্য সকল দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ; যদি কোন দেশ অন্যান্য দেশের সমৃদ্ধির ক্ষতি ক'রে কোন বাণিজ্যনীতি চালাতে প্রবৃত্ত হয়, তা হ'লে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তারও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।"

শেষোক্ত নীতিটি কতদূর সত্য, তা যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের জগতের প্রায় সর্ব্বত্র কৃষির, ও ইয়োরোপীয় কারখানাশিল্পের, দুরবস্থা হ'তে বেশ বোঝা যাবে।

কৃষি-প্রধান দেশগুলিতে (ও অন্যত্রও) কৃষির অবস্থা যে শোচনীয় তার প্রমাণ কি? প্রাগ্‌যুদ্ধযুগে কৃষিজাত ও কারখানাজাত দ্রব্যগুলার

যে দর ছিল, তার সঙ্গে এখনকার কৃষিজাত ও কারখানাজাত দ্রব্যের দরের তুলনা দ্বারাই কৃষির প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায়। বিলাতের আমদানির অর্দ্ধেকেরও অধিক কৃষিজাত দ্রব্য। রপ্তানির ⅘ ভাগ কারখানাজাত দ্রব্য; বিলাতের রপ্তানির ইন্‌ডেক্স নাম্বার (১৯১৩ সনের) যখন ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত আমদানীর ইণ্ডেক্স নাম্বা-রের তুলনায় যথেষ্ট কম দেখা যাচ্ছে, তখন কৃষিজাত দ্রব্যের দর যে বিশেষ কমেছে, তা বোঝা শক্ত নয়। নিউজিল্যাণ্ডের রপ্তানির শত-করা ৯৪ ভাগ কৃষিজাত দ্রব্য, আমদানির ⅘ ভাগ কারখানাজাত দ্রব্য। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত নিউ-জিল্যাণ্ডের আমদানির ইণ্ডেক্স নাম্বার রপ্তানীর ইণ্ডেক্স নাম্বার অপেক্ষা যথেষ্ট কম; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কৃষিজাত ও শিল্পজাত উভয় প্রকার দ্রব্যই প্রায় সমান পরিমাণে আমদানি ও রপ্তানি ক'রে থাকে। সুতরাং আমদানি ও রপ্তানির ইণ্ডেক্স নাম্বার দেখে যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ব্বাণিজ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বা অন্যান্য দেশের পুঁজির অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বোঝা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ১৯১৯ হ'তে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত কৃষিজাত দ্রব্যের দরের ইণ্ডেক্স নাম্বার কারখানাজাত দ্রব্যের দরের তুলনায় বরাবর কম ছিল। এ হ'তে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষির অবস্থা বোঝা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকের আয় কিরূপ ক'মছে (১৯১৯ সন হ'তে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত কৃষকদের মাথাপিছু আয় শতকরা ৪৯ ভাগ কমে-ছিল; কিন্তু অন্যান্য পেশার লোকের মাথাপিছু আয় শতকরা ৩ ভাগ মাত্র কমেছিল; ১৯২৫ সনে অন্যান্য পেশার লোকের আয় তাদের ১৯১৯ সনের আয়কে ছাড়িয়ে উঠেছিল, কিন্তু কৃষকের আয় তথনও ১৯১৯ সনের আয়ের শতকরা ২৮ ভাগ কম ছিল) এবং কৃষিতে কত পরিমাণ মূলধনের লোকসান হচ্ছে (১৯২০ থেকে ১৯২৬

সন অবধি মোট লোকসানের পরিমাণ ২০,·০০,০০০০,০০ ডলার)
এ থেকেও যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির অবস্থা কিরূপ তা বোঝা যায়। কানাডা, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও ১৯১৩-১৪ সনের তুলনায় ১৯২০ সন হ'তে ৫।৬ বৎসর উক্ত দুইপ্রকার দ্রব্যের দরের ইণ্ডেক্স নাম্বারে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রায় ১৯২০ সন থেকে জগতের সর্ব্বত্রই যে কৃষির দুরবস্থা আরম্ভ হ'য়েছে, তা বোধ হয়, এখন বোঝা শক্ত হবে না।

অপরদিকে, ইয়োরোপের কারখানাশিল্পের যে অংশ রপ্তানির ওপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে, তারও অবস্থা সুবিধার নয়। বিলাতে বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইয়োরোপের অন্যত্র বেকারের সংখ্যা তত বেশী নয় বটে, মুদ্রাধিক্যের (ইন্‌ফ্লেশান) জন্যে প্রায় সকল কারখানাই চল্‌ছে বটে, কিন্তু মুদ্রাধিক্যের ফলে মজুরদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি নীচু ক'রতে হ'য়েছে। বিলাত জীবনযাত্রার মাপকাঠি ঠিক রেখে বেকারের দল সৃষ্টি ক'রেছে। মোটের ওপর বিলাতের বেকারের সংখ্যা বাড়ার জন্যে ও ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের (জীবনযাত্রার মাপকাঠি নীচু হওয়ার জন্যে) ক্রয়-শক্তি কমেছে।

একদিকে জগতের কৃষিপ্রধান দেশগুলা (এবং কারখানাশিল্পবহুল দেশগুলাও কিছু কিছু) কৃষকের আয় হ্রাসের জন্যে ভুগছে, অপরদিকে ইয়োরোপের কারখানাশিল্প কাজের অভাববশতঃ উৎপাদন-শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন ক'রতে পারছে না। এর কারণ কি?

কৃষির দুরবস্থার একটি কারণ এই যে, জগতের কৃষিপ্রধান দেশগুলা ইয়োরোপের বাজারের জন্যেই কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে (প্রত্যেক কৃষিপ্রধান দেশই দেশের প্রয়োজনের জন্যেও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন ক'রে থাকে, কিন্তু জগতের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য যেমন, গম ও অন্যান্য শস্য, তুলা প্রভৃতির দর প্রধানতঃ বিদেশের

চাহিদার ওপরই নির্ভর করে, আর বিদেশের চাহিদা যে দর নিরূপিত করে, উৎপাদনকারী দেশের মধ্যেও সেই দর ক্রমে ক্রমে অনেকটা চলিত হয়; যে সব কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলে না, বিদেশের চাহিদা কমার জন্যে সেই ধরণের কৃষিজাত দ্রব্যের দরের উঠানামা হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই ধরণের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ খুব বেশী নয়)। ইয়োরোপের বাজারে চাহিদা কমাতে কৃষিতে মন্দা এসে উপস্থিত হ'য়েছে। আরও একটি কারণ এই যে, চাহিদা ক'মলে কলকারখানার মত কৃষি-কাজের পরিমাণ ইচ্ছামত কমান-বাড়ান চলে না। সুতরাং যত অল্প দামই দেওয়া হউক না কেন, তা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই অসুবিধার জন্যেও কৃষিজাত দ্রব্যের দর কমেছে। কিন্তু কৃষির দুরবস্থা বুঝতে হ'লে ইয়োরোপের শিল্পসমূহের দুরবস্থার কারণগুলাই বিশেষ ক'রে বোঝা দরকার। যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের কারখানাগুলা সাধারণ আবশ্যক জিনিষের চেয়ে যুদ্ধের জিনিষপত্রই অধিক তৈরী ক'রতো। স্বাভাবিক বাণিজ্যের গতি সেই সময়ে বাধাপ্রাপ্ত ছিল, মুদ্রার পরিমাণ আবশ্যকের অতিরিক্ত বাড়ানো হ'য়েছিল। এই সব কারণে যুদ্ধের পর শিল্পজগতে একটা বিপ্লব উপস্থিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ক্রমে ক্রমে মুদ্রা-ব্যবস্থার গোলমাল মেটানো হ'ল, যুদ্ধের পর যে সব নতুন নির্ম্মাণ-কার্য্যে হাত দিতে হ'ল তার দরুণ, এবং লোকসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ, লোহা-লক্কড়ের কারবারে যুদ্ধের সময়ে বর্দ্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতার উপযুক্ত চাহিদাও দেখা দিল। তবুও এই দুরবস্থা স্থায়ী হ'ল কেন? এর একমাত্র কারণ এই যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে এক দেশ হ'তে অন্য দেশে মূলধন, মজুর ও মাল চলাচলের যে স্বাধীনতা ছিল, তার অনেকটা হ্রাস হ'য়েছে। জগতের কৃষিপ্রধান দেশগুলা যারা প্রধানতঃ ইয়োরোপের বাজারে কৃষিজাত দ্রব্য

পাঠিয়ে মোটা লাভ করে, তারা নিজেদের দেশে কলকারখানা গ'ড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন ক'রেছে। জগতের কতগুলি দেশ সংরক্ষণনীতি অবলম্বন ক'রেছে, আর কি পরিমাণেই বা ক'রেছে তা নীচের অঙ্কগুলা থেকে বোঝা যাবে :—

আমদানির দর অনুযায়ী গড়ে শতকরা যে হারে শুল্ক স্থাপন করা হ'য়েছে তার হিসাব :—

	সকল প্রকার আমদানির ওপর		কারখানা-জাত আমদানির ওপর
	১৯১৩	১৯২৫	১৯২৫
স্পেন	৩৩	৪৪	৪১
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৬ (১৯১৪)	২৯	৩৭
আর্জ্জেণ্টিনা	২৬	২৬	২৯
অষ্ট্রেলিয়া	১৭	২৫	২৭
হাঙ্গেরী	১৮	২৩	২৭
পোল্যাণ্ড	...	২৩	৩২
সার্ভিয়া	...	২৩	২৩
চেকো-শ্লোভাকিয়া	১৮	১৯	২৭
ইতালি	১৭	১৭	২২
কানাডা	১৮	১৬	২৩
ভারতবর্ষ	৪	১৪	১৬

এই সংরক্ষণনীতির ফলে এই সব শিল্পগুলা হয়ত গ'ড়ে উঠতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে আজ ইয়োরোপের রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল কারখানাগুলাকেও আঘাত করা হ'য়েছে। ফলে ইয়োরোপের ক্রয়শক্তি কমাতে

এদের কৃষিজাত দ্রব্যের দরও কমেছে। সুতরাং এই কৃষিপ্রধান দেশগুলার নতুন কারখানা-শিল্প নিছক বিদেশকে আঘাত ক'রেই গড়ে উঠছে না, এই আঘাত ঘুরে এসে তাদের কৃষকদের ওপরও বেশ জোরেই পড়ছে। কৃষির এই দুরবস্থার জন্যে ইয়োরোপের মালের চাহিদা আরও বেশী করে কমেছে।

এই কথার সত্যতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে বেশ বোঝা যাবে। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের কৃষির অবস্থা বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তখন ইয়োরোপ যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ঋণের সাহায্যে যথেষ্ট কিন্‌তো। যুদ্ধের পর ঐ ঋণ বন্ধ করা হয়। ফলে, ইয়োরোপের ক্রয়শক্তি যেরূপ ক'মলো কৃষিজাত দ্রব্যের দামও তদনুযায়ী ক'মতে বাধ্য হ'ল। ১৯২২ সনে যুক্তরাষ্ট্রে সংরক্ষণ শুল্কের হার বাড়ালো। ইয়োরোপ এ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে টাকা ধার নিয়ে ঋণের সুদ শোধ দিচ্ছিল। এই সময়ে ধারের আসল টাকা শোধ ক'রতে আরম্ভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইয়োরোপের ধার এ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই জম্‌ছিল, ঠিক ধার শোধ দেবার সময় তার পথে শুল্কের জন্যে বাধা প'ড়ল। ইয়োরোপ যে ধরণের মাল যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ক'র্‌ত, সেই ধরণের মালের সাহায্যে ধার শোধ দেওা অসম্ভব হ'ল। অন্য কোন ধরণের মাল তৈরী ক'রে তার সাহায্যে ঋণ শোধ দিতে অথবা আগের ধরণের মালই তৈরী ক'রে যে সমস্ত দেশের জিনিষ অবাধে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে পারে, সেই সব দেশে বেচে ঋণ শোধ ক'রবার বন্দোবস্ত ক'রতে সময় লাগে। এই দুই পথের কোন পথই শীঘ্র অবলম্বন করা সম্ভব নয়। সুতরাং একদিকে ইয়োরেপের ধার শোধ দেবার তীব্র ইচ্ছা অথচ ক্ষমতার অভাব, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের দাবী পর্ব্বতপ্রমাণ। এর ফল হ'ল এই যে, ইয়োরোপের রপ্তানির দর চড়ল, আর যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির দর নামলো। দরের ওঠা-নামার দ্বারাই এই দাবী আর ঋণের একটা সাময়িক

সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হ'ল। এইরূপে সংরক্ষণ-শুল্ক ইয়োরোপের ঋণ শোধের পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে এদিকে ইয়োরোপের মালের দর চড়িয়েছে, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিজাত দ্রব্যের দর কমিয়েছে। সুতরাং সংরক্ষণশুল্কের ফলে, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধাভোগকারী দেশের কারখানা-শিল্পজাত দ্রব্যগুলা বেশী দরে কিন্‌ছে, ও অন্যদিকে স্ব স্ব পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য সস্তা দরে বেচতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষিপ্রধান দেশগুলায় প্রেরিত হ'বার জন্যেই ইয়োরোপের শিল্পগুলা প্রধানতঃ গ'ড়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ইয়োরোপের বাজারের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। এই জন্যেই শুল্ক-প্রাচীররূপ বাণিজ্যের বাধা সৃষ্ট হওয়াতে ইয়োরোপের কারখানাশিল্প ও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে। এই ক্ষতি এড়াবার জন্যে এখন ইয়োরোপকে শিল্পের জন্যে ও যুক্তরাষ্ট্রকে কৃষির জন্যে নিজ নিজ সীমানার মধ্যেই বাজার খুঁজতে হচ্ছে। শিল্প ও কৃষি নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ইতিমধ্যেই অনেকটা সমর্থ হ'য়েছে বটে, কারখানাজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের দরের ইন্‌ডেক্‌স নাম্বারের পার্থক্য ক'মছে সত্য, কিন্তু এই ওলট-পালটের সময়ে ইয়োরোপর অনেক কারখানাওয়ালাকে ও যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কৃষককে যে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য ক'রতে হ'য়েছে তা ভুল্‌লে চল্‌বে না।

জগতের বিভিন্ন দেশগুলার মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ, এখন বোধ হয়, তা বোঝা সম্ভব হবে।

র্যাশনালিজেশান ও বেকার-সমস্যা

গত মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা বের ক'রে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হ'য়েছিল। যুদ্ধের পর অতিরিক্ত মুদ্রা কমাবার যুগ এলো। কিন্তু এই মুদ্রা কমানোর ফলে, যে সব কারবার অতিরিক্ত মুদ্রাজনিত উঁচু দরের কৃত্রিম সহায়তায় খাড়া হ'য়ে উঠেছিল, তারা ফেল মারতে লাগলো। ফলে চারিদিকে বেকার-সমস্যা দেখা দিলে। তখন কথা উঠলো, কি করে কারবারগুলার উন্নতি করা যায়। এ হ'তেই "র্যাশনালিজেশানের" উৎপত্তি। "র্যাশনালিজেশান" শব্দে বুঝায়, শিল্পোন্নতির আধুনিক নানাবিধ প্রচেষ্টা। বেকার-সমস্যা উদ্ভব নানা কারণে হ'য়ে থাকে। র্যাশনালিজেশানের ফলে বেকার-সমস্যা বাড়ে কিনা, যদি বাড়ে ত কতখানি বাড়ে, এটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

অপেক্ষাকৃত উন্নত কল-কব্জার সাহায্য নেওয়া "র্যাশনালিজেশানের" একটি অর্থ। শিল্প সম্বন্ধে "র্যাশনালিজেশান" কথাটি প্রযুক্ত হবার আগেও কল-কব্জা বা যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধিত হ'ত। তা হ'লেও, "র্যাশনালিজেশান" কথাটি কল-কব্জা বা যন্ত্রপাতির উন্নতিও বুঝিয়ে থাকে। এখন এই ধরণের "র্যাশনালিজেশানের" ফল কি রকম, তা দেখা যাক্। কাচশিল্পে যদি এমন একটা কল উদ্ভাবিত হয়, যার সাহায্যে একজন মজুর ৪০ গুণ বেশী কাচ উৎপন্ন ক'রতে পারে, তা হ'লে সব কাচ ফ্যাক্টরীতে একই সময়ে ঐ কল ব্যবহৃত হ'তে থাকলে, একই সময়ে অনেক লোক কাজ হারাবে বটে। কিন্তু কোন নতুন যন্ত্র বা

কল একই সময়ে সব ফ্যাক্টরী কর্ত্তৃকই ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ হয় না। ক্রমে ক্রমে সব ফ্যাক্টরীতে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে যারা কর্ম্মশূন্য হয়, তাদের সংখ্যা খুব বেশী হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যেমন এক দিকে অনেকে বেকার হয়, তেমন অন্যদিকে ঐ নতুন ধরণের যন্ত্র বা কল নির্ম্মাণের জন্যে লোকের দরকার হয়, সুতরাং নব-উদ্ভাবিত যন্ত্র তৈরী ও মেরামতের কাজে যোগ দিতে পারলে বেকার-দের অনেকেরই আর বেকার অবস্থা থাকে না। তবে, যারা এই নতুন কাজে যোগ দেবে, তাদের এই নতুন কাজ শিখ্‌তে সময় লাগবে। ততদিন পর্য্যন্ত তাদের বেকার অবস্থাতেই থাকৃতে হবে। তৃতীয়তঃ, উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেই উৎপন্ন দ্রব্যের দর কমবে, দর কম্‌লে চাহিদা যদি খুব বাড়ে, তা হ'লে বেশী পরিমাণে উৎপাদনের দরকার হবে, সুতরাং যারা অন্যথা বেকার হ'তে পারতো, তারা যে স্থানে কাজ ক'রছিল সেই স্থানেই যথেষ্ট কাজ পেয়ে যাবে। আর যদি উৎপন্ন জিনিযটি এই ধরণের হয় যে, দর কমলেই চাহিদার পরিমাণ বিশেষ বাড়ে না, তা হ'লে দর কমার ফলে ঐ জিনিষটির জন্যে ভোক্তা-দের ক্রয়শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে নিয়োজিত হ'তে থাকবে। সুতরাং যে ক্রয়-শক্তিটুকু বাঁচবে, তা দিয়ে ভোক্তারা অন্য যে সব জিনিষ বেশী কিন্‌তে চাইবে, তাদের উৎপাদন বাড়ান আবশ্যক হবে, এবং ঐ সব জিনিষের উৎপাদনে বেকার মজুরেরা নিযুক্ত হ'তে পারবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উন্নততর কল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রলে জনকয়েক মজুর কেবল 'সাময়িক ভাবে বেকার হ'তে পারে এবং অনেক সময়ে তাদের বেকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন কাজেরও সৃষ্টি হ'তে পারে।

মজুরদের মধ্যে উন্নততর শ্রমবিভাগ প্রণালীর প্রবর্ত্তন ক'রে এবং

তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা বৈজ্ঞানিক ভাবে নিয়মিত ক'রেও মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে; এও একপ্রকার "র‍্যাশনালিজেশান"। এর ফলে আগেকার চেয়ে অল্প মজুরের দরকার হবে, সুতরাং জনকয়েক বেকার হবেই; তবে, নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে যতগুলি লোকের বেকার হওয়া সম্ভব, এর জন্যে তা অপেক্ষা ঢের কম সংখ্যক লোকের বেকার হবার আশঙ্কা। অপরদিকে নতুন যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্যে বেকারেরা ভবিষ্যতে কাজ পেলেও পেতে পারে, কিন্তু এই প্রকার "র‍্যাশনালিজেশনের" ফলে ঐ ধরণের নতুন কাজের আনুষঙ্গিকভাবে সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই।

কারবারের উন্নতি সাধনের আর একটা উপায় আছে। এঞ্জিনিয়ারী বিদ্যার সাহায্যে কারখানার গৃহগুলি এরকম ভাবে নির্ম্মাণ করা যেতে পারে, যাতে মজুরদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং তারা অধিকতর নিরাপদে এবং আরামে কাজ ক'রতে পারে। এর ফলেও মজুরপ্রতি উৎপাদন বাড়বেই। কিন্তু এই ধরণের উন্নতি কখন সহসা হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এপ্রকারের উন্নতিতে হঠাৎ অনেকগুলি মজুরের বেকার হওয়ার জন্যে মজুর-জগতে কোন ওলট-পালট হবার মোটেই সম্ভাবনা নেই।

কারবারের আর্থিক ব্যাপারগুলি উন্নততর প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করা "র‍্যাশনালিজেশানের" আর একটা ধাপ। প্রধানতঃ দুই প্রকারে আর্থিক ব্যাপারগুলি আরও উন্নতভাবে চালান যেতে পারে:—(১) বাজারের চাহিদা যেমন উঠবে নামবে, উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক সেই রকম বাড়বে ও কমবে—এই ধরণের বন্দোবস্ত করা; (২) যে সব কারবারে কাজ সারা বৎসর ধ'রে থাকে না, সেই সব কারবারে অর্ডার সরবরাহ ক'রবার সময় যথাসম্ভব দীর্ঘ ক'রে, অথবা যে সময়ে কাজ থাকে না

সেই সময়ে অন্য কোন প্রকার স্থায়ী চাহিদাযুক্ত কাজের বন্দোবস্ত ক'রে, মজুরদের যথাসম্ভব স্থায়ীভাবে কাজ দেবার ব্যবস্থা করা—এই দুটি নীতির ফলেই বেকার-সমস্যা বাড়বে না, বরং কমবে। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন না হ'লে, যখন দেখা যায় উৎপাদন চাহিদাকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে, তখন কারখানা বন্ধ ক'রতে হয়, অথবা কাজের ঘণ্টা কমাতে হয়। এর জন্যে অনেক মজুর সম্পূর্ণ অথবা অংশতঃ বেকার অবস্থায় পতিত হয়। সুতরাং চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা ক'রলে হঠাৎ অনেকগুলা মজুরকে কাজ ছাড়াবার প্রয়োজন দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে না।

উপরি উক্ত দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন ক'রলে, যে কারবারে অনেক গুলা মজুর বৎসরে কয়েক মাস কাজ ক'রে বাকী সময় বেকার হ'ত, সেই কারবারে মজুররা আগেকার চেয়ে আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী কাজ পেতে পারবে। সুতরাং উপরিউক্ত দুই উপায় অবলম্বনের জন্যে বেকার-সমস্যা বাড়্বার সম্ভাবনা নেই, কমবার সম্ভাবনাই আছে।

১৯২৭ সনের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সভায় সার আর্থার বেলফোর বলেন যে, "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটার দ্বারা কেবল কোন কোম্পানী বা কারবারের আভ্যন্তরীণ উন্নতি অর্থাৎ কল-কব্জা যন্ত্রপাতির উন্নতি, শ্রেষ্ঠতর শ্রমবিভাগের অবস্থা, ইত্যাদিই বোঝায় না। এই ধরণের উন্নতির ধারণা জগতে নতুন নয়, কিন্তু "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটি অতীব আধুনিক। "র‍্যাশনালিজেশান" বিশেষ ক'রে সেই ধরণের উন্নতির অবস্থা বোঝায়, যাতে এক একটি শিল্পে যত কারবার বা কোম্পানী আছে, সবগুলা চুক্তি দ্বারা পরস্পরের প্রতিযোগিতা কমিয়ে, সকলের মিলিত চেষ্টায় শ্রেষ্ঠতম প্রণালীতে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় ক'রতে পারে। পরস্পরের প্রতিযোগিতা থাকলে উন্নতির দিকে নজর দেবার সময় থাকে না, কেবল

প্রতিদ্বন্দ্বীকে হঠাবার জন্যেই সকল চেষ্টা প্রয়োগ ক'রতে হয়। প্রতিযোগিতার ফলে যে কয়েকটি কারবার নিতান্ত পিছিয়ে আছে, তারা ক্রমে কাজ বন্ধ ক'রতে বাধ্য হয় এবং তাদের মজুরেরা বেকার হয়; পরে অধিকতর উন্নত কারবারগুলি যখন কাজ বাড়ায়, তখন এই সব বেকার মজুরদের ভর্ত্তি ক'রে নিতে পারে বটে, কিন্তু তা তখনই বা অল্প সময়ের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কিছুদিনের জন্যে জনকয়েক মজুর বেকার হ'য়ে পড়ে। অপর দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারগুলির পরস্পরের মধ্যে রফা হ'লে, সেই শিল্পের সকল কারবারগুলাই সমগ্র শিল্পটিকেই (কেবল প্রত্যেক কারবারটি মাত্র নয়) সকলের মিলিত চেষ্টায় আরও উন্নত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে, সুতরাং রেষারেষিতে হেরে গিয়ে কয়েকটি কারবারের কারখানা বন্ধ করবার আবশ্যকতা থাকে না ব'লে, মজুরেরা উক্ত কারণে আর বেকার হ'তে পারে না। অতএব অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা কমিয়ে, শিল্পবিশেষকে সকল কারবারের মিলিত চেষ্টায় চালানোরূপ 'র‍্যাশনালিজেশানের' ফ'লে, বেকারের সংখ্যা বাড়বে না, বরং কম্‌বে। তবে, কোন শিল্পের বিভিন্ন কারবারগুলির চুক্তিতে সমগ্র শিল্পটিরই স্বার্থের জন্যে যদি এমন কোন সর্ত্ত থাকে, যে সব কোম্পানী বা কারবার নিতান্ত অনুন্নত বা অপটু তাদের কাজ বন্ধ ক'রতে হবে, তখন এই ধরণের "র‍্যাশনালিজেশানের" ফলে অনেক মজুর বেকার হবে।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, ওপরে যে কয়েক শ্রেণীর "র‍্যাশনালিজেশানের কথা আলোচনা করা হ'ল, তার ফলে বেকার-সমস্যা কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হ'তে পারে, কিংবা অবস্থাবিশেষে জনকয়েক লোক সাময়িক ভাবে বেকার হ'তে পারে এবং "র‍্যাশনালিজেশানে"র চেষ্টা বরাবর চল্‌তে থাক্‌লে বরাবরই জনকয়েক লোক সাময়িক ভাবে বেকার হ'তে

পারে, কিন্তু একই সঙ্গে অনেক লোক বেকার হ'য়ে প'ড়ে একটি বিরাট ও দীর্ঘকাল স্থায়ী বেকার-সমস্যার সৃষ্টি ক'রবে, এমন কোন আশঙ্কা করা যায় না।

"র্যাশনালিজেশানে"র ফলে বেকার-সমস্যা কি রকম দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে। এ পর্য্যন্ত "র্যাশনালিজেশান" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মানিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হ'য়েছে। আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক কি না তা বোঝবার জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মানির অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক্।

১৯১৯ সনের যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাক্টরিগুলাতে নিযুক্ত মজুরদের সংখ্যা ১০০ ধ'রলে ১৯২৮ সনে (ফ্যাক্টরিগুলাতে নিযুক্ত) মজুরের সংখ্যা সেই সেই অনুপাতে দাঁড়াবে ৯২; অথচ ১৯১৯ সনে মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণকে ১০০ ধ'রলে ১৯২৭ সনে মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১৩৭ দাঁড়াবে। দেখা যাচ্ছে শতকরা ৩৭ ভাগ উৎপাদন বেড়েছে। অর্থাৎ অল্পসংখ্যক মজুর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন ক'রেছে। এই বৃদ্ধির বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, ১৯২৩ সন হ'তে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পগুলাকে পুরাদমে র্যাশনালাইজ করা চল্‌ছিল। কিন্তু ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত র্যাশনালিজেশানের চেষ্টা গভীর ভাবে চল্‌লেও যুক্তরাষ্ট্রের বেকার-সমস্যা বাড়ে নি; কারণ যারা র্যাশনালিজেশানের জন্যে ফ্যাক্টরীর কাজ হারিয়েছে তারা অন্যত্র (যেমন মোটর গ্যারেজ বা পেট্রল ষ্টেশনের কাজে, ফিল্‌ম তৈরী ছাড়া সিনেমার অন্যান্য কাজে) অত্যন্ত বেশী সংখ্যায় ঢুকেছে। যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে মাত্র সেদিন, ১৯২৭ সনের শেষ হ'তে (১৯২৫ সনে বেকার-সংখ্যা ১০ লক্ষ; ১৯২৮ সনে জানুয়ারী মাসে ৫৮ লক্ষ)। সম্প্রতি যে বেকার-সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার কয়েকটি সমসাময়িক বিশেষ বিশেষ কারণও আছে;

যেমন :—(১) প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময়ে যে রকম আর্থিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়ে থাকে, তার আবির্ভাব ; (২) মিসিসিপি নদীর বন্যা ; (৩) গত শীত ঋতুতে যথেষ্ট তুষার পাতের অভাবে সহরে তুষার কাটবার কাজের অভাব ; (৪) বিনিময় কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মুদ্রা ও কর্জ্জের পরিমাণ বাড়াতে নিশ্চেষ্টতা। কাজেই, যুক্তরাষ্ট্রের ইদানীন্তন বেকার-সমস্যার জন্যে 'র‍্যাশনালিজেশান'কে দায়ী করা শক্ত।

জার্ম্মানিতে ১৯২৪ সন হ'তে ১৯২৬ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মুদ্রা কমানো এবং তার ফলে বাজে কারবারগুলা গুটানো ও বাকী কারবারগুলা উন্নততর প্রণালীর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা চল্‌তে থাকে। এই আড়াই বৎসর 'র‍্যাশনালিজেশান' প্রায় সমান ভাবে চল্‌লেও বেকার-সমস্যা কখনও খুব বেড়েছে, কখনও খুব কমেছে। ১৯২৪ হ'তে ১৯২৫ সনের জুন পর্য্যন্ত বেকার-সংখ্যা খুব ক'মে যায় (১৫ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার)। তার পর এক বছর ধ'রে খুব বাড়তে থাকে (১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাসে ২০ লক্ষ)। এ থেকে বোঝা যায় যে, 'র‍্যাশনালিজেশানের' সঙ্গে জার্ম্মানির তদানীন্তন বেকার-সমস্যার কোন ঘনিষ্ঠ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ছিল, এমন কথা বলা চলে না।

আগেই দেখানো হ'য়েছে, যে 'র‍্যাশনালিজেশানে'র জন্যে কোন ভীষণ সর্ব্বব্যাপী বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয় না। তবে, উন্নততর প্রণালীগুলা প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই বরাবর জন কয়েক মজুর যে সাময়িকভাবে বেকার হ'বে, তা নিশ্চিত। আর্থিক উন্নতির জন্যে এই অসুবিধা ভোগ ক'রতে হবেই। দেশের উন্নতির জন্যে জনকয়েক লোক যখন এই রকম বেকারের দুর্দ্দশা ভোগ ক'রতে থাকে, অর্থাৎ তাদের দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়েই যখন দেশ আর্থিক বিষয়ে অগ্রসর হ'তে থাকে, তখন

যতদিন তারা বেকার থাকে, ততদিন তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার দেশেরই নেওয়া কর্ত্তব্য। এর জন্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেকার-বীমা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। অনেকে বলেন যে, যে যে কারবার হ'তে লোক ছাড়ানো হচ্ছে, সেই কারবার কর্ম্মচ্যুত লোকদের কিছু কিছু ক্ষতিপূরণ দিলেই ত যথেষ্ট, এর জন্যে বীমার বন্দোবস্ত করার দরকার কি? কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুপরিচালিত বীমার ব্যবস্থার সঙ্গে কারবারের ইচ্ছামত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের কখনই তুলনা হ'তে পারে না।

যদি বীমার ব্যবস্থা ক'রতেই হয়, তা হ'লে কেবল 'র‍্যাশনালিজেশানের' জন্যে যারা কাজ হারিয়েছে, শুধু তাদের জন্যে বীমার ব্যবস্থা করা অসম্ভব, কারণ কোন মজুর "র‍্যাশনালিজেশানের" জন্যে অথবা অন্য কোন কারণে কাজ হারিয়েছে কি না, তা বিশ্লেষণ ক'রে ঠিক বলা অনেক সময় সম্ভব নয়। সুতরাং সকল রকম বেকারের জন্যেই বীমার ব্যবস্থা ক'র্তে হবে।

'র‍্যাশনালিজেশানের' উদ্দেশ্য হচ্ছে—মালের উৎপাদন প্রণালীর ও মজুরদের শক্তির সকল প্রকার অপচয় নিবারণ ক'রে অল্প ব্যয়ে বেশী উৎপাদন করা। মজুরেরা বেকার হ'লে তাদের শক্তির যত অপব্যয় হয়, আর কোন কারণে তত হয় না। সুতরাং বেকার অবস্থাতে যাতে মজুরদের আদৌ প'ড়তে না হয়, এই রকম অবস্থার সৃষ্টি করাও র‍্যাশনালিজেশানের লক্ষ্যের অন্তর্গত হওয়া উচিত।

কিন্তু বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দিতে হ'লে কোন বীমা প্রণালী অবলম্বন ক'রলেই চল্‌বে না, যেসব কারণে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হয়, সেইগুলি একে একে নির্ম্মূল ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রতে হবে। এর জন্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শিল্পে শিল্পে, জাতিতে জাতিতে এখন যে ধরণের আর্থিক সম্বন্ধ প্রচলিত আছে, তার অনেক পরিবর্ত্তন দরকার হ'বে। ঐ উদ্দেশ্যে

নিম্নলিখিত সংস্কারগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় :—(১) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য উন্নততর প্রণালীর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা ; (২) সমগ্র জগতের যেখানে যেরকম প্রয়োজন তদনুযায়ী মূলধন ও শ্রমিক যোগানো ; (৩) উৎপাদনের লাভ আরও বেশী পরিমাণে ভোক্তাদের দেওয়া ; এর ফলে অধিকাংশ লোক ক্রয় শক্তির অভাবে কিন্‌তে পারছে না, অথচ জনকয়েক লোক কারবারের সম্পত্তি যত দামের শেয়ার নির্দ্দেশ করে, তার চেয়ে বেশী শেয়ার পেয়ে লাভের আশায় ব'সে আছে, এই ধরণের সমস্যা দেখা দেবে না ; (৪) বিভিন্ন শিল্প এরকম ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা, যেন শিল্পগুলার পরস্পরের তুলনায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন (রিলেটিভ্‌ ওভারপ্রডাকৃশান) না হয় ; (৫) আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জগতের সর্ব্বত্র বিনিময় কার্য্যের পরিমাণ অনুযায়ী মুদ্রা ও ঋণের বন্দোবস্ত করা। অর্থাৎ বেকার-সমস্যা-উদ্ভব নিবারণ ক'রতে হ'লে জগতের আর্থিক ভিত্তির আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। এইটাই 'র‍্যাশনালিজেশানের' ভাবী চরম ধাপ।

১৯১১ সনের ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন

(১৯২২, ১৯২৩ ও ১৯২৬ সনের সংশোধন ও
১৯২৮ সনের বঙ্গীয় নিয়মাবলীসহ)

ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন পাশ হয় ১৯১১ সনে। ১৯২২, ১৯২৩ ও ১৯২৬ সনে এর সংশোধন হয়। বর্ত্তমান আইনের ৯টি অধ্যায় (মোট ৫৮ ধারা) ও ২টি শেডিউল আছে। ৯টি অধ্যায়ের বিষয়গুলা এইরূপ ঃ— সূচনা, ইনস্পেক্টার ও সার্টিফাইং সার্জ্জন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুর্ঘটনা নিবারণ, খাট্‌বার সময় ও ছুটি, নিয়ম পালন হ'তে অব্যাহতি, নোটিশ ও রেজিষ্ট্রি, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলা কর্ত্তৃক নিয়মাবলী প্রস্তুতের কথা, দণ্ড ও কার্য্যবিধি, কয়েকটি অতিরিক্ত নিয়ম।

ফ্যাক্টরী আইন নানা বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলাকে নিয়মাবলী প্রস্তুতের ক্ষমতা দিয়েছে। তদনুযায়ী পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বর্ম্মা, মধ্যপ্রদেশ আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার-উড়িষ্যা ও বাংলা—এই সব প্রদেশের গবর্ণমেণ্টগুলা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে স্ব স্ব প্রদেশের জন্য পৃথক্ নিয়মাবলী প্রস্তুত ক'রেছে। বিভিন্ন প্রদেশের নিয়মাবলীর মধ্যে অনেক বিষয় প্রভেদ আছে। একই প্রবন্ধে সকল প্রদেশের নিয়মগুলা আলোচনা ক'রতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘ হবে। অধিকন্তু আমরা বাঙালী ব'লে অন্যান্য প্রদেশের নিয়মাবলী অপেক্ষা ১৯২৮ সনের বঙ্গীয় নিয়মাবলীর সঙ্গেই আমাদের বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া অধিকতর দরকার। সেই জন্যে এই প্রবন্ধে প্রাদেশিক নিয়মাবলীর মধ্যে বাংলা গবর্মেণ্টের প্রস্তুত নিয়মাবলীই স্থান পাবে।

১৯২৮ সনের বঙ্গীয় নিয়মাবলী প্রায় ৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী, মোট ১০০টি নিয়ম দেওয়া আছে। এতে ২৩ পৃষ্ঠা লেগেছে। নিয়মগুলা ৯টি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হ'য়েছে, এই ৯ ভাগের বিষয়গুলা এইরূপ :—কয়েকটি কথার অর্থ-নির্দ্দেশ, ফ্যাক্টরী স্থাপন, ফ্যাক্টরী রেজিষ্ট্রী করা, দুর্ঘটনা নিবারণ, স্বাস্থ্য-রক্ষা, চিকিৎসক, কর্ম্মচারী ও স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, খাটবার সময় ও ছুটী, নোটিশ রিটার্ণ ও রেজিষ্ট্রী, ইনস্পেক্টর ও পরিদর্শন। নিয়মগুলার পর ১৩টি ফর্ম্মের নমুনা দেওয়া হ'য়েছে। সর্ব্বশেষে স্থান পেয়েছে—ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীর ৬৷৷০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সারসংগ্রহ।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে—ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীর নিয়মগুলা শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজিয়ে সরলভাবে বিবৃত করা। প্রায় সব নিয়মই এই প্রবন্ধে ঢুকান হ'য়েছে। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়গুলাই বাদ দেওয়া হ'য়েছে।

স্বার্থান্ধ ফ্যাক্টরীপতিদের হাত হ'তে মজুরদের রক্ষা করাই ফ্যাক্টরী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ তিনটি বিষয় মজুরদের রক্ষা ক'রবার চেষ্টা করা হ'য়েছে :—(১) মজুরদের যাতে স্বাস্থ্যহানি না হয়, (২) তারা যাতে কোন অনিবার্য্য দুর্ঘটনার জন্যে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় অথবা কোনরূপ আঘাত না পায়, (৩) মজুরদের যাতে অত্যন্ত খাটানো না হয় এবং তাদের বিশ্রামের জন্যে উপযুক্ত অবসর ও ছুটী দেওয়া হয়। ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে অন্যান্য যে সব বিষয়ের কথা আছে সেগুলা প্রধানতঃ উক্ত কয়টা বিষয়ের নিয়মগুলা যাতে অমান্য করা না হয়, তার বন্দোবস্তের জন্যেই রচিত হ'য়েছে। সেই জন্যে ঐ কয়টি বিষয়ের নিয়মগুলিই প্রথমে বিবৃত করা হবে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা

মজুরদের[১] স্বাস্থরক্ষার জন্যে অনেকগুলা নিয়ম বিধিবদ্ধ হ'য়েছে। মজুররা যে ঘরে কাজ করে সেই ঘরে হাওয়া না খেল্‌লে, বা অত্যন্ত ভিড় জম্‌লে ঘরের আবহাওয়া খারাপ হ'লে, তাতে উপযুক্ত পরিমাণ আলো না থাকলে, ঘরগুলার দেওয়াল বা ফ্যাকৃটরীর কম্পাউণ্ড অপরিচ্ছন্ন থাকলে, পরিষ্কার ও প্রচুর পানীয় জলের এবং মজুরদের সংখ্যা অনুযায়ী পাইখানার বন্দোবস্ত না থাকলে মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘট্‌তে পারে। প্রধানতঃ এই সব কথা মনে রেখেই নিয়মগুলা প্রস্তুত করা হ'য়েছে।

ফ্যাক্টরী আইনে যে নিয়মগুলা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে সেগুলা এইরূপ :— ফ্যাক্টরী[২] পরিষ্কার রাখতে হ'বে। পাইখানা বা নর্দ্দমা হ'তে যেন কোন প্রকার দুর্গন্ধ না বেরোয়। ফ্যাক্টরীতে যেন এরূপ ভিড় না হয়, যাতে মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। এরকম হাওয়া খেলা দরকার যে কাজ করবার সময় ধূলা, বাষ্প, গ্যাস প্রভৃতি উঠলেও তা যেন মজুরদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি

১। ফ্যাক্টরী আইনে 'মজুর' এই কথাটি আদৌ ব্যবহৃত হয় নি। তার বদলে 'এম্‌প্লয়েড' এই কথাটি ব্যবহৃত হ'য়েছে। এমপ্লয়েড কথাটার মোটামুটী অর্থ এই রকম— ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন বা শিল্পকর্ম্ম করা (বা তৎসম্বন্ধীয় কোন কাজ করা), যে ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন বা শিল্পকর্ম্ম চলে, তার কোন অংশ পরিষ্কার রাখা, কোন কলকজা পরিষ্কার রাখা বা তাতে তেল দেওয়া, কোন ফ্যাক্টরীতে (মাহিনা পেয়েই হোক বা না পেয়েই হোক) কেউ উল্লিখিত যে কোন একটি কাজ ক'রলেই এমপ্লয়েড ব'লে গণ্য হবে। মজুর কথাটা 'এমপ্লয়েডে'র অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

২। ফ্যাক্টরীর অর্থ নিম্নরূপ :—

(১) যে কোন বাড়ীর সীমানার মধ্যে উৎপাদনের কাজে কোন প্রকারে শক্তি নিয়োজিত হয় এবং বছরে যে কোন একটি দিনে একই সঙ্গে অন্ততঃ ২০ জন লোক মজুরি করে।

না ক'র্তে পারে। মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘট্তে পারে, কৃত্রিম উপায়ে এরূপ আর্দ্রতা সৃষ্টি করা চল্বে না (৯ ধারা)। ফ্যাক্টরীতে প্রচুর আলো থাকা দরকার (১১ ধারা)। কৃত্রিম উপায়ে আর্দ্রতার সৃষ্টি করা হ'লে তার জন্যে পানীয় জল বা শোধিত জল ব্যবহার ক'র্তে হ'বে (১২ ধারা)। আবশ্যক মত ও উপযুক্ত পাইখানার বন্দোবস্ত এবং (প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বল্‌লে) পৃথক্ প্রস্রাবের স্থানের বন্দোবস্ত ক'রতে হবে ; প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে সর্ত্ত ব'লে দেবেন, সেই সর্ত্ত অনুসারে ইনস্পেক্টার যে কোন ফ্যাক্টরীকে এই নিয়ম হ'তে রেহাই দিতে পারেন (১৩ ধারা)। ফ্যাক্টরীর মজুরদের জন্যে আবশ্যক পরিমাণ ও উপযুক্ত পানীয় জলের বন্দোবস্ত ক'রতে হবে (১৪ ধারা)। ফ্যাক্টরী আইনের প্রথম শেডিউলে তালিকায় যে ৬টি কাজের নাম আছে, সেই ৬টি কাজে নারী বা ১৮ বৎসর অপেক্ষা নিম্নবয়স্ক পুরুষকে লেড্ (সীসা) সম্পর্কিত কাজ ক'র্তে দিলে

অথবা (২) যে কোন বাড়ী বা বাড়ীর সীমানার মধ্যে (উৎপাদনের কাজে কোন প্রকার শক্তির সাহায্য না নেওয়া হ'লেও) বছরে যে কোন একটি দিন একই সঙ্গে অন্ততঃ ১০ জন লোক খাটে, এবং যা ফ্যাক্টরী ব'লে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক ঘোষিত হ'য়েছে।

(৩) ফ্যাক্টরী আইনে 'অকুপায়ার' কথাটির ভাল অর্থ দেওয়া হয় নি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ফ্যাক্টরী যে ব্যক্তির শাসনাধীন, ফ্যাক্টরীকে নিজের অধিকারে রাখতে ও ব্যবহার ক'রতে যার অধিকার আছে, (ফ্যাক্টরীর লাভ তিনিই পান বা অপরেই পান তিনি ফ্যাক্টরীর সম্পূর্ণ অধিকারী হোন অথবা মাত্র ইজারাদার বা বন্ধকগৃহীতা হোন) তিনিই 'অকুপায়ার'।

(৪) ১৫ বছরের নিম্নবয়স্ক হ'লেই 'শিশু' (চাইল্ড) বলা হবে। কোন শিশু মজুরি ক'রতে চাইলে তার এমন একটি সার্টিফিকেট থাকা দরকার যা' হ'তে বোঝা যাবে যে, তার বয়স বার বছরের কম নয় ও তার মজুরি ক'রবার মত স্বাস্থ্য বা সামর্থ্য আছে। এই সার্টিফিকেট খাটবার সময় সর্ব্বদা তার সঙ্গে থাকা চাই।

তাদের সম্বন্ধে ফ্যাক্টরীর কর্ত্তৃপক্ষদের নিম্নের কয়েকটি নিয়ম মানতে হবে (১৯ খ ধারা)—যদি লেড্ কম্পাউণ্ড হ'তে ধূলা বা ধোঁয়া ওঠে, তা হ'লে তা যাতে মজুরদের নিকট হ'তে দূরে সরে যায়, তার জন্যে উপযুক্ত বন্দোবস্ত ক'রতে হবে; যে ঘরে কাজ হচ্ছে সেই ঘরে খাদ্য, পানীয় বা তামাক আনতে দেওয়া হবে না, খাবার সময় সেই ঘরে কাউকে থাকতে দেওয়া হবে না। মজুরদের উপযুক্ত রক্ষাপ্রদ কাপড় চোপড় দিতে হবে। কাজ করবার সময় তারা ঐগুলা পরতে বাধ্য। জামা কাপড় রাখবার, খাবার ও গা ধোবার যে ধরণের ঘর রাখতে বলা হ'বে সেই ধরণের ঘর রাখতে হ'বে; যে ঘরে মজুররা কাজ করে সেই ঘরটি, আর যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা কাজ করে সেই যন্ত্রপাতিগুলা পরিষ্কার রাখতে হবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মগুলা এই-রূপ:—একই ঘরে নিযুক্ত মজুরদের প্রত্যেকের জন্যে ৫০০ ঘন ফুট হিসাবে স্থান (স্পেস) থাকা চাই; স্থানের পরিমাণ হিসেব ক'রবার জন্যে, ঘরের ১৫ ফুটের অধিক উচ্চতা গণ্য করা হবে না। ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক অংশে যথেষ্ট হাওয়া খেলা দরকার। যথেষ্ট হাওয়া খেলছে কিনা সে বিষয়ে বিচারের ভার ইন্স্পেক্টরের ওপর। বিষাক্ত গ্যাস, ধূলা, বাষ্প প্রভৃতি যাতে নিঃশ্বাসের সঙ্গে মজুরেরা গ্রহণ না করে, তার জন্যে যতগুলা উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তা করতে হ'বে। ফ্যাক্টরীর মজুরদের প্রত্যেকের জন্যে ১ গ্যালন হিসাবে পানীয় জল প্রত্যহ বিনা মূল্যে যোগাতে হবে। কোন সাধারণ বা ব্যক্তিগত জল-সরবরাহের কেন্দ্র হ'তে, অথবা কুয়া বা বিশেষ রিজার্ভ করা পুষ্করিণী হ'তে পানীয় জল নেওয়া চলতে পারে। কুয়া বা পুষ্করিণী হ'তে জল নিলে ওদের অবস্থান এরূপ স্থানে হওয়া দরকার যে, ওগুলার মধ্যে

প্রাণিজ বা দূষিত দ্রব্য না প'ড়তে পারে। পানীয় জল বিতরণের স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার এবং সেখানে যাতে জল না জমে, তার জন্মে নর্দ্দমার বন্দোবস্ত ক'রতে হবে। পানীয় জল পরিষ্কার কি না, তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার জন্ম ইন্স্পেক্টার জলের নমুনা নিতে পারেন; বিশ্লেষণের খরচ অকুপায়ারকেই দিতে হবে। ফ্যাক্টরীর যে সব ঘরে মজুররা কাজ করে, সেই সব ঘরের ভেতরকার দেয়াল, ভেতরকার ছাদ এবং যাওয়া-আসার পথ ও সিঁড়িগুলা ১৪ মাস অন্তর সম্পূর্ণরূপে চূণকাম ক'রতে হবে। এই নিয়ম 'অনাবশ্যক' বা মানা অসঙ্গত বুঝলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কোন ফ্যাক্টরীকে বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ফ্যাক্টরীকে এই নিয়ম হ'তে রেহাই দিতে পারেন। কড়ি, বরগা ও ফ্যাক্টরীর ভেতর যা কিছু কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সবই হয় ১৪ মাস অন্তর চূণকাম, না হয় ৫ বৎসর অন্তর পেণ্ট বা বার্ণিস ক'রতে হ'বে ও পরিষ্কার রাখতে হবে। ম্যানেজার ফ্যাক্টরীর কোনও স্থানে (যা থেকে দুর্গন্ধ ওঠতে পারে এরকম) ময়লা রাবিশ বা জঞ্জাল, জমাবেন না, বা জমাতে অনুমতি দিতে পারবেন না। ফ্যাক্টরী আইনের ১৩ ধারা অনুসারে রেহাই না পেলে প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতেই পাইখানা রাখতে হবে। পাইখানার ডিজাইন বা নির্ম্মাণ চীফ ইন্স্পেক্টার বা স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই; যে স্থানে পাইখানা নির্ম্মিত হবে সেই স্থানটি ইন্স্পেক্টার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। মেথরখাটা পাঁইখানা ও সেপ্টিক ট্যাঙ্ক পাইখানা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিস্তারিত নিয়ম দেওয়া হ'য়েছে (৩৪, ৩৫ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর কেবল সেপ্টিক ট্যাঙ্ক পাইখানাগুলা পরিদর্শন ক'রবার জন্মে বাংলা গবর্ণমেণ্ট একজন বিশেষ ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত ক'রতে পারেন। যদি কোন ফ্যাক্টরীতে

কৃত্রিম উপায়ে আর্দ্রতা সৃষ্টি করা হয়, তা হ'লে আর্দ্রতা এতদূর বাড়ানো চলবে না, যাতে মজুরদের স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে পারে। যদি কাপড়ের কলের কোন বিভাগের ড্রাই বাল্‌ব টেম্পারেচারে ৮৫° ডিগ্রির (ফারেন্‌হিট) বেশী হয়, তা হ'লে আর্দ্রতা-সৃষ্টির জন্যে বাষ্পের সাহায্য নেওয়া চল্‌বে না। আর্দ্রতা-সৃষ্টির জন্যে বাষ্পের সাহায্য নেওয়া হ'লে বাষ্প আনবার পাইপ (যেটুকু কোন বিভাগের ভেতরে থাকে) যত ছোট ও সরু হয় ততই ভাল; পাইপগুলা এরকম উপাদানে আবৃত হওয়া দরকার যাতে পাইপের ভেতরকার উত্তাপ খুব কমই বাইরে আস্‌তে পারে। কাপড়ের কলের যে সব বিভাগে কৃত্রিম আর্দ্রতা ব্যবহৃত হয়, সেই সব বিভাগে (এবং অন্যত্রও যদি ইন্‌স্পেক্টার আদেশ করেন) বাষ্পমান যন্ত্র রাখতে হ'বে; বাষ্পমান যন্ত্রগুলার প্যাটার্ণ ও অবস্থান বিষয়ে ইন্‌স্পেক্টার যা ব'লবেন তা ক'রতে হবে। যে সব কাজে 'লেড কম্পাউণ্ড' নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে হয়, সেই সব কাজে শিশু ও নারীরা যোগ দিতে চাইলে, তাদের বিশেষ সার্টিফিকেট থাকা দরকার; এই সার্টিফিকেট (বা তাহার প্রমাণস্বরূপ কোন চিহ্ন) সব সময়েই তাদের কাছে রাখতে হবে; ৩ মাস অন্তর তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে এবং এই পরীক্ষার রেকর্ড রাখতে হ'বে।

দুর্ঘটনা-নিবারণ

দুর্ঘটনা-নিবারণের জন্যে ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে যে নিয়মগুলা দেওয়া হ'য়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর বাড়ী, দেয়াল, চিমনি, সেতু, সুরঙ্গ, রাস্তা, গ্যালারী, প্ল্যাটফর্ম্ম, ষ্টেজিং প্রভৃতি (স্থায়ীই হোক বা অস্থায়ীই হোক) এরকম ভাবে ডিজাইন করা, প্রস্তুত ও মেরামত হওয়া চাই যে, কোন

বিপদের সম্ভাবনা নেই ব'লে ইনস্পেক্টার সন্তুষ্ট হ'তে পারেন। কোন ফ্যাক্টরীর 'প্রাইম্ মুভার' অন্যান্য কল, ষ্টীম বয়লার ও সমস্ত ট্যাঙ্ক ও মেনগুলার গঠন সম্বন্ধীয় কোন বিপজ্জনক দোষ থাক্‌লে চল্‌বে না, এবং ওগুলার বেশী ক্ষয়ে যাওয়া নিবারণ করবার জন্যে যেরূপ মেরামত করা দরকার তা ক'রতে হবে। যদি চীফ ইনস্পেক্টার মনে করেন যে, ফ্যাক্টরীর বাড়ীর বা কলকব্জার বিপজ্জনক দোষ আছে, তা হ'লে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে আবশ্যক মত সংবাদ পেতে ও পরীক্ষা চালাতে পারবেন। কলগুলা এরূপ অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা চালাতে হবে যে, কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই বুঝে ইনস্পেক্টার সন্তুষ্ট হ'তে পারেন।

বাষ্প বা যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত প্রত্যেক এঞ্জিন, ঐরূপ এঞ্জিন বা ওয়াটার হুইল দ্বারা চালিত প্রত্যেক ফ্লাই হুইল, এবং প্রত্যেক জয়েন্ট ওয়েল ট্র্যাপ-ডোর বা ঐ ধরণের অন্য কোন গর্ত্ত, যার কাছে কাজ করা বা কাছ দিয়ে যাওয়া আবশ্যক হ'তে পারে, এবং কলের প্রত্যেক অংশ ও বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম (যতটুকু প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ ক'রবেন)—এগুলাকে ভাল ক'রে বেড়া দিতে হবে ৩ [১৮ (১) ধারা]। বৈদ্যুতিক সাকুর্টগুলা, তাদের অংশ-সমূহ এবং তাদের সঙ্গে বৈদ্যুতিকভাবে যুক্ত যে কোন জিনিষ হ'তে যদি কোন ব্যক্তির আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে তাতেও এরকম বেড়া দেবার (বা ইন্সুলেশানের বা উভয়েরই) বন্দোবস্ত ক'রতে হবে যেন কোন বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে ইন্‌স্পেক্টার সন্তুষ্ট হ'তে পারেন। এ ছাড়া ইন্‌স্পেক্টার অন্য যে কোন কলে বেড়া দেবার আদেশ দিতে

৩। মানুষের জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকলে বেড়া ভাল করে দেওয়া হ'য়েছে ব'লে গণ্য করা হবে না।

পারেন, পুনর্ব্বার পরিদর্শনের সময় যদি তিনি দেখেন যে, তাঁর আদেশ মান্য করা হয় নি, তা হ'লে যতদিন না তাঁর আদেশ মান্য করা হয়, ততদিন ঐ কলের ব্যবহার বন্ধ ক'রে দিতে পারেন। যে স্থানেই কোন ভারি জিনিষ উঠানামা করে, তার চা'রদিকে বেড়া দেওয়া দরকার।

কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি ঘেরবার বেড়া কি রকম হওয়া কর্ত্তব্য ? এটা এরকম হওয়া দরকার যে, (১) কেউ বেড়া এবং কলের চলন্ত স্থানের মাঝে যেতে পারবে না, (২) যারা কলে তেল দেবে বা তা পরিষ্কার ক'রবে বা কল চালাবে, তাদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকবে না। (৩) এবং যারা কলের চলন্ত অংশের কাছে থাকবে, তাদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকবে না। বেড়া সব সময়েই মজবুত অবস্থায় রাখতে হবে [১৮ (৩) ধারা।]

অনেকস্থলে কলকব্জা যন্ত্রপাতির বেড়া না রাখলেও চল্‌তে পারে, যেমন (ক) যদি কলের চলন্ত অংশগুলা হ'তে কোন অনিষ্টের ভয় না থাকে ; (খ) যদি মেরামতের কাজ চল্‌তে থাকে, অথবা বেড়া না সরালে তেল দেওয়া, পরিষ্কার করা বা অংশ বদ্‌লান অসম্ভব হয় ; (গ) বৈদ্যুতিক সার্কিট প্রভৃতিতে কোন দোষ হ'লে যদি আপনাআপনি বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ হবার কোন বন্দোবস্ত থাকে ; (ঘ) যদি বেড়া দিলে উৎপাদনের কাজে অত্যন্ত বাধা পড়ে, অথবা যদি বেড়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়, তা হ'লে ইন্‌স্পেক্‌টারের মত নিয়ে বেড়ার পরিবর্ত্তে অন্য কিছুর বন্দোবস্ত করা যেতে পারে ; (ঙ) যদি এমন কোন বন্দোবস্ত থাকে যা চালকের হাতকে যন্ত্রের বিপজ্জনক অংশ হ'তে সরিয়ে দেয় বা বিপজ্জনক অংশের ভেতর যেতে বাধা দেয়, তা হ'লে তা বেড়ারই সামিল ব'লে ধরা হবে ; (চ) যদি এমন বন্দোবস্ত থাকে যাতে যন্ত্রপাতির বিপজ্জনক অংশ একেবারেই অনাবৃত হয় না, অথবা কোন বিপদ ঘটলে

বিপজ্জনক অংশটা তৎক্ষণাৎ থেমে যায়, তা হ'লে পৃথক্ বেড়ার আবশ্যক হবে না ; ঐরূপ বন্দোবস্তকেই বেড়ার সামিল ধরা হবে।

চলন্ত কলের বেল্ট বদলাবার সময় এই কয়টি নিয়ম মানতে হ'বে :— (১) যারা বদলাবে, তাদের ঢিলা পোষাক পর্‌লে চলবে না, আঁটা ইজার বা মাত্র কোমরে জড়ানো কাপড় পর্‌তে হবে ; (২) এই কাজে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোককেই কেবল নিযুক্ত করা চল্‌বে ; (৩) বেল্ট বদলাবার হুক ও স্পারযুক্ত পৃথক্ মই রাখতে হবে। কোন কলের প্রধান বেল্‌টগুলা বদলাবার সময় কলটি থামাতে হবে।

ট্রানস্‌মিশান মেশিনারির পুলিতে লাগানো ষ্ট্র্যাপ চালাবার জন্যে ভাল যন্ত্র রাখতে হবে ; যন্ত্র এরকম হওয়া দরকার যে, হঠাৎ কল যেন আপনিই চল্‌তে আরম্ভ না করে ; 'অনাবশ্যক' বা অসম্ভব বুঝলে চীফ ইন্‌স্পেক্টার উক্ত যন্ত্র রাখবার দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি দিতে পারেন।

কোন নারী বা শিশু চলন্ত কল পরিষ্কার কর্‌তে পার্‌বে না ; পুরুষরা চলন্ত কল পরিষ্কার কর্‌তে পারে, তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের তা বন্ধ ক'রবার ক্ষমতা আছে।

অত্যন্ত দাহ্য পদার্থের নিকটে কেউ তামাক খেতে পারবে না, বা খোলা আলো নিয়ে যাবার জন্যে আদেশ কর্‌তে বা সম্মতি দিতে পারবে না। উক্ত নিষেধ একটি নোটিশে (ইংরাজীতে ও দেশীয় ভাষায়) লিখে দাহ্য পদার্থের কাছে (এবং অন্যত্র যেখানে ইন্‌স্পেক্টার বল্‌বেন) ম্যানেজার টাঙ্গিয়ে রাখবেন, এবং নিয়মটি যাতে মানা হয়, তার জন্যে আর যা কিছু উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে কর্‌বেন।

উৎপাদনের জন্য দাহ্য পদার্থ ব্যবহার কর্‌তে হ'লে আগুন নেবাবার বন্দোবস্ত সব সময়ে প্রস্তুত রাখতে হবে। ফ্যাক্টরীতে আগুন ধ'রলে

(অবস্থানুযায়ী যেরূপ সম্ভব সেরূপ) পালাবার উপায় ক'রতে হবে (১৬ ধারা)।

যদি কোন ঘরে ৩০ জনের বেশী কাজ করে, তা হ'লে সেই ঘরের দরজাগুলা যেন ভেতর হ'তে ঠেলে খোলা যায় (১৫ ধারা)।

ফ্যাক্টরীর যে সব অংশে মজুররা কাজ করে বা যাতায়াত করে সেই সব অংশে, ইন্‌স্পেক্‌টার সন্তুষ্ট হ'তে পারেন এরকম পরিমাণ আলোর বন্দোবস্ত ক'রতে হবে।

কটন প্রেসিং ফ্যাক্‌টরী যেখানে 'কটন-ওপ্‌নারে'র কাজ চলছে, সেখানে শিশু বা নারী কাজ ক'রতে পারবে না; তবে যদি 'কটন-ওপ্‌নারের 'ফিড-এণ্ড' ভাগটি 'ডেলিভারি-এণ্ড' ভাগটি হ'তে ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু একটি পার্টিশান দ্বারা পৃথক্ করা যায়, তা হ'লে যে ঘরে 'ফিড-এণ্ড'টি থাক্‌বে, সেই ঘরে নারী বা শিশু কাজ ক'রতে পার্‌বে।

খাটবার সময় ও ছুটি

খাটবার সময় সম্বন্ধীয় নিয়মসমূহ :—

কোনও মজুরকে হপ্তায় ৬০ ঘণ্টা (২৭ ধারা) ও দিনে ১১ ঘণ্টা (২৮ ধারা) বেশী খাটানো চল্‌বে না। নারীদের সকাল ৫॥০ ঘণ্টার পূর্ব্বে ও রাত্রি ৭টার পর[১] এবং দৈনিক ১১ ঘণ্টার বেশী খাটানো চল্‌বে না (২৪ ধারা)। শিশুদের সকাল ৫॥০টার পূর্ব্বে ও রাত্রি ৭টার পর[১] এবং দৈনিক ৬ ঘণ্টার বেশী খাটানো চল্‌বে না (২৩ ধারা)। যদি আধ ঘণ্টার বেশী ছুটী দেওয়া হয়, তবেই কাজের ঘণ্টা হিসাব ক'রবার সময়, ছুটীর সময়টুকু বাদ দেওয়া চল্‌বে (৫২ ধারা)। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি একই দিনে ২টি ফাক্‌টরীতে কাজ ক'রতে পারে, তবে তার মোট কাজের

১। এই সম্পর্কে ফ্যাক্টরী আইনের ৫১ ধারা দ্রষ্টব্য।

ঘণ্টা যেন দশের বেশী না হয়, এ বিষয়ে ম্যানেজারকে দৃষ্টি রাখতে হবে; কোন শিশু একই দিনে ২টি ফ্যাকৃটরীতে কাজ ক'রতে পাবে না।

ছুটীর নিয়ম ঃ—প্রত্যেক মজুর ৬ ঘণ্টা বা তার কম কাজ ক'রে অন্ততঃ ১ ঘণ্টা বিশ্রাম ক'রতে পারবে; মজুররা স্বেচ্ছায় ৫ ঘণ্টা বা তার কম কাজ ক'রে, অন্ততঃ ১ ঘণ্টা ছুটীর বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারে। তবে প্রতি ৬ ঘণ্টা কাজের জন্য অন্ততঃ ১ ঘণ্টা বিশ্রামের বন্দোবস্ত থাকা চাই; উক্ত দুটি নিয়মের বদলে, পুরুষ মজুররা সমস্ত দিনে মোট ৮।৷৹ ঘণ্টা বা তার কম কাজ ক'রে, ৷৷৹ আধ ঘণ্টা ছুটীর বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারে। তবে এই নিয়মটি চালাতে হ'লে, কেবল পুরুষ মজুরদের অনুরোধ নয়, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অনুমতিও থাকা দরকার এবং ৫ ঘণ্টার বেশী 'একটানা' (½ ঘণ্টার কম ছুটী থাকলে, খাটুনি 'একটানা' ব'লে গণ্য হবে) খাটানো চলবে না; বালকরা ৫৷৷৹ ঘণ্টার বেশী খাটলে অন্ততঃ ½ ঘণ্টা ছুটী পেতে পারবে—এই ½ ঘণ্টার ছুটী এরকম ভাবে দিতে হবে যে, তাদের ৪ ঘণ্টার বেশী 'একটানা' খাটতে না হয় (২১ ধারা)।

রবিবারে কাজ করাতে হ'লে এই কয়টি নিয়ম মান্‌তে হবে। রবিবারের আগের বা পরের তিন দিনের এক দিন পূরা ছুটী দিতে হবে, ইন্‌স্পেক্টারকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিশ দ্বারা জানাতে হবে, ফ্যাক্টরীর সদর ফটকের কাছে ইংরাজীতে ও অধিকাংশ মজুরের ভাষায় ঐ বিষয়ে একটি নোটিশ দিতে হ'বে; রবিবারে ছুটী না দেওয়ার মানে যদি এই দাঁড়ায় যে পূরা এক দিনের ছুটী না পেয়ে পর পর ১০ দিন কাজ কর্‌তে হবে, তা হ'লে রবিবারে ছুটী না দেওয়া চল্‌বে না; যে রবিবারে কাজ হচ্ছে, তার আগের তিন দিনের যে কোন দিন যদি ছুটী দেওয়া হয়, তা হ'লে সাপ্তাহিক কাজের

হিসাব করবার সময় রবিবারটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মধ্যে ধরা হবে (২২ ধারা)।

প্রত্যেক মজুর কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্য্যন্ত কাজ ক'রবে এবং কতক্ষণ ছুটী পাবে, তা ম্যানেজার ঠিক ক'রে দেবেন; কোন মজুরকে তার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাইরে খাটানো চল্‌বে না (২৬ ধারা)।

উক্ত নিয়মসমূহ হ'তে অব্যাহতি

খাটবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় উক্ত নিয়মগুলাকে যে সব ক্ষেত্রেই এবং ফ্যাক্টরীতে যে কেউ কাজ করে তাদের সকলের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হবে, তা নয়। অনেক সময়েই ঐগুলা মানা হ'তে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে।

কারখানার 'কর্ত্তৃত্বের' ভার যে সব লোকের ওপর থাকে, বা যারা ফ্যাক্টরীতে কোন দায়িত্বপূর্ণ' কাজ করে, তারা ২১, ২২, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮ ধারার স্থবিধা ভোগ করতে পারবে না। কাদের ওপর কারখানার কর্ত্তৃত্বের ভার আছে বা কারা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে, তা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্থির করে দেবেন। বাংলা গবর্ণমেণ্টের মতে নিম্নলিখিত লোকগুলার ওপর 'কর্ত্তৃত্বের' বা 'দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আছে:—(ক) ম্যানেজার, (খ) সহকারী ম্যানেজার, (গ) টেকনিক্যাল বিভাগগুলার কর্ত্তা ও তাদের সহকারী, (ঘ) এঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সহকারী, (ঙ) ফোরম্যান, (চ) যে সব ওভারশিয়ারকে মিল বা ফ্যাক্টরীর কোন বিভাগের তত্ত্বাবধান করতে হয়, (ছ) প্রধান ভাণ্ডারী ও তার সহকারী, (জ) অন্য যার ওপর

'কর্ত্তৃত্বের' বা 'দায়িত্বপূর্ণ কাজের' ভার আছে ব'লে ইন্‌স্পেক্টার বিবেচনা ক'রবেন।

যদি কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় বোঝেন যে,—

(১) কোন ফ্যাক্টরীতে ফ্যাক্টরীর সাধারণ কাজ ছাড়া তার "উত্তোগাত্মক" (প্রিপারেটারি) বা "পূরণাত্মক" (কম্‌প্লিমেন্‌টারি) কাজ চল্‌ছে, তা হ'লে ঐ উত্তোগাত্মক বা পূরণাত্মক কাজকে ২১, ২৭ ও ২৮ ধারার সকলগুলা বা যে কোন একটা হ'তে রেহাই দিতে পারেন।

(২) কোন ফ্যাক্টরীতে এরকম কাজ চল্‌ছে যা "মাঝে মাঝে স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নেই," তা হ'লে ঐ কাজকে ২১, ২২, ২৬ ২৭ ও ২৮ ধারার সবগুলা বা যে কোন একটা হ'তে রেহাই দিতে পারেন ;

(৩) কোন ফ্যাক্টরীতে এরকম কাজ চল্‌ছে যা "নানা টেক্‌নিক্যাল কারণে বিনা বিরামে চালাতে হবে," তা হ'লে ঐ কাজকে ২১, ২২ ও ২৮ ধারার সবগুলা বা যে কোন একটি থেকে রেহাই দিতে পারেন ;

(৪) কোন ফ্যাক্টরীতে এরকম জিনিষ উৎপন্ন হচ্ছে যা "সাধারণের একান্ত ও প্রত্যহ দরকার," বা এরকম কাজ চল্‌ছে যা "কাজের ধরণের জন্য" বা "ব্যবসায়ের প্রয়োজন অনুসারে" বৎসরের কেবল বিশেষ বিশেষ ঋতুতেই চল্‌তে পারে অথবা যা প্রাকৃতিক শক্তির অনিয়মিত কার্য্যের ওপর নির্ভর করে, তা হ'লে এরকম উৎপাদন বা কাজকে ২২ ধারা হ'তে রেহাই দিতে পারেন।

(৫) কোন ফ্যাক্টরীতে এরকম কাজ চল্‌ছে যা "প্রাকৃতিক শক্তির অনিয়মিত কার্য্যের ওপর নির্ভর করে" তা হ'লে এই ধরণের কাজকে ২৬ ধারা হ'তে অব্যাহতি দিতে পারেন।

(৬) কোন ফ্যাক্টরীতে "কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী," তা হ'লে সেই ফ্যাক্টরীকে (ফ্যাক্টরীর কোন বিশেষ রকম কাজই শুধু নয়) ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ ধারা মান্‌বার দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি দিতে পারেন।

উক্ত ৬টীর যে কোন একটি নিয়মমতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কোন ফ্যাক্টরীকে রেহাই দিলে, এবং তদনুসারে কোন মজুরকে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার বেশী খাটান হ'লে, সে তার অতিরিক্ত খাটার সময়-টুকুর জন্যে সাধারণ মাইনের সিকি ভাগ বেশী হিসাবে মাইনে পাবে।

খাটবার সময় ও ছুটি সম্বন্ধীয় নিয়মগুলা হ'তে আর কখন রেহাই পাওয়া যেতে পারে তা বলা যাচ্ছে:—

(৭) "অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ" সম্বন্ধে ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ ধারা খাটবে না, তবে কোন্ অবস্থায় আর কি সর্ত্তে খাটবে না, তা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ব'লে দেবেন।

(৮) "নীলের ফ্যাক্টরী" এবং "চা বা কফির আবাদে অবস্থিত ও আবাদের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত" ফ্যাক্টরীকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ২১ ও ২২ ধারা হ'তে অব্যাহতি দিতে পারেন;

(৯) যারা "ফ্যাক্টরীর এঞ্জিন ঘরের বা কয়লার ঘরে" কাজ করে তাদের সম্বন্ধে কোন্ ফ্যাক্টরী বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ফ্যাক্টরীকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ২২ ধারা হ'তে অব্যাহতি দিতে পারেন।

(১০) যদি কোন ফ্যাক্টরীতে "মাছ তাজা রাখবার কাজ" চলে, আর যদি "কাঁচা মাল নষ্ট হওয়া নিবারণ করবার জন্যে স্ত্রী-মজুরদের সকালে ৫½ টার আগে বা রাত্রি ৭ টার পর খাটানো আবশ্যক হয়, তা হ'লে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট উক্ত ফ্যাক্টরীতে স্ত্রী-মজুরদের ঐ সময়ের মধ্যে খাটাবার অনুমতি দিতে পারেন।

নিয়মগুলা হ'তে রেহাই দেওয়া সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলা ভারত-গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন। কেবল কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী হওয়ার জন্য ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ ধারা হ'তে রেহাই দেওয়া সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন নয়।

কোন ফ্যাক্টরীকে কোন নিয়ম হ'তে অব্যাহতি দেবার সময়ে, কি কি সর্ত্তে সেই অব্যাহতি ভোগ করা চল্‌বে তা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করে দেবেন। বাংলা গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষমতানুসারে এপর্য্যন্ত এই দুটা নিয়ম তৈরী করেছেন:—(১) ওপরের প্রথম ৭টা নিয়মানুসারে স্ত্রী-মজুর সম্বন্ধে ২৭ ধারা হ'তে অব্যাহতি পেলেও, স্ত্রী-মজুরদের সপ্তাহে মোট ৬ ঘণ্টার বেশী 'ওভারটাইম' খাটানো চল্‌বে না; (খ) ওপরের ৬টা নিয়মানুসারে যে কোন মজুর সম্বন্ধে ২৭ ও ২৮ ধারা হ'তে অব্যাহতি পেলেও, প্রতি মাসে মোট ৪০ ঘণ্টার বেশী 'ওভারটাইম' খাটানো চল্‌বে না। বাংলা গবর্ণমেণ্ট আরও সর্ত্ত নির্দ্দেশ কর্‌বার ক্ষমতা হাতে রেখেছেন।

নোটিশ, রেজেষ্ট্রি, ও রিটার্ণ

একটি নূতন ফ্যাক্টরী যে দিন প্রথম কাজ আরম্ভ ক'রবে, সেই দিন বা তার আগে ইন্‌স্পেক্টারকে একটি লিখিত নোটিশ পাঠাতে হবে। এই নোটিশে এই কয়টি বিষয়ের উল্লেখ থাকবে:—ফ্যাক্টরীর নাম ও অবস্থিতি; কোন্ ঠিকানায় ফ্যাক্টরীর চিঠিপত্রাদি পাঠাতে হ'বে; ফ্যাক্টরীতে কি ধরণের কাজ হয়; কি ধরণের ও কত পরিমাণের 'শক্তি' ফ্যাক্টরীতে নিয়োজিত হয়; ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের নাম। বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে প্রদত্ত "এ" ফর্‌মটি পূরণ করে পাঠালেই এই

সংবাদগুলা (বরং কিছু বেশী) জানান হবে। যদি ফ্যাক্টরীটিতে সারা বছরই কাজ না হ'য়ে বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে (সীজনে) কাজ হয়, তা হ'লে প্রত্যেক সীজনে কাজ আরম্ভ করবার দিনে বা তার আগে নোটিশ পাঠাতে হবে। নোটিশ পেলে ফ্যাক্টরীর রেজেষ্ট্রীতে ইন্‌স্পেক্‌টার ফ্যাক্‌টরীটি রেজেষ্ট্রী ক'রে নেবেন। যদি ইন্‌স্পেক্টার মনে করেন যে, তাঁর এলাকার মধ্যে কোন বাড়ী ফ্যাক্টরী-রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে অথচ তা রেজেষ্ট্রী করা হয় নি, তা হ'লে তিনি তা রেজেষ্ট্রী ক'রে নেবেন এই মর্ম্মে অকুপায়ারকে জানাবেন ও একটি "এ" ফর্ম্ম পাঠিয়ে দেবেন, ১৫ দিনের মধ্যে 'অকুপায়ার' ফর্‌মটি পূরণ করে পাঠাবেন। রেজেষ্ট্রী করা বিষয়ে আপত্তি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তির কারণগুলা ও "এ" ফর্‌মে যে খবরগুলা চাওয়া হয় সেই খবরগুলা জানাবেন; আপত্তির কারণগুলা বিবেচনা ক'রে রেজেষ্ট্রী করা হবে কি না তা ইন্‌স্পেক্টার স্থির করবেন।

কোন বাড়ী আর ফ্যাক্টরীরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে না, এরকম নোটিশ পেলে (ম্যানেজার বা অকুপায়ার এইরকম নোটিশ দিতে বাধ্য) ইন্‌স্পেক্টার সেই বাড়ীটিকে ফ্যাক্টরীর রেজেষ্ট্রী হ'তে বাদ দেবেন। কোন বাড়ীকে আইন অনুযায়ী ফ্যাক্টরীরূপে আর গণ্য করা চলে না বুঝলে (নোটিশ আসুক বা নাই আসুক), বাড়ীটিকে ফ্যাক্টরীর রেজেষ্ট্রী হ'তে বাদ দেওয়া চলবে। তবে ফ্যাক্টরীটিতে যদি বিশেষ বিশেষ সীজনে কাজ চলে, এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাতে যদি কাজ আরম্ভ হবার সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে উক্ত নিয়মানুসারে ফ্যাক্টরীকে রেজেষ্ট্রী হ'তে বাদ দিলে চলবে না।

ম্যানেজার বদলান হ'লে ৭ দিনের মধ্যে 'অকুপায়ার' ইনস্পেক্টা-রের কাছে লিখিত নোটিশ পাঠাবেন। যদি কোন সময়ে ম্যানেজার-

রূপে কেহ নির্ব্বাচিত না হ'য়ে থাকেন, বা কেহ নির্ব্বাচিত হ'লেও তিনি যদি ম্যানেজারের কাজ না করেন, তা হলে যিনি প্রকৃতপক্ষে ফ্যাক্টরীর তত্ত্বাবধান করবেন তাঁকে অথবা সেরকম কেউ না থাকলে 'অকুপায়ারকে', ম্যানেজার ব'লে ধ'রে নেওয়া হবে।

যদি এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যার জন্যে কারও মৃত্যু হ'য়েছে অথবা এমন শারীরিক আঘাত ঘটেছে যার দরুণ ৪৮ ঘণ্টার বেশী অনুপস্থিত হ'তে হ'য়েছে, অথবা যে সব 'কারণ' প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছেন সেই সব কারণের কোন একটির জন্যে যদি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তা হ'লে (যাকে ও যে সময়ের মধ্যে বলা হবে, তাকে ও সেই সময়ের মধ্যে) ম্যানেজার নোটিশ পাঠাবেন।

ফ্যাক্টরী আইনের এই নিয়মানুযায়ী বঙ্গীয় নিয়মাবলী :—

নিম্নলিখিত দুর্ঘটনাগুলাকে সাঙ্ঘাতিক বলে গণ্য করা হবে (ক) যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে, (খ) যদি ২০ দিনের মধ্যে সেরে ওঠবার সম্ভাবনা না থাকে, (গ) যদি চিরকালের জন্যে কোন অঙ্গহানি ঘটে, (ঘ) যদি চিরকালের জন্যে দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়। কোন দুর্ঘটনার জন্যে মৃত্যু হ'লে বা কোন সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটলে, ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ ইনস্পেক্টার ও ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের (ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করলে, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে সাবডিভিশন্যাল অফিসারের) কাছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বা বিশেষ সংবাদ-বাহক দ্বারা খবর পাঠাবেন। মৃত্যু হ'লে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় থানার কর্ত্তার কাছেও সংবাদ পাঠাতে হবে। উক্ত দুর্ঘটনাগুলা অপেক্ষা কম সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনাকে 'সামান্য' দুর্ঘটনা ব'লে গণ্য করা হবে। যদি দুর্ঘটনা সামান্য হয়, অথচ তার জন্যে অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা কাজে অনুপস্থিত হবার সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে তার কথা লিখে রাখতে হবে এবং

যত শীঘ্র সম্ভব (কিন্তু অন্ততঃ ৬০ ঘণ্টার মধ্যে) উল্লিখিত ব্যক্তিদের কাছে সংবাদ পাঠাতে হবে। 'সামান্য' দুর্ঘটনাকে পরে সাঙ্ঘাতিক ব'লে বুঝতে পারলে তখনই ভুল শুধরে একটি অতিরিক্ত রিপোর্ট পাঠাতে হবে। দুর্ঘটনার জন্যে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'লে যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই স্থানটি দুর্ঘটনার সময় যেমন ছিল, ইন্‌স্পেক্‌টার না আসা পর্য্যন্ত (অথবা ৩ দিনের মধ্যে ইন্‌স্পেক্টার না আস্‌লে অন্ততঃ ৩ দিন পর্য্যন্ত) ঠিক তেমনই রাখ্‌তে হবে। তবে এই নিয়মটি মান্‌তে হ'লে যদি বিপদ বাড়বার বা স্থায়ী হবার সম্ভাবনা থাকে, অথবা যদি এর জন্য ফ্যাক্টরীর কাজে অত্যন্ত বাধা পড়ে, তা হলে এটা না মান্‌লে চল্‌বে। যে যে স্থানে এই নিয়মটি কার্য্যকরী হবে ব'লে বাংলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে নোটিশ দেবেন, কেবল সেই সেই স্থানেই এই নিয়মটি খাটবে।

ফ্যাক্টরীতে কোন স্ফুরণ বা অগ্নিকাণ্ড ঘটলে অথবা গৃহপতন বা যার জন্যে শারীরিক আঘাত ঘটেছে বা ঘটতে পারে কলকব্জার এরকম কোন গুরুতর দোষ হ'লে, ম্যানেজার ৫ ঘণ্টার মধ্যে ইনস্পেক্টার ও ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের (বা সাবডিভিশন্যাল অফিসারের) কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন।

ফ্যাক্টরীর সদর ফটকের কাছে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরকম স্থানে একটি নোটিশ ঝোলাতে হবে।* ফ্যাক্‌টরী আইন ও তদনুযায়ী প্রাদেশিক নিয়মাবলীর সার-মর্ম্ম এবং প্রত্যেক দিন ফ্যাক্টরীতে কাজ আরম্ভ ও বন্ধ করবার সময়, প্রত্যেক মজুরের খাটবার সময়, সাপ্তাহিক ছুটী প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ফ্যাক্টরীর নিয়মগুলা ঐ নোটিশে উল্লেখ ক'রতে হবে।* ইংরাজী ও অধিকাংশ মজুরের মাতৃভাষা—এই দুই ভাষায় নোটিশটি রাখতে হবে।* নোটিশের লেখাগুলা যেন সব

* ৩৬ ধারা।

সময়েই প'ড়তে পারা যায়। ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্যে নোটিশটাকে হয় কাচের ফ্রেমে পূর্‌তে হবে, না হয় অন্য কোন ব্যবস্থা ক'রতে হবে। ফ্যাক্টরীর কাজ আরম্ভ হবার ১ মাসের মধ্যেই এই নোটিশের একটি কপি ইনস্পেক্টারের নিকট পাঠাতে হবে। * নোটিশটিতে কোন ভুল থাকা, ফ্যাক্টরীর নিয়ম বা অন্য কোন নিয়ম বদলালেও নোটিশটিকে না বদলান, বা নোটিশ বদলান হ'লে ইনস্পেক্টারকে না জানান; আইন-বিরুদ্ধ।* খাটবার সময় ছুটী প্রভৃতি সম্বন্ধে ফ্যাক্টরীর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হ'লে, সেই নিয়ম অনুযায়ী মজুরদের খাটাবার আগে নোটিশটিকে বদলান আবশ্যক; যে সময় হ'তে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হবে, তার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ইনস্পেক্টারের কাছে পরিবর্ত্তিত নোটিশের দুটি কপি পাঠাতে হবে।*

প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে কত জন কাজ করে, তারা কয় ঘণ্টা ও কি ধরণের কাজ করে, তা 'এমপ্লয়মেণ্ট রেজিষ্টার' ১ নামে একটি রেজিষ্ট্রীতে লিখে রাখ্‌তে হবে (৩৫ ধারা)। রেজিষ্ট্রীটি যে ধরণের বলা হবে ঠিক সেই ধরণে (বাংলায়—বঙ্গীয় নিয়মাবলীর শেষে দেওয়া ফর্‌ম্‌ অনুযায়ী) রাখতে হবে। রেজিষ্ট্রীর ৩টি ভাগ থাকবে। প্রথমভাগে পূর্ণবয়স্কদের, দ্বিতীয়ভাগে শিশুদের এবং তৃতীয়ভাগে শেডিউল্‌ড্‌ ওয়ার্কারদের (অর্থাৎ যে সকল নারী বা শিশু বিশেষ সার্টিফিকেট পেয়ে লেড্‌ কম্পাউণ্ড-সম্পর্কিত কোন কাজে নিযুক্ত) বিবরণ থাকবে। যখন যেমন পরিবর্ত্তন হবে, রেজিষ্ট্রীতে তা লিখতে হবে। 'এমপ্লয়মেণ্ট রেজিষ্টার' ছাড়া ফ্যাক্টরীতে আরও ৩টি রেজিষ্ট্রী রাখ্‌তে হবে:—(১) শিশুদের রেজেষ্ট্রী (চিলড্রেন্‌স্‌ রেজিষ্টার); বঙ্গীয় নিয়মা- "কে" ফর্‌মে এই রেজিষ্ট্রী রাখতে হবে; প্রত্যেক বৎসরের

* ৩৬ ধারা।

১লা জানুয়ারী থেকে এই রেজিষ্ট্রী নতুন করে লিখ্‌তে হবে; (২) ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক ঘরের কালি ও ঘন মাপ, যে ঘরগুলায় কলকব্জা আছে, সেই ঘরগুলার প্রত্যেকের কতখানি স্থান জুড়ে কলকব্জা আছে তার মাপ, প্রত্যেক ঘরের জানালা দরজা প্রভৃতি হাওয়া ঢোক্‌বার স্থানগুলার মাপ—এইগুলা একটি রেজিষ্ট্রীতে (স্পেস্‌ রেজিষ্টার) লিখে রাখ্‌তে হবে; (৩) কোন্‌ কোন্‌ তারিখে ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন অংশগুলা চুণকাম, পেন্টিং ও বার্ণিশ করা হয়, তাও একটি রেজিষ্ট্রীতে (লাইম-ওয়াশিং অ্যাণ্ড পেন্টিং রেজিষ্টার) লিখে রাখ্‌তে হবে। চুণকামকরা প্রভৃতি বিষয়ে যদি ফ্যাক্টরীকে রেহাই দেওয়া হ'য়ে থাকে, তা হ'লে অবশ্য শেষোক্ত রেজিষ্ট্রীটি রাখ্‌তে হবে না।

ফ্যাক্টরী আইন মান্‌তে বাধ্য কর্‌বার জন্যে কি কি বিষয়ে ম্যানেজার বা অকুপায়ারের কাছে রিটার্ণ চাওয়া হবে, সে বিষয়ে সকৌন্সিল বড়লাট নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে পারেন। বঙ্গীয় নিয়মাবলীর শেষে উদ্ধৃত (কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রস্তুত) "এইচ" ফরমে ২ কপি ক'রে রিটার্ণ প্রত্যেক বছরের ১৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে ইনস্পেক্টারের কাছে পাঠাতে হবে। যদি রিটার্ণ ভুল থাকে, বা তা যদি ঠিক সময়ে পাঠান না হয়, বা সমস্ত ফর্‌মটি যদি পূরণ করা না হয়, তা হ'লে রিটার্ণটি রিটার্ণ বলেই গণ্য করা হবে না এবং ম্যানেজার বা অকুপায়ার আদবেই রিটার্ণ না পাঠানোর শাস্তিভোগ (৫০০ টাকা জরিমানা) করতে বাধ্য থাকবেন।

ইনস্পেক্টার

প্রত্যেক প্রদেশে বিশেষ বিশেষ সীমানার (এরিয়া) জন্যে একজন ক'রে ইনস্পেক্টার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন; একই

সীমানার মধ্যে একজনের বেশী ইনস্পেক্টার থাক্‌লে, কোন্ ইনস্পেক্টারের কিরূপ ক্ষমতা এবং কোন্ ইনস্পেক্টারের কাছে কোন্ নোটিশ পাঠাতে হবে, তা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই ঠিক ক'রে দেবেন। ফ্যাক্টরীর সঙ্গে ফ্যাক্টরীতে চালিত কাজের সঙ্গে বা ফ্যাক্টরীর কোন পেটেণ্ট বা কলকব্জার সঙ্গে যার কোন স্বার্থ জড়িত আছে, তিনি ইনস্পেক্টার হ'তে বা থাক্‌তে পারবেন না। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর এলাকার ফ্যাক্টরী-গুলা সম্বন্ধে একজন ইনস্পেক্‌টার ব'লে গণ্য হবেন। গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য কর্ম্মচারীদেরও অতিরিক্ত ইনস্পেক্‌টাররূপে নিযুক্ত করা যেতে পারে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ইনস্পেক্‌টারকে "সরকারী কর্ম্ম চারী' ব'লে ধরা হবে।

ইন্সপেক্টারের কর্ত্তব্যসমূহ

ফ্যাক্‌টরী আইন ও প্রাদেশিক নিয়মাবলী অনুযায়ী কারখানাগুলাকে শাসন ক'রবার জন্যে চীফ ইন্‌স্পেক্‌টারই প্রধানতঃ দায়ী এবং যে রকম ক্ষমতা দেওয়া হবে তদনুযায়ী অন্যান্য ইন্‌স্পেক্‌টারও দায়ী।

নিজে যতবার আবশ্যক বুঝবেন অথবা কর্ত্তৃপক্ষ যতবার ব'লবেন ততবার নিজ এলাকার ফ্যাক্‌টরীগুলা পরিদর্শন করা—এইটাই প্রত্যেক ইন্‌স্পেক্‌টারের কাজ। স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুর্ঘটনা-নিবারণের নিয়ম ও খাটবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় নিয়মগুলা ঠিক মানা হচ্ছে কি না, শিশুদের প্রত্যেকের সার্টিফিকেট আছে কি না, খাটবার সময় ও ছুটীর ঠিক ঠিক হিসাব রাখা হচ্ছে কি না, পূর্ব্বে ফ্যাক্‌টরীর যে সব দোষ দেখান হ'য়েছিল সেগুলা শোধরানো হ'য়েছে কি না, এবং যে সব হুকুম জারি করা হ'য়েছিল সেগুলা মানা হ'য়েছে কি না—এইগুলা দেখাই তাঁর

কর্ত্তব্য। পরিদর্শনে যাবার আগে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তা হ'লে তার জন্যে দায়ী কে, এ সম্বন্ধে তাঁকে অনুসন্ধান ক'রতে হবে এবং একটি রিপোর্ট লিখে এক কপি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ও এক কপি ম্যানেজারের কাছে পাঠাতে হবে। আইন ও নিজের হুকুমগুলা মানা হ'য়েছে কি না, বা কোন্ কলকব্জা কত বৎসরের পুরানো বা তার অবস্থা ও ইতিহাস কিরকম তাহা জানবার জন্যে তিনি যে তথ্য চাইবেন, ম্যানেজার বা অকুপায়ার তা তখনই (চিঠিতে চাইলে ৭ দিনের মধ্যে) জানাতে বাধ্য। ফ্যাক্টরীর বাড়ী, কলকব্জা, মজুরদের কাজ করবার সামর্থ্য সম্বন্ধে যা কিছু চিঠি, সার্টিফিকেট, রিপোর্ট প্রভৃতি দলিল আছে, তা চাইলে ম্যানেজার যোগাতে বাধ্য। ইন্স্পেক্টার পরিদর্শনে আসলে ম্যানেজার বা অকুপায়ার তাঁকে কোন বাধা দেবেন না, বা আর কাকেও বাধা দিতে দেবেন না, এবং কোন সাক্ষীকে লুকাবেন না বা তাঁর কাছে আসতে বাধা দেবেন না। পরিদর্শন শেষ হ'লে ইন্স্পেক্টার একটি রিপোর্ট লিখবেন এবং তার এক কপি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে, এক কপি ম্যানেজার বা অকুপায়ারের কাছে এবং তার যতটুকু ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের আবশ্যক হ'তে পারে ততটুকু তাঁর কাছে পাঠাবেন। পরিদর্শনে গিয়ে তিনি যা কিছু হুকুম জারি করবেন তার একটা রেকর্ড রাখবেন। মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোন আইন অমান্য করা হচ্ছে বুঝলে তিনি তা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের নজরে আনতে পারেন ,এবং ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী নিজের যা ক'রবার আছে তাহাও ক'রতে পারেন। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বা অতিরিক্ত (এডিশন্যাল) ইন্স্পেক্টার পরিদর্শনে গিয়ে যা কিছু নোট ক'রবেন তা ইন্স্পেক্টারের কাছেই পাঠিয়ে দেবেন। আইন ভঙ্গ করার জন্যে যা করবার ইনস্পেক্টারই ক'রবেন।

কোন নতুন ফ্যাক্টরী নির্ম্মিত হবে এরকম নোটিশ পাবার পর, ঐ ফ্যাক্টরীর অকুপায়ার বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আবেদন ক'রলে স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা নিবারণের দিক্ হ'তে ফ্যাক্টরীর ডিজাইন সম্বন্ধে ইনস্পেক্টার পরামর্শ দিতে পারেন। ঐরকম পরামর্শ অনুসারে কাজ করার ওজরে পরে ফ্যাক্টরীর কোন দোষ দেখা গেলে তা শোধরাবার দায়িত্ব হ'তে অকুপায়ার মুক্তি পাবে না।

ফ্যাক্টরী রেজিষ্ট্রী (ফ্যাক্রী আরম্ভের সময় প্রেরিত নোটিশগুলা হ'তে সঙ্কলিত) হ'তে প্রত্যেক জেলার ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায়, তা প্রতি বছর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর আগে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাতে হবে।

ইনস্পেক্টারের ক্ষমতাগুলা এইবার বলা হচ্ছে ঃ—

(১) প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে (অথবা ফ্যাটরী ব'লে ইনস্পেক্টার কর্ত্তৃক অনুমিত স্থানে) ইনস্পেক্টারের প্রবেশের ক্ষমতা আছে।

(২) তিনি ফ্যাক্টরীর বাড়ী, যন্ত্রপাতি ও রেজিষ্ট্রীগুলা পরীক্ষা ক'রতে পারেন এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে যার ইচ্ছা (ফ্যাক্রীতে বা অন্যত্র) তার সাক্ষ্য নিতে পারেন ; তবে কাকেও এমন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য ক'রতে পারবেন না, যার উত্তর দিলে দণ্ডনীয় অপরাধে প'ড়তে হয়।

(৩) ফ্যাক্টরী আইনের উদ্দেশ্য সফল ক'রবার জন্যে তিনি আর যা কিছু করা আবশ্যক বোঝেন তা করবেন, তবে, এ বিষয় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলা নিয়মসমূহ তৈরী ক'রতে পারেন।

(৪) যদি কোন শিশুকে তিনি মজুরি ক'রতে অসমর্থ ব'লে মনে করেন, তা হ'লে যতদিন না সে সার্টিফাইং সার্জ্জন কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়, ততদিন তার কাজ করা বন্ধ করতে পারেন ;

(৫) ফ্যাক্টরীর আইন ভঙ্গ করার অপরাধে কাকেও শাস্তি দিতে হ'লে, ইনস্পেক্টারই কেবল মোকদ্দমা ক'রতে বা মোকদ্দমা ক'রবার অনুমতি দিতে পারেন। ইনস্পেক্টার ম্যানেজারের উপর কয়েকটি হুকুম-জারি ক'রতে পারেন, যেমন—

(১) নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধূলা প্রভৃতি অপরিষ্কার দ্রব্যের গ্রহণ নিবারণ করবার জন্যে একটি বিশেষ তারিখের মধ্যে 'ফ্যান' বা অন্য কোন যন্ত্র খাড়া ক'রতে (১০ ধারা);

(২) যাতে উপযুক্ত পরিমাণে আলো আসতে পারে, একটি বিশেষ তারিখের মধ্যে তা ক'রতে (১১ ধারা);

(৩) যে জল হ'তে আর্দ্রতা প্রস্তুত করা হয়, তা শোধিত করবার জন্যে তাঁর মতে যা করা আবশ্যক, একটি বিশেষ তারিখের মধ্যে তা ক'রতে (১২ ধারা);

(৪) একটি বিশেষ তারিখের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের সময় পালাবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত ক'রতে (১৬ ধারা);

(৫) বেড়া না-দেওয়া যন্ত্রপাতি হ'তে বিপদের ভয় থাকলে, বিপদ্ নিবারণ করবার জন্যে তিনি যা কিছু করা প্রয়োজন মনে করবেন, তা একটি বিশেষ তারিখের মধ্যে ক'রতে [১৮ (২) ধারা];

(৬) বয়স কম ব'লে নিযুক্ত করা যেতে পারে না এরকম কোন শিশু ফ্যাক্টরীর মধ্যে উপস্থিত থাকলে, যদি তার স্বাস্থ্যহানির ভয় থাকে তা হ'লে তার প্রবেশ নিষেধ ক'রতে (১৯ক ধারা);

(৭) বিপজ্জনক মনে হ'লে, কোন ফ্যাক্টরী, বা তার কোন অংশ বা যন্ত্রপাতি মেরামত ক'রতে, অথবা আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা দেখলে. তার ব্যবহার বন্ধ ক'রতে (১৮ক ধারা);

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ আদেশ দুটি বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে আর উদ্ধৃত করা

হয় নি; অপর কয়টি আদেশের কথা বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে আরও সবিস্তারে দেওয়া হ'য়েছে (বঙ্গীয় নিয়মাবলীর ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৬ ও ২৮ সংখ্যক নিয়মগুলা দ্রষ্টব্য)।

ইনস্পেক্টারের আদেশ যে মানতেই হবে তা নয়। আদেশগুলার যে কোনটার বিরুদ্ধে আদেশ পাবার দিন থেকে ১৪ দিনের মধ্যে কমিশনারের কাছে আপীল চ'লতে পারে (এই সম্বন্ধে ফ্যাক্টরী আইনের ৫০ ধারা ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীর ৯৬ থেকে ১০০ সংখ্যক নিয়মগুলা দ্রষ্টব্য)।

সার্টিফাইং সার্জ্জন (স্বাস্থ্য ও বয়স পরীক্ষক)

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ডাক্তারদের সার্টিফাইং সার্জ্জনরূপে নিযুক্ত ক'রতে পারেন। বিশেষ বিশেষ সীমানার মধ্যে অবস্থিত ফ্যাক্টারীগুলার মজুরদের বয়স ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভার সার্টিফাইং সার্জ্জনের ওপর। সার্টিফাইং সার্জ্জন দ্বারা পরীক্ষিত হ'য়ে বয়স ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সার্টিফিকেট না পেলে কেউ ফ্যাক্টরীতে মজুরি ক'রতে পারবে না। মজুরদের কোথায় ও কখন পরীক্ষা করা হবে তা সার্টিফাইং সার্জ্জন ম্যানেজারকে জানাবেন। যে মজুর হ'তে চায় তার অনুরোধে, অথবা তার পিতা বা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবকের অনুরোধে, অথবা যে ফ্যাক্টরীতে কাজ ক'রতে চায় সেই ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের অনুরোধে, পরীক্ষা চ'লতে পারে। পরীক্ষার জন্যে কোন ফী দেওয়া বা নেওয়া আইন-বিরুদ্ধ। ফী দেওয়ার বা নেওয়ার কথা জানতে পারলে, সার্টিফিকেট অন্যায়ভাবে দেওয়া না হ'লেও ইনস্পেক্টার ব্যাপারটি কর্ত্তৃপক্ষের নজরে আনতে পারেন।

সার্টিফিকেট দু রকম—"শেডিউলড্ ওয়ার্কার্স মেডিক্যাল সার্টি-ফিকেট" ও "জেনারেল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট।" যে কাজে লেড কম্পাউণ্ড নিয়ে নাড়া চাড়া করতে হয়, এরকম কোন কাজে নারী বা শিশু নিযুক্ত হ'তে চাইলে তার প্রথম প্রকারের সার্টিফিকেট থাকা চাই; নারী বা শিশু লেড কম্পাউণ্ড সম্পর্কিত কাজ ব্যতীত অন্য যে কোন কাজ ক'রতে চাইলে, তার "জেনারেল মেডিক্যাল সার্টি-ফিকেট' থাকা দরকার।

সার্টিফাইং সার্জ্জন যে কোন যোগ্য ডাক্তারকে উক্ত দুই প্রকা-রের সার্টিফিকেটই দেবার ক্ষমতা দিতে এবং তা কেড়ে নিতে পারেন। সার্টিফাইং সার্জ্জনের কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডাক্তারের নাম—"একৃজামিনিং সার্জ্জন"। তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটকে বলে "প্রভিশান্যাল (অস্থায়ী) সার্টিফিকেট। সার্টিফাইং সার্জ্জন অস্থায়ী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ৩ মাসের মধ্যে নিজে পরীক্ষা ক'রে তার সার্টিফিকেট অসমর্থন ক'রলে তা নাকচ হবে।

ফ্যাক্‌টরী পরিদর্শন করা সার্টিফাইং সার্জ্জনের কর্ত্তব্যের মধ্যে। যে-সব কাপড়ের ফ্যাক্‌টরীতে দেড়শ' বা দেড়শ'র কম শিশু মজুর নিযুক্ত সেগুলা বছরে ৬ বার এবং যেগুলাতে দেড়শ'র বেশী শিশু মজুর নিযুক্ত সেগুলা বছরে ১২ বার পরিদর্শন ক'রতে হবে। কাপড়ের ফ্যাক্‌টরী ছাড়া অন্য যে কোন প্রকার ফ্যাক্‌টরীতে দেড়শ' বা দেড়শ'র কম শিশু মজুর থাকলে চীফ ইনস্পেক্‌টার যতবার বলবেন ততবার, এবং দেড়-শতের অধিক থাকলে বছরে ৬ বার, পরিদর্শন ক'রতে হবে।

সার্টিফাইং সার্জ্জন যখনই পরিদর্শনে আসবেন, তখনই ম্যানেজার সেই ফ্যাক্‌টরীতে যতগুলি অস্থায়ী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত শিশু ও শেডিউলড্ ওয়ার্কার আছে, তাদের পরীক্ষা করাবার জন্যে তাঁর কাছে আনবেন।

অস্থায়ী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোন শিশুকে তাঁর সাম্‌নে না আনলে সেই শিশুর নাম, তার সার্টিফিকেটের সংখ্যা এবং সার্টিফাইং সার্জ্জন নিজে কি শাস্তির বন্দোবস্ত ক'রেছেন তা ইনস্পেক্টারকে জানাবেন; সার্টিফাইং সার্জ্জন সেই শিশুর সার্টিফিকেট রদ ক'রতে পারেন বা তাকে আরও ৩ মাস কাজ ক'রতে দিতে পারেন। অস্থায়ী সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত শিশুদের বয়স ১২ হ'তে ১৫ বছরের মধ্যে এবং তাদের মজুরী ক'রবার সামর্থ্য আছে বুঝলে, তাদের সার্টিফিকেট সমর্থন করা হবে—নয়তো সেগুলা রদ করা হবে। অস্থায়ী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শেডিউলড্ ওয়ার্কারদের পরীক্ষার পর তাদের সার্টিফিকেট সমর্থন বা রদ করা হবে। অন্যান্য শেডিউলড্ ওয়ার্কারদের সার্টিফিকেট সমর্থন. রদ বা স্থগিত করা হবে। যদি কেহ শেডিউলড্ ওয়ার্কার হ'তে ইচ্ছুক হয়, তা হ'লে সার্টিফাইং সার্জ্জন তার পরীক্ষা ক'রবেন এবং উপযুক্ত বুঝলে তাকে সার্টিফিকেট দেবেন। মজুরী ক'রতে অসমর্থ বুঝলে তিনি যে কোন শিশুর সার্টিফিকেট রদ করতে পারেন। যদি সার্টিফিকেট না দেওয়া হয় বা রদ করা হয়, তা হ'লে যাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হ'ল না বা যার সার্টিফিকেট রদ করা হ'ল সে অনুরোধ ক'রলে, অথবা তার পিতা বা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবক কিংবা যে ফ্যাক্টরীতে সে ঢুকতে চায় বা ঢুকেছিল সেই ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার বা অকুপায়ার অনুরোধ ক'রলে, সার্টিফাইং সার্জ্জন সার্টিফিকেট না দেবার বা রদ ক'রবার কারণ লিখে জানাবেন। যার সার্টিফিকেট রদ কিংবা স্থগিত করা হ'য়েছে ম্যানেজার তাকে খাটাতে পারবেন না।

কোন শিশু পূর্ণবয়স্ক (১৫ বৎসরের ওপর) ব'লে গণ্য হবার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হ'তে চাইলে ম্যানেজার বা ইনস্পেক্টার সার্টিফাইং সার্জ্জন দ্বারা তার পরীক্ষা করাতে পারেন; তিনি পরীক্ষা

ক'রে শিশুটিকে পূর্ণবয়স্ক ও কাজে সমর্থ ব'লে বুঝলে তদনুযায়ী সার্টিফিকেট দেবেন।

দণ্ড ও কার্য্যবিধি

যদি কোন ফ্যাক্‌টরীতে (ক) ফ্যাক্‌টরী আইনের ১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮ (১), ১৮ (৩), ১৮ (৪) বা ৩৬ ধারার যে কোনটি অমান্য করা হয় বা ৩৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টিটি পরিবর্ত্তনানুযায়ী, না, বদলান হয়, অথবা (খ) ফ্যাক্‌টরী আইনের ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৮, ১৮ (ক) ও ১৯ (ক) ধারা অনুযায়ী ইনস্পেক্‌টারের আদেশ অমান্য করা হয়, অথবা (গ) ফ্যাক্‌টরী আইন বা প্রাদেশিক নিয়মাবলী অনুযায়ী কোন নোটিশ বা রিটার্ণ না পাঠানো হয়, তা হ'লে ম্যানেজার ও অকুপায়ারের (প্রত্যেকের ও উভয়ের) ৫ শত টাকা অবধি জরিমানা হ'তে পারে।

আইন ভঙ্গ করার অপরাধে অভিযুক্ত ম্যানেজার (বা অকুপায়ার যদি প্রমাণ দিতে পারেন যে, তিনি নিজে আইন মানবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে ত্রুটি করেন নি, কিন্তু অপর এক ব্যক্তি তাঁর অজ্ঞাতে ও অসম্মতিতে আইন ভঙ্গ ক'রছে, তা হ'লে ম্যানেজারকে বা অকুপায়ারকে খালাস দিয়ে সেই লোকটিকে শাস্তি দেওয়া হবে।

ইনস্পেক্‌টারকে তাঁর আইন-সঙ্গত ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দিলে, তাঁকে কোন রেজেষ্ট্রি বা দলিল দেখতে না দিলে, তাঁর কাছে কোন ব্যক্তিকে (যাকে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে চান) আসতে না দিলে বা ঘিরে রাখলে, দাহ্য জিনিষের কাছে আগুন না আনা সম্বন্ধীয় নিয়ম অগ্রাহ্য ক'রলে, ফ্যাক্টরী আইনের অন্য কোন ধারা বা ফ্যাক্‌টরী আইন

অনুযায়ী প্রাদেশিক নিয়ম না মানলে, ৫ শত[1] টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হ'তে পারে।

আপীল ক'রবার সময় যত দিন না উত্তীর্ণ হয়, অথবা আপীল ফাইল করা হ'লে যত দিন না আপীলের শুনানি শেষ হয়, ততদিন জরিমানা আদায় করা চল্‌বে না।

আইন-ভঙ্গের জন্যে কেহ আহত হ'লে আহত ব্যক্তিকে, আর যদি কারুর প্রাণহানি ঘটে থাকে, তা হ'লে মৃত ব্যক্তির আইন-অনুযায়ী প্রতিনিধিকে, জরিমানার সমস্তটা বা কিছু অংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

যদি কেউ অপর কারুর ডাক্তারি সার্টিফিকেট ব্যবহার করে, বা নিজ সার্টিফিকেট আর কারুকেও ব্যবহার ক'রতে দেয়, তা হ'লে তার কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হ'তে পারে।

যদি কোন শিশু একই দিনে দুইটি ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, তা হ'লে তার পিতা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবক বা যে ব্যক্তি তার উপার্জ্জন হ'তে উপকৃত হয়, তার কুড়ি টাকা অবধি জরিমানা হ'তে পারে। শিশুটি অভিযুক্ত ব্যক্তির অজ্ঞাতে বা তার অসাবধানতা না থাকা সত্ত্বেও ঐরকম ক'রেছে প্রমাণ করতে পার্‌লে জরিমানা হবে না।

বার বার একই অপরাধ করতে থাকলেও একবারের অপরাধের

১। এইটি লক্ষ্য ক'রতে হবে যে, যে সব অপরাধে ৫ শত টাকা অবধি জরিমানা হ'তে পারে, সে গুলোকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা হ'য়েছে; এক শ্রেণীর অপরাধে ম্যানেজার ও অকুপায়ারকে প্রথম দোষী করা হবেই, পরে তাঁরা অপরের ওপর দোষ চাপাতে পারেন। অপর শ্রেণীর অপরাধে যে লোকটিকে ম্যানেজার বা অকুপায়ার বা অন্য কেউ দোষী ব'লে অনুমান করা হবে তাকেই অভিযুক্ত করা হবে।

জন্যে স্থিরীকৃত ঊর্দ্ধতম জরিমানার বেশী আদায় করা হবে না। তবে (ক) যে অপরাধের জন্যে অভিযোগ আনা হ'য়েছে, অভিযুক্ত হবার পর সেই অপরাধ আবার ক'রলে, অথবা (খ) ফ্যাক্টরী আইন বা প্রাদেশিক নিয়মাবলী ভঙ্গ ক'রে কারুকে খাটালে উক্ত নিয়মটি খাটবে না।

যদি কোন ফ্যাক্টরীর কোন অংশে বা ঘরে উৎপাদনের কাজ চল্‌তে থাকে ও শিশুরা নিযুক্ত থাকে, অপর অংশে বা ঘরে ৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিশু উপস্থিত থাকে, তা হ'লে ৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুটিকে 'খাটানো হচ্ছে ব'লে ধরে নেওয়া হবে। যে ব'ল্‌বে তাকে খাটানো হয় নি, তাকেই তা প্রমাণ ক'র্‌তে হবে।

কোন ব্যক্তির বয়স একটি বিশেষ বয়সের নীচে বা ওপরে প্রমাণ ক'রতে পার্‌লে যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আইন-ভঙ্গের অপরাধ হ'তে মুক্ত হ'তে পারে, তা হ'লে সেই ব্যক্তির বয়স একটি বিশেষ বয়সের ওপরে বা নীচে এ কথা প্রমাণ করার ভার অভিযুক্ত ব্যক্তিরই ওপর।

ফ্যাক্টরী আইন ভঙ্গ করার জন্যে ইন্‌স্পেক্‌টারই কেবল মোকদ্দমা আনতে বা আনবার অনুমতি দিতে পারেন (ইন্‌স্পেক্‌টারের ক্ষমতা-হিসাবে এই কথাটি পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করা হ'য়েছে)।

ফ্যাক্টরী আইন ভঙ্গ করার অপরাধের বিচার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটই কেবল ক'রতে পারেন। অত্যন্ত দাহ্য পদার্থের কাছে আগুন নিয়ে যাওয়া বা অপরের সার্টিফিকেট ব্যবহার করা বা অপরকে নিজ সার্টিফিকেট ব্যবহার ক'রতে দেওয়া—এই কয়টি অপরাধ সম্বন্ধে এই নিয়মটি খাটবে না।

অপরাধের ৬ মাসের মধ্যে অভিযোগ না আনলে বিচার চল্‌বে না। কিন্তু ফ্যাক্টরী আরম্ভ করবার সময় নোটিশ না পাঠানোর অপরাধের অভিযোগ ৬ মাস পরেও আনা চল্‌বে।

কয়েকটি অতিরিক্ত নিয়ম

ফ্যাক্‌টরী আইনের কয়েকটি প্রয়োজনীয় নিয়ম এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হয় নি। সেগুলা সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে:—

(১) কোন ফ্যাক্‌টরীর 'অংশকে' একটি বিভিন্ন ফ্যাক্‌টরী ব'লে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা ক'রতে পারেন; (২) সাধারণের সঙ্কটের সময় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে কোন ফ্যাক্‌টরীকে ফ্যাক্‌টরী আইন হ'তে অব্যাহতি দিতে পারেন। (৩) ফ্যাক্‌টরী আইনে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যে ক্ষমতাগুলা দেওয়া হ'য়েছে, সকাউন্সিল বড়লাট সেই ক্ষমতাগুলার ব্যবহার ক'রতে পারেন; (৪) ফ্যাক্‌টরীতে ব্যবহৃত 'অ্যানথ্‌্যাক্স' বীজাণুযুক্ত ('অ্যানথ্‌্যাক্স' জন্তুদের একপ্রকার সাঙ্ঘাতিক রোগ। যে সব জন্তু এই রোগে মরে, তাদের লোম, চর্ম্ম প্রভৃতি নাড়া চাড়া ক'রলেই মানুষের মধ্যে ঐ রোগ সংক্রামিত হ'তে পারে) পশম উত্তমরূপে শোধিত করা সম্বন্ধে সকাউন্সিল বড়লাট নিয়মাবলী প্রস্তুত ক'রতে পারেন; (৫) গবর্ণমেণ্টের অধীন ফ্যাক্‌টরীগুলাও ফ্যাক্‌টরী আইন মানতে বাধ্য; (৬) 'ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী' অথবা 'ফ্যাক্‌টরী আইন অনুযায়ী করা হচ্ছে, এই বিশ্বাসে যদি কেউ কিছু করে, এবং তা যদি 'সমুচিত সাবধানতা ও যত্নের সঙ্গে করা হয়, তা হ'লে উক্ত কৃতকর্ম্মের জন্যে তার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চল্‌বে না। প্রধানতঃ ইন্‌স্পেক্টারদের বাচাবার জন্যে এই নিয়মটি করা হ'য়েছে।

মূলধনের যোগান

ধনসঞ্চয়ের কারণ কি? ধনসঞ্চয় বাড়বার বা কমবার কারণ কি? অনেক ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত বলেন যে, সঞ্চয় করার অর্থই নিজকে ক্লিষ্ট করা—বর্ত্তমানে যে ভোগ সম্ভব হ'ত, সেই ভোগ হ'তে নিজকে বঞ্চিত করা,—সুতরাং সঞ্চয় করা-রূপ ক্লেশ স্বীকার ক'র্‌তে কাউকে সম্মত ক'রতে হ'লে তাকে এঁদের জন্যে 'কিছু' দেওয়া দরকার। এই 'কিছু'টা হচ্ছে 'সুদ'। এঁর মতে সুদই সঞ্চয়ের কারণ; শুধু তাই নয়, সুদই সবের সঞ্চয়ের পরিমাণ নিরূপিত করে, সুদ বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে, সুদ কমলে সঞ্চয় কমে।

সঞ্চিত ধনের সাহায্যে উৎপাদন সম্ভব হয়। ধন যখন উৎপাদনে নিয়োজিত হয়, তখন তাকে মূলধন বা পুঁজি বলা চল্‌তে পারে। ধনসঞ্চয় না হ'লে মূলধন জন্মাতে পারে না। উপরি উক্ত পণ্ডিতদের মতে সুদ ধনসঞ্চয় করায়, ও ধনসঞ্চয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ওদের মতে মূলধনের যোগান সুদের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।

কিন্তু এ মত একেবারে ভ্রান্ত না হ'লেও, অন্ততঃ আংশিকভাবে ভ্রান্ত।

উক্ত পণ্ডিতরা ধ'রে নিয়েছেন যে, ধনকে বর্ত্তমানে ভোগ ক'রে উড়িয়ে দিলেই কেবল ধন হ'তে সুখ পাওয়া যায়—ধন জমিয়ে রাখাতে কোন্‌ সুখ নেই। কিন্তু ধন সঞ্চয় করাতেও ত সুখ থাকতে পারে। একজনের যদি প্রচুর সম্পত্তি থাকে, সেই সম্পত্তি হ'তে তার কোন আর্থিক উপার্জ্জন না থাক্‌লেও কেবল তার সেই সম্পত্তি আছে ব'লেই সে একটা খুব আরাম অনুভব ক'র্‌তে পারে?

ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়ার জন্যেই (কোন সুদ বা সুদজাতীয় কোন আয় না থাকলেও) কয়েকটা সুবিধা ভোগ করা যেতে পারে ঃ— নিজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে, পরমুখাপেক্ষী হ'তে হয় না, অনেক জিনিষ ক্রয় করবার ও অনেককে নিজ অধীনে পরিশ্রম করাবার একটা ক্ষমতা মজুত থাকে ; সমাজে বেশী সম্মান পাওয়া যায়, অনেকের ওপর প্রভুত্ব খাটানো চলে, উক্ত সুবিধাগুলার জন্যেও লোকে ধনসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হ'তে পারে।

ব্যবসার পড়তার সময় বেশী টাকা খাটাবার জন্যে ব্যবসাদার সেই সময়ে বেশী সঞ্চয় করে ; ব্যবসার মন্দার সময়ে সে বেশী টাকা খাটাতে অনিচ্ছুক হয় ব'লে সেই সময়ে তার সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যায়। সুতরাং ব্যবসাদারের ধনসঞ্চয়ের পরিমাণ তার লাভের আশার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু লাভের অর্থ শুধু খাটানো টাকার সুদই ত নয়, সুদ ব্যতীত আরও কয়েকটি জিনিষ, যেমন—ব্যবসাদারের খাটুনির মজুরী, তার বাড়ী ও জমির ভাড়া এবং তার দূরদর্শিতা ও সৌভাগ্যের জন্যে এগুলা ব্যতীত কিছু উপরি পাওনা।

লোকে যখন সন্তান-সন্ততির জন্যে সঞ্চয় করে তখন ত তার সুদ পাওয়া যাবে কিনা, অথবা কি পরিমাণে পাওয়া যাবে, এই কথাই ভাবে না ? তখন টাকা জমিয়ে রাখাই আসল উদ্দেশ্য। টাকা জমানোর জন্যে সুদ পাওয়া যাবে কিনা, অথবা কতটা পাওয়া যাবে, এই হিসাবই প্রধান হ'য়ে মনে দেখা দেয় না ; কিংবা এও বলা চলে যে, এরূপ ক্ষেত্রে সুদ বাড়লে সঞ্চয় না বেড়ে কমে যায় (কারণ তখন অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ রাখলেই সন্তানদের যত আয় পাওয়াতে ইচ্ছা, তা দেওয়া যেতে পারে) এবং সুদ কমলে সঞ্চয় না ক'মে বাড়ে—

অর্থাৎ সুদের সঙ্গে সঞ্চয়ের যে সম্বন্ধ উপরি উক্ত পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন, ঠিক তার বিপরীত সম্বন্ধই এখানে দেখা যায়।

অনেকে বলেন যে, সঞ্চয় একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (ইন্‌ষ্টিঙ্কট্) ব্যতীত কিছু নয়। বনের জন্তুদের মধ্যেও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি দেখা যায়, অসভ্য বর্ব্বর মানুষও সঞ্চয় করে। নিতান্ত সামান্য জিনিষগুলাও অতি সাবধানে ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখবার বা জমিয়ে রাখবার অভ্যাস শিশুদের মধ্যেও দেখা যায়। মেয়েদের সঞ্চয়ের অভ্যাস সর্ব্বজনবিদিত। অনেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেও নানা জিনিষ জমিয়ে রাখবার বাতিক দেখা যায়। সুতরাং সঞ্চয়েব প্রবৃত্তি একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হ'লেও হ'তে পারে,—ধনসঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও তা হ'লে একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ব্যতীত হয়ত আর কিছুই নয়। কথাটার মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাই ব'ল্‌তে পারেন।

সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি 'স্বাভাবিক' হোক বা না হোক, এটা যে অনেক পরিমাণে 'অভ্যাস' হ'তে জন্মায়, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকৃতে পারে না। যারা অল্প বয়সেই নিয়মিতভাবে কিছু কিছু ক'রে টাকা জমাতে অভ্যস্ত হয়, পূর্ণবয়সে তাদের মধ্যেই মিতব্যয়িতা বেশী দেখা যায়। এমনও দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে, একজন জীবনে অনেক বোঝবার পর প্রচুর সম্পত্তি লাভ ক'রেও, প্রথম বয়সের সঞ্চয় ও মিত-ব্যয়িতার অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

অনেক সময়ে বাধ্য হ'য়েও ধনসঞ্চয় ক'রতে হয়, যেমন বীমার প্রিমিয়াম দেবার জন্যে, অথবা সরকারী খাজনা দেবার জন্যে অর্থসঞ্চয়। এখানে সুদের কোনও নামগন্ধও নেই, অথচ (বাহিরের চাপের জন্যে) ধনসঞ্চয় চল্‌তে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লোকে ধনসঞ্চয় করে নানা কারণে।

সুদের প্রভাব তবে কতটুকু? সুদের প্রভাব-হিসাবে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে যে—(১) সমাজে ঋণ লওয়া ও দেওয়ার পরিমাণ সুদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুদ বাড়লে ধার দেওয়া বাড়ে, সুদ কমলে ধার দেওয়া কমে। টাকা সঞ্চয় করা আর টাকা ধার দেওয়া এক কথা নয়—সুদের প্রভাব শেষেরটিরই ওপর (এবং পরে দেখান হচ্ছে—শেষেরটির ওপর প্রভাব আছে ব'লেই প্রথমটির ওপরও কিছু আছে)।

(২) মূলধন বিরাট কলকারখানায় নিয়োজিত হবে, না ছোটখাট শিল্পে নিয়োজিত হবে, তা সুদের দ্বারাই অনেকটা নির্দ্ধারিত হয়। সুদের হার যত কমবে সঞ্চয়কারীরা উৎপাদনের জন্যে ঋণ দিতে ততই অনিচ্ছুক হবে। হয় তারা টাকা জমিয়ে রাখবে, না হয় সেই টাকার সাহায্যে নিজেরাই ছোটখাট শিল্প-কারবার চালাতে প্রবৃত্ত হবে। অপরদিকে, সুদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যে ঋণের চাহিদা কম্‌তে থাকে, মূলধনের স্রোত শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ হ'তে অন্য দিকে চলে যেতে থাকে। শিল্প-বাণিজ্য যতটা বাড়তে পারত ততটা পারে না।

(৩) সুদের হার বাড়লে ঋণের জন্যে দেয় মোট সুদের পরিমাণ বাড়তে থাকে। সেই জন্যে সুদের হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋণশোধ ক'রে দেবার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা (সুতরাং ধনসঞ্চয়ও) বাড়তে থাকে। (ওপরে বলা হ'য়েছে যে, ঋণ দেওয়া ও লওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে ব'লেই ধনসঞ্চয়ের ওপরও গৌণভাবে সুদের একটা প্রভাব দেখা যায়. কিন্তু এখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এখানে সুদ ধনসঞ্চয়ের ওপর নিজের প্রভাব সোজাসুজিই বিস্তার ক'রছে)।

ধনসঞ্চয় নানা কারণে হ'য়ে থাকে বটে, কিন্তু একথাও সত্য যে সুদের হার বাড়লে ঋণে টাকা খাটাবার ইচ্ছা (সুতরাং ধনসঞ্চয়ও) বাড়ে, সুদের হার কম্‌লে ঋণে টাকা খাটাবার ইচ্ছা (সুতরাং ধন-

সঞ্চয়ও) কমে। অতএব অসংখ্য প্রভাব ধনসঞ্চয়ের যোগান নিয়ন্ত্রিত করলেও, সুদ তাদের মধ্যে একটি ব'লে গণ্য হবার যোগ্য।

মূলধনের যোগান ধনসঞ্চয়ের ওপরই নির্ভর করে, একথা পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে। অথচ ধনসঞ্চয়ের যোগান, সুদ এবং অন্যান্য অনেক প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং মূলধনের যোগানও অনেকগুলা প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের মধ্যে সুদ অন্যতম।

ফ্যাকটরী-সঙ্ঘ লাভবান্ হয় কখন ?

তুলা ও পশম শিল্পের অবস্থার উন্নতি ক'রবার জন্যে আজকাল এই দুই শিল্পের ফ্যাক্টরীগুলাকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রবার কথা চারিদিকে শোনা যাচ্ছে। অনেকের মত এই যে, তুলা ও পশমের ফ্যাক্‌টরীগুলাকে সঙ্ঘবদ্ধ করলেই তুলা ও পশমের ব্যবসার উন্নতি দেখা দেবে।

এই মত নিতান্ত ভ্রান্ত। ফ্যাক্‌টরীগুলা বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেই অথবা তাদের আকার ছোট হ'লেই তাদের ক্ষতি ভোগ ক'রতে হবে; আর তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রলেই যে তাদের লাভ হবে, এ কথা মোটেই সত্য নয়। একতাবদ্ধ হ'লে শক্তি বৃদ্ধি হ'তে পারে বটে, কিন্তু যারা একতাবদ্ধ হচ্ছে তারা যদি নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, তাদের যদি আত্ম-নির্ভরের ক্ষমতা না থাকে, তা হ'লে তারা একতাবদ্ধ হ'লেই যে তাদের সমবেত শক্তি বাড়বে, তা সত্য নয়। যে ফ্যাক্‌টরীগুলাকে একতাবদ্ধ করা হবে, সেগুলা যদি অদক্ষ লোকের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের আর্থিক অবস্থা যদি শোচনীয় হয়, তা হ'লে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রলেই তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হবে, এরূপ আশা করা বাতুলতামাত্র। সঙ্ঘবদ্ধ না হ'লেও এবং ছোট আকারের হ'লেও অনেক ফ্যাক্‌রী বেশ লাভে চলছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অপরদিকে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়েও অনেক ফ্যাক্‌টরী লোক্‌সান দিচ্ছে, এরূপ দৃশ্যও বিরল নয়। সুতরাং ফ্যাক্‌টরীগুলার লাভ হচ্ছে না দেখলেই, তাদের দুর-বস্থার মূল কারণগুলা আদৌ অনুসন্ধান না ক'রে, তাদের একত্র হবার অথবা ফ্যাক্‌টরীগুলার আকার আরও বড় ক'রে তোল্‌বার উপদেশ দিলে, নিতান্ত মূঢ়ের মত কাজ করা হবে।

সঙ্ঘবদ্ধতা বা আকার বাড়ানো সকল ক্ষেত্রেই ফ্যাক্‌টরীগুলার উপকারে লাগবে, এই মত ভ্রান্ত বটে; কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতা বা আকার বাড়ানো কখনও কখনও যে ফ্যাক্‌টরীগুলার উপকারে লাগতে পারে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেক শিল্পেই ফ্যাক্‌টরীগুলার এমন একটা আকার আছে, যার চেয়ে ছোট হ'লে লাভ তেমন হয় না, অথবা বড় হ'লেও লাভ কমে যায়। উচ্চতম হারের উপযুক্ত মোটা-মুটি একটা আকার প্রত্যেক শিল্পেই দেখা যাবে। শিল্প অনুসারে এই আকারের তারতম্য হ'তে পারে (অর্থাৎ উচ্চতম লাভ পেতে হ'লে একটি বিশেষ শিল্পের ফ্যাক্‌টরীগুলাকে তা অপেক্ষা অনেক বড় বা ছোট করা আবশ্যক হতে পারে); কিন্তু প্রত্যেক শিল্পেই উচ্চতম লাভের উপযুক্ত ফ্যাক্‌টরীগুলার যে একটি বিশেষ আকার আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি কোন শিল্পে ফ্যাক্‌টরীগুলা উচ্চতম লাভের যোগ্য আকারের চেয়ে ছোট হয়, কেবল তা হ'লেই, ফ্যাক্‌টরীগুলাকে একত্র ক'রলে নানা দিকে লাভের সুযোগ বাড়তে পারে—পরিচাল-নার খরচ কম্‌তে পারে, উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের খরচ এবং কাঁচা মাল কেনবার খরচ কম্‌তে পারে, অন্যান্য অনেক সুবিধাও লাভ হ'তে পারে।

তুলা ও পশমের ফ্যাক্‌টরীগুলাকে একত্র ক'রলেই লাভ বাড়বে কি না, একথা বিবেচনা ক'রবার সময় প্রধানতঃ এইটুকুই ভাবতে হবে যে, উচ্চতম হারে লাভ পেতে হ'লে তুলা ও পশমের ফ্যাক্‌রীগুলার আকার যত বড় হওয়া উচিত, এদের বর্ত্তমানের আকার তত বড় কি না। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না ক'রে হঠাৎ কিছু বলা সম্ভব নয়।

বৈদ্যুতিক রেলওয়ে-বিস্তার অবশ্যম্ভাবী

বাষ্প-চালিত রেলওয়েতে যত খরচ পড়ে, বৈদ্যুতিক রেলওয়েতে তা অপেক্ষা বেশী খরচ পড়ে। কিন্তু বৈদ্যুতিক রেলওয়ের সুবিধা অনেকগুলা :—

(১) বাষ্পীয় শক্তি অপেক্ষা বৈদ্যুতিক শক্তির ওপর বেশী বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করা যায়।

(২) বৈদ্যুতিক শক্তি দমনে রাখা ও ইচ্ছামত চালিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

(৩) কোন স্থানে বেশী প্রয়োজন হ'লে সেই স্থানে শক্তি বেশী সঞ্চয় করা, আবার প্রয়োজন শেষ হ'লে অন্য কোনও স্থানে সরবরাহ করা বৈদ্যুতিক রেলওয়েতেই সম্ভব।

(৪) বৈদ্যুতিক রেলওয়ে নির্ম্মাণে খরচ বেশী পড়ে বটে, কিন্তু বাষ্পের তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কম।

(৫) কোন রেলওয়ের লাইন ও ষ্টেশন না বাড়িয়ে কেবল বিদ্যুতের সাহায্যে ইঞ্জিনগুলা চালান হ'লেই, রেলওয়ের কার্য্যক্ষমতা অন্ততঃ ৩ গুণ বাড়ে।

এপর্য্যন্ত * নিম্নলিখিত দেশগুলাতে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে নির্ম্মিত হ'য়েছে :—নরওয়ে, সুইডেন, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, জাপান, জাভা, কিউবা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, আর্জ্জেন্টিনা ও চিলি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও বৈদ্যুতিক রেলওয়ে চলছে।

---

* ১৯১৮ সন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এখন কেবল সহরতলীর ট্রেণগুলাই বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে বড় বড় রেলপথগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রেল না চল্‌লে উপায় নেই। কারণ, প্রথমতঃ, আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যাত্রী ও মাল-চলাচল দ্বিগুণ হবার সম্ভাবনা। বাষ্পীয় রেলপথকে এর ধাক্কা সামলাতে হ'লে অনেক পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হবে। কিন্তু বৈদ্যুতিক রেলওয়ে প্রবর্ত্তিত হ'লে, বর্ত্তমানে যত লাইন ও ষ্টেশন আছে তাদের সাহায্যেই অনেকগুণ বেশী মাল ও যাত্রী বহা চল্‌বে; দ্বিতীয়তঃ, যাত্রী ও মাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের গতিবেগ আরও বাড়ানো আবশ্যক হবে এবং ট্রেণগুলাকে ৩।৪ গুণ বেশী লম্বা ক'রতে হবে। কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিনের শক্তি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। অথচ ঐরূপ আবশ্যকমত শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত ইঞ্জিন পাওয়া সম্ভব।

আসামের চা শিল্প

ভারতের সর্ব্বপ্রথম চা-বাগান খোলা হয় আসামে। ভারতের অন্যত্র নানা স্থানে (দার্জ্জিলিং, মহীশূর, চট্টগ্রামের ঢালু জমি ইত্যাদিতে) চা উৎপন্ন হ'লেও, সব চেয়ে বেশী পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মা এই দুই নদীর তীরবর্ত্তী আসামের সমতল ভূমিতে।

চীন হ'তে চা আমদানির একচেটে অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং তাতে সন্তুষ্ট না থেকে ভারতে চা পাওয়া যায় কি না, সেই বিষয় অনুসন্ধান ক'রতে থাকে। অনেক বছর ধ'রে অনুসন্ধান চল্‌তে থাকে। তার পর ১৮২৩ সনে আসাম দেশে (তখনও স্বাধীন) ব্রহ্মদেশীয় আক্রমণকারীদের বাধা দেবার জন্য মিঃ ব্রুস নামক জনৈক নেতার অধীনে একদল নৌসেনা পাঠানো হয়। ব্রুস ফিরে আসবার সময় কতকগুলা চা গাছ ও তাহার বীজ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কারের দিকে তখন কেউ নজর দেয় নি। ১৮৩২ সনে ইংরেজরা আসাম জয় করে। এর পর কোম্পানীর মুল্লুকে চা-চাষের প্রতিষ্ঠা করাবার জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। ভারতের বাহির হ'তে বীজ ও দক্ষ শ্রমিক আনবার জন্যে কমিটি কর্ত্তৃক বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। প্রথমে একটি ছোট সরকারী চা-বাগান খোলা হ'য়েছিল। পরে "আসাম কোম্পানী" (শ্রেষ্ঠ চা-কোম্পানীগুলির মধ্যে এখনও প্রধান) এটা কিনে নেয়। প্রথমে আমদানি-করা বীজ নিয়ে বাগান খোলা হ'য়েছিল, কিন্তু পরে আসামী চায়ের উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া গেল।

প্রথমে যখন আসামে চা-বাগানগুলা প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে, তখন পদে পদে অসংখ্য বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছিল। জমি পাওয়া খুবই সহজ ছিল বটে, কিন্তু বাগানের উপযুক্ত জমি খুঁজে বের করা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। জমি খোঁজা হবার পর, বন জঙ্গল ও গাছপালা কেটে স্থানটি পরিষ্কার করাও বড় সহজ কাজ ছিল না। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্যে অসুখেও যথেষ্ট ভুগ্‌তে হ'ত। এর ওপর পার্ব্বত্য জাতিদের উপদ্রবও নেহাৎ নগণ্য ছিল না; ১৮৮০ সন পর্য্যন্ত এদের উপদ্রবে চা-করদের ভুগ্‌তে হয়েছিল।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও বছরের পর বছর নতুন নতুন জমিতে চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। এখন ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মা এই দুই নদীর উপত্যকায় মাইলের পর মাইল কেবল চা-বাগান, আর চা-বাগানগুলার মাঝে মাঝে কুলীদের লাইন, চা-ফ্যাক্‌টরী এবং ম্যানেজার ও তাঁহার সহকারীর বাংলো এইটাই দেখা যায়। যে সব জমি চা-চাষের অনুপযুক্ত সেগুলা কুলীদেরই নামমাত্র খাজানায় দেওয়া হ'য়েছে। অবসর সময়ে তারা এই সব জমিতে নিজ নিজ অভাব পূরণের জন্যে ধান চাষ করে। একটু আধটু বনস্থলীও হয়ত এখানে ওখানে দেখা যায়। এই সব বন হ'তে জালানি কাঠ আর বাড়ী তৈরী ও মেরামতের কাঠ আহরণ করা হ'য়ে থাকে।

আজকাল আসামে যাতায়াতে সুবিধা অসম্ভব রকম বেড়েছে। অনেক দিন হ'তেই দুটি নদী দিয়েই মাল ও যাত্রী বইবার জন্যে সুন্দর সুন্দর ষ্টীমার যাওয়া আসা ক'রত। এখন এই প্রদেশে দুটি রেলপথ স্থাপিত হ'য়েছে। রাস্তার দৈর্ঘ্যও ক্রমাগত বাড়ছে। তবে, রাস্তাগুলার অবস্থা ভাল নয়। অত্যন্ত বারিপাত এবং পাকা রাস্তা তৈরী ক'রবার অসম্ভব রকম বেশী খরচই এর জন্যে দায়ী। মোটরও খুবই

ব্যবহৃত হয়। চা-করদের ও চা-বাগানের ডাক্তারদের নিজ নিজ মোটর আছে। বাগানের জিনিষপত্র আনবার জন্যে এবং রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে চা পৌঁছে দেবার জন্যে, ছোট ছোট মোটর লরী ব্যবহার করা হয়। গ্রাম্য লোকেরা আগেকার কালে পায়ে হেঁটে হাটে যেতো, এখন তাদের এইটুকু উন্নতি হ'য়েছে যে, তারা এক রকম সেকেলে গাড়ীতে চড়ে হাটে যায়।

চা-তৈরীর প্রণালীটা সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে :—

অতি সযত্নে প্রস্তুত নার্শারিতে বীজগুলি পোতা হয়। পরবর্ত্তী বর্ষাকাল পর্য্যন্ত এদের খুব যত্ন নেওয়া হয়। পরে অঙ্কুরগুলি তুলে নিয়ে দু পাশে ঢাল-ওয়ালা খাড়া জমির ওপর নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অন্তরে সারি সারি রোপণ করা হয়। দু বছর পরে চারাগুলি ঝোপে পরিণত হয়। এই ঝোপগুলিকে তখন নির্দ্দয়ভাবে ছেঁটে ফেলা হয়। ঝোপগুলার সারির মাঝের স্থানগুলি অত্যন্ত সাবধানে নিড়িয়ে দেওয়া হয়।

এপ্রিল মাসের প্রথম বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট ঝোপগুলিতে কচি কচি কুঁড়ি ও পাতা দেখা দেয়। এদের অতি সযত্নে হাতে ক'রে তুলতে হয়; এই কুঁড়ি ও পাতাগুলাকেই 'লীফ্' বলা হয়, বাজারে যাকে 'চা' বলা হয়, তা এইগুলা হ'তেই প্রস্তুত। এপ্রিল হ'তে নভেম্বর, ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যেমন কুঁড়ি ও পাতা তোলা চলতে থাকে, তেমন এরা ক্রমাগত উদ্গত হ'তেই থাকে (একে 'ফ্লাশিং' বলে)। সুতরাং এই ক'মাস পাতা সংগ্রহের কাজে কুলীদের অবিশ্রান্ত খাটতে হয়। সাধারণতঃ কুঁড়ি ও তার পার্শ্ববর্ত্তী মাত্র দুটি পাতাই তোলা হয়—এর চেয়ে বেশী পাতা তুললে চা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হবে, এবং চাহিদা অপেক্ষা চায়ের যোগান বেশী হবার ভয়ও আছে।

আগেকার কালের চা-প্রস্তুতের প্রণালীর সঙ্গে আধুনিক প্রণালীর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তবে আগে যে সকল কাজ হাতে হ'ত এখন তার অধিকাংশই কলে হয়।

সংগৃহীত হ'লে পর পাতাগুলা তখনই ঝুড়িতে ক'রে ওজন করা হয় এবং যে যেমন সংগ্রহ ক'রেছে তদনুযায়ী একটা নির্দ্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তার পর পাতাগুলাকে ফ্যাক্টরীতে নিয়ে গিয়ে শুষ্ক ক'রবার জন্যে লম্বা ট্রে বা র‍্যাকে পাত্‌লা ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। নরম হ'লে পর, ঘুর্ণ্যমান ধাতুময় প্লেটের ভেতর ফেলে এদের পেষণ করা হয়। পেষণের ফলে প্রত্যেক পাতার কোষগুলার মুখ খুলে যায় এবং পাতার ভেতরকার রস বের হ'য়ে আসে।

তার পর, পাতাগুলাকে গাঁজাবার জন্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে একটি কলের সাহায্যে এদের ওপর অত্যন্ত গরম হাওয়া প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে পাতাগুলার অগ্রভাগ পাতাগুলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তখন কলের সাহায্যে বিভিন্ন অংশগুলাকে 'পিকো', 'অরেঞ্জ পিকো' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ ক'রে ফেলা হয়। তার পর আবার উত্তাপ দেওয়া হ'লে গরম অবস্থাতেই সীসা-দিয়ে ভেতর-মোড়া বাক্‌সে সাবধানে প্যাক করা হয়। চা প্রস্তুত ক'রবার আধুনিক প্রণালী এই রকম।

পরবর্ত্তী কাজ হচ্ছে কল্‌কাতা বা লণ্ডনের বাজারে মাল পাঠানো। বেশীর ভাগ চা-ই দুটি নদীর কোনটি দিয়ে মালবাহী ষ্টীমারে চ'ড়ে কল্‌কাতায় যায়। কিছু অংশ ট্রেণে চট্টগ্রামে গিয়ে সেখানে লণ্ডনের জাহাজে ওঠে।

শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'ফ্লাশিং' বন্ধ হয়। ফ্যাক্‌টরীও তখন বন্ধ হয়। এই সময়ে ফ্যাক্‌টরীতে যা কিছু মেরামত করা আবশ্যক তা করা হয়। আগাছা ধ্বংস ক'রবার জন্যে বাগান নিড়ানোর কাজও

চল্‌তে থাকে। পুরাণো ঝোপগুলিকে বেশী ক'রে ছেঁটে ফেলা হয়। যে সব পোকা মাকড় ঝোপের প্রধান শত্রু, সেগুলার ধ্বংসের জন্যেও রীতিমত চেষ্টা চল্‌তে থাকে। বাগান বাড়ানো দরকার হ'লে নতুন নার্শারি তৈরী করা হয়। দরকার হ'লে, ড্রেন খোঁড়াও চল্‌তে থাকে। কুলীদের বাড়ীগুলা মেরামত করা আর তাদের বাড়ীর চালগুলা নতুন ক'রে ছাওয়া হয়। সুতরাং শীতকালেও চা-বাগানে কাজের অভাব থাকে না, তবে চা-উৎপাদনের সময়ের মত কাজের তাড়া থাকে না, ধীরে-সুস্থে কাজ চল্‌তে থাকে। যে সব কুলী ছুটি চায় তারা এই সময়ে সহজেই ছুটি পেতে পারে।

কুলী সংগ্রহের কাজও এই সময়ে আরম্ভ হয়। বাগান ও ফ্যাক্‌টরী চালাবার জন্যে একটি বৃহৎ ও স্থায়ী কুলীর দল না হ'লে চলে না। কুলীর দল সংগ্রহ করা ও তাদের বজায় রাখার জন্যেই চা-করদের সব চেয়ে বেশী ঝঞ্ঝাট সহ্য ক'রতে হয়।

আসামে কোন কুলী পাওয়া যায় না। আসামের প্রায় প্রত্যেক বাসিন্দারই ছোট একটুকরা জমি আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই জমি সোজাসুজি গবর্মেণ্টের কাছ হ'তে অতি অল্প খাজানায় নেওয়া হয়। জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা ব'লে বছরের একবারের শস্যই আসামীদের সামান্য অভাব মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। ঘর তৈরীর জন্যে কাঠ ও বাঁশ গবর্মেণ্টের বন হ'তে আসামীরা বিনা খরচায় ইচ্ছামত সংগ্রহ ক'রে থাকে। এই সব কারণে, চা-বাগানের নিয়মিত পরিশ্রম আসামীদের পক্ষে লোভনীয় নয়। আবার ইচ্ছা থাকলেও চা-বাগানের কাজে যোগ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ, যে সময়ে তাদের ধানের ক্ষেতে বেশী মন দিতে হয়, সেই সময়েই চা-বাগানে কুলীর বেশী দরকার। অপর দিকে বড় বড় চা-বাগানের কাজ এত নিয়মে বাঁধা যে স্থায়ী কুলী না থাকলে তাদের

কাজ চালান অসম্ভব। তবে, শীতকালে খুচরা কাজের জন্যে বেশী কুলী দরকার হয়, অনেক আসামীরাও এই সব কাজ ক'রে কিছু রোজগার ক'রে থাকে।

কুলীদের সকলকেই মাইনে দেওয়া হয়। টাকার হিসাবে তাদের মাইনে কম বটে, কিন্তু মাইনে ছাড়াও তারা নানা বিষয়ে চা-করদের কাছে সাংসারিক সাহায্য পায়। ঘরের জন্যে তাদের কোন ভাড়া দিতে হয় না। অসুখ হ'লে ডাক্তারের ফি দিতে হয় না, বাজারে চালের দর বাড়লে বাগানের ভাঁড়ার হ'তে তারা একটা নির্দ্দিষ্ট দামে চাল কিনতে পায়। অনেক পুরাণো কুলী বাগানের টুকরা টুকরা জমি নিয়ে চাষী হ'য়ে উঠেছে, অনেকে গবর্ণমেণ্টের কাছে জমি নিয়ে স্বাধীন চাষীও হ'য়েছে। এদের মধ্যে অনেকে বাগানের সঙ্গে সম্পর্কও কিছু বজায় রাখে—অল্পদিনের জন্যে বেশী কুলী দরকার হ'লে এরা নিজ নিজ পরিবারের লোকদের বাগানে খাটবার জন্যে পাঠায়।

সাময়িক দুঃসময়ের জন্যে আসামের চা-শিল্পকে মাঝে মাঝে ভুগতে হ'য়েছে বটে; কিন্তু তা হ'লেও কোন সাময়িক দুঃসময়ই এই শিল্পের একটানা উন্নতির গতিরোধ করতে পারে নাই। বর্ত্তমানে এই শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

আসাম প্রদেশের যা কিছু আধুনিক উন্নতি ঘটেছে, তা এই চা-শিল্পেরই দৌলতে।

আসামী চা-শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয় ইংরেজের চেষ্টায় ও ইংরেজের অর্থে। কয়েক বছর হ'ল ভারতীয় মূলধনও চা-বাগানে খাটানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ বেশ বেড়েও উঠেছে।

—————

বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ *

পঞ্চম অধিবেশন। স্থান—৯৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। সময়—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯, রবিবার, সকাল ১০টা।

উপস্থিত:—স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমতী সুষমা দাশগুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্যেরা।

আলোচনার বিষয় ছিল "কয়লার খনির মজুর"। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরিষদের কার্য্যাবলী দেখ্‌তে ও সভ্যদের উৎসাহিত কর্‌তে উপস্থিত হ'য়েছিলেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার (গবেষণাধ্যক্ষ) সভার কার্য্য আরম্ভ কর্‌বার সময়, বলেন, "ভারতগৌরব স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ একজন প্রতিভাশালী দার্শনিক। বড় বড় দার্শনিকদের দস্তুর এই যে, তাঁরা ছোট খাটো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকেও খুব উঁচু আদর্শের মাপকাঠিতে যাচাই করে থাকেন। একটা মস্ত বড় লক্ষ্য চোখের সম্মুখে রেখে আটপৌরে নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলাকেও তাঁরা গ'ড়ে তুল্‌তে চান। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম দুরূহ ও উচ্চতম লক্ষ্যের পশ্চাতে তাঁর চিন্তা চালিয়েছেন। এই সূত্রে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর পাণ্ডিত্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়ছে। সাইরাকিউজের রাজা এ পণ্ডিতপ্রবরকে গুরুপদে বরণ ক'রে রাজ্য চালাতে চেয়েছিলেন। প্লেটোর

* এই রিপোর্টটি শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে এম এ, বি এল কর্ত্তৃক লেখা।

মতে আদর্শ রাজা হ'তে হ'লে আগে হওয়া চাই দার্শনিক। আর দার্শনিক হ'তে হ'লে আগে হওয়া চাই অঙ্কে পণ্ডিত। আর অঙ্কের গোড়া হ'ল জ্যামিতি। কাজেই রাজা-উজির সকলকেই প্লেটো জ্যামিতি শেখাতে স্বরু করেন। রাজ দরবার অঙ্কের টোলে পরিণত হয়! ফলাফল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

প্লেটো যেমন গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে রাজ্যশাসন ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলেন, স্যর ব্রজেন্দ্রনাথও সেই রকম এমন সব উচ্চাঙ্গের কথা বল্‌তে পারেন, যা কার্য্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই তাঁর কথা শুনে এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের কারও যে ঘাব্‌ড়াবার দরকার নেই, তা পূর্ব্ব হ'তে জেনে রাখাই ভাল।

বিশেষতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ ছেলে-ছোকরা, নবীন-প্রবীণ সকলের সঙ্গেই সমানে সমানে তর্কাতর্কিতে যোগ দিতে অভ্যস্ত। যৌবন-নিষ্ঠায় ডক্টর শীল অদ্বিতীয়। তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি কর্‌বার জন্যে আমি এখানকার সকলকেই উৎসাহিত কর্‌ছি। ডক্টর শীলের নাম মাত্র যাঁদের শুনা আছে, তাঁদের কাহারও তাঁকে নিজ দলের ভেতর পেয়ে ভয়ে জড়সড় হবার দরকার নেই।"

ধনবিজ্ঞান-পরিষদের উদ্দেশ্য

ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার বলেন, "এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করাই পরিষদের উদ্দেশ্য নয়। যারা অন্ততঃ এম এ, বি এল পাশ করেছে, তারা যাতে কম পক্ষে ৫ বৎসর ধ'রে ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে পড়াশুনা চালাতে পারে ও পরস্পরের সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদান কর্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা করাই পরি-

ষদের উদ্দেশ্য। প্রত্যেকে ধনবিজ্ঞানের সকল বিভাগে অধিকারী হ'লে পরে কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার সময় আস্‌বে।

কোন একটামাত্র সমস্যাকে অথবা লক্ষ্যকে কেন্দ্র ক'রে পরিষদ্‌ খাড়া করা হয় নি। খোলা মনে হাজারো প্রশ্ন, হাজারো সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে হবে। সেই জন্যে কোন প্রকার কর্ম্ম-বিভাগ বা কার্য্য-বিশেষজ্ঞ বেছে দেওয়া হয় নি। যার যে বিষয়ে বা যতগুলি বিষয়ে খুসী গবেষণা চালাবার অধিকার র'য়েছে। পরিষদ একটা স্কুল—"সেমিনারী" বিশেষ, এখানে সবাই যথাসাধ্য লেখাপড়া কর্‌তে ও শিখ্‌তে এসেছে। সুতরাং এখানে "সামাজিক হাইজীন" বা সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্য-রক্ষা হ'তে খাজনার অঙ্কশাস্ত্র-ঘটিত তত্ত্ব কোনটার আলোচনা বা গবেষণাই বাদ পড়ে না। প্রত্যেকে রোজ রোজ যা কিছু লেখাপড়া করে, তাই একত্রে পরে আলোচিত হয়।"

কয়লার খনির মজুর

স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ কর্‌লে পরিষদের অন্যতম গবেষক শ্রীযুত শিবচন্দ্র দত্ত এম এ, বি এল "ভারতীয় কয়লার খনির মজুর" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত খনি-সংক্রান্ত নানাবিধ বিবরণী এবং সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের খনি-মজুর-বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ ক'রে ইনি অনেক প্রকার তথ্য সংগ্রহ ক'রেছেন ও সম্প্রতি মানভুম জেলার অন্তর্গত কয়েকটি কয়লার খনি পরিদর্শন ক'রে বহুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। আলোচ্য বিষয় অনুধাবন কর্‌তে ইনি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার খনিগুলিতে অধিকাংশ স্থলে, "ফুরণ'

অর্থাৎ পরিমাণ চুক্তিমত কাজ কর্‌বার প্রথা প্রচলিত থাকায় শ্রমিক-বর্গের বিশেষ অনিষ্ট হচ্ছে। এই প্রথার ফলে অনিয়মিত পরিশ্রম করার জন্যে কুলীদিগের স্বাস্থ্যহানি হ'য়ে থাকে, এবং সমধিক পরিশ্রম ক'রে অধিকতর উপার্জ্জন ক'রবার চেষ্টায় নানাবিধ আকস্মিক বিপর্য্যয় ঘটে থাকে। এর পরিবর্ত্তে মাসিক মাইনের সর্ত্তে কাজ ক'রলে উভয়-প্রকার অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা ক'মে যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে ইনি বলেন যে, গড়পড়তা হিসাবে ভারতীয় কুলী জাপানী শ্রমিক হ'তে অধিকতর পরিমাণ কয়লা কেটে থাকে। কিন্তু বৎসরকালের মধ্যেই চাষ-আবাদের জন্যে একাধিকবার স্থান ত্যাগ করে ব'লে খনিগুলির কাজ সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে না। তা ছাড়া "ফুরণ" মত কাজ কর্‌-বার জন্যে সামান্য সুবিধা পেলেই কুলীরা এক খনি হ'তে অন্য খনিতে কাজ নেবার চেষ্টা ক'রে থাকে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় তাঁর আলোচনার প্রধান বস্তু :—

(১) সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের ও ঝরিয়ার নানা শ্রেণীর কয়লার খনির মজুরের সংখ্যা। (২) মজুরদের কোন্ কোন্ স্থান হ'তে আনা হয়? (৩) বৎসরে তিনবার ক'রে তাদের যোগানের নিয়মিত হ্রাস। (৪) তাদের স্থায়ী মজুরে পরিণত কর্‌বার উপায়। (৫) তাদের জোগাড় কর্‌বার প্রণালী। (৬) সকল শ্রেণীর মজুরদের মাইনের হার। (৭) ফুরণে মাইনে দেওয়ার কুফল—দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি। (৮) মজুর-দের মাসিক রোজগার। (৯) অন্যান্য দেশীয় কয়লার খনির মজুরের পটুতার তুলনায় ভারতীয় মজুরের পটুতা। (১০) ভারতীয় মজুরের পটুতা কম হবার কারণ, ইত্যাদি।

শিববাবু কতকগুলি কয়লার খনি প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন কর্‌বার জন্যে প্রেরিত হন। তার পর সরকারী ও অন্যান্য রিপোর্ট ইতাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ-

রূপে ঘাঁটাঘাঁটি করেন। তার ফলে এই রচনা। এটা তাঁর এ বিষয়ে গবেষণার সমস্ত ফল নয়, আংশিক ফল মাত্র। খনিতে কত প্রকারের মজুর কাজ করছে, তাদের মজুরীর হার, কার্য্যকারিতা, আবাসস্থানের ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়ার কথা, স্বভাবচরিত্রের কথা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইনি আলোচনা করেন।

"এফিসিয়েন্সি" (কর্ম্মদক্ষতা) কাকে বলে?

ডক্টর শীল বক্তার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অতি সুচিন্তিত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "এফিসিয়েন্সি" জিনিষটা ভাল ক'রে বুঝতে হবে। শুধু মাত্র কাজের পরিমাণ দ্বারা এফিসিয়েন্সির বিচার করা উচিত নয়। মজুরের শ্রেণীভেদ (যেমন কুশলী ও অকুশলী), যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও মজুরের সঙ্গে এফিসিয়েন্সির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ র'য়েছে। প্রত্যেকটার পরিমাণও যাচাই ক'রে দেখ্‌বার দরকার আছে।

এফিসিয়েন্সি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, মোট কতজন লোক কাজ কর্‌ছে আর কতখানি উৎপাদিত হচ্ছে শুধু এর দ্বারা কখনও এফিসিয়েন্সি নির্ণীত হ'তে পারে না। এফিসিয়েন্সির অর্থ নিম্নলিখিত দফাগুলির প্রকৃত বিশ্লেষণ।

(১) মজুরের ব্যক্তিগত গুণাবলী, যেমন তার গায়ের জোর ইত্যাদি,

(২) যন্ত্র ও কলের ব্যবহার,

(৩) স্থান—কৃষি (উর্ব্বরা শক্তি ইত্যাদি), খনিজ পদার্থ আছে কিনা,

(৪) স্বাস্থ্য,

(৫) খাদ্য।

সুতরাং আমরা যখন আমাদের দেশের মজুরদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের

মজুরদের তুলনা ক'রে বলি যে, এরা কম এফিসিয়েণ্ট (কর্ম্মদক্ষ), তখন কিছুই বলা হয় না। প্রথমতঃ জানতে হবে, উপরি উক্ত দফাগুলির কোন্‌টা কি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। বস্তুতঃ, শক্তির ব্যবহার, তা যে কোন আকারেই হোক না, অর্থশাস্ত্রীর পক্ষে বিশেষ গবেষণার বিষয় বটে। তারপর কারিগর বা মজুরদের যথাযথ প্রণালীতে শ্রেণীবিভাগ করা চাই। নইলে তাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার সাধারণ সিদ্ধান্ত খাড়া কর্‌লে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে।

ভারতীয় মজুরের বিচরণশীলতা

ডক্টর শীল বলেন যে, ভারতীয় মজুরেরা স্থান হ'তে স্থানান্তরে বিচরণ করে, তাদের এই স্বভাবের কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না। বিচরণশীলতাকে বন্ধ কর্‌তে হবে। কারণ এটা এফিসিয়েন্সির পরিপন্থী। মজুরকে পরিবারসহ স্থিরভাবে বসিয়ে দেওয়া একটা মস্ত সমস্যা। তিনি মনে করেন, এ বিষয়ে আসাম ও মহীশূরের চা-বাগানসমূহে যে প্রচেষ্টা চল্‌ছে তা ঠিক পথে চালিত হচ্ছে। মজুরেরা যাতে পরিবারবদ্ধ হ'য়ে বাস করে, তার জন্যে নানাপ্রকার আয়োজন করা হ'য়েছে। এ বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর ও কলকারখানাপ্রধান পশ্চিম দেশের সঙ্গে আমাদের তুলনা কর্‌লে চল্‌বে না। এখানে মজুরদের জন্যে কিছু নিজস্ব জমির বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া চাই। তবেই তারা ঘর বাঁধতে পারবে ও পরিবার প্রতিপালনে মনোযোগ দেবে। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেন এই সম্পর্কে বলেন যে, ঢাকার সূক্ষ্ম তাঁতীরা প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান।

স্ত্রী-মজুর অনিষ্টকর নহে

ডক্টর শীল আরও বলেন যে, অর্থশাস্ত্রীকে তার নিজ বিচারবুদ্ধি

যথাযথভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবহার কর্‌তে শিখ্‌তে হবে। সমাজ-হিতৈষিগণ স্ত্রী-মজুর উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু স্ত্রী-মজুর উঠিয়ে দিলে ইষ্টের চেয়ে ঢের বেশী অনিষ্ট হবে।

পারিবারিক জীবন এফিসিয়েন্সি বাড়ায়

এখানে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত মহাশয় বল্‌লেন যে, স্ত্রী-মজুর থাকায় তাদের দৈনিক কর্ত্তব্য-পালনে বাধা পড়ে। তা ছাড়া তারা স'রে গেলে পুরুষদের মজুরি বাড়তে পারে।

উত্তরে ডক্টর শীল বলেন যে, অবশ্যই স্ত্রীলোকদের কাজ করবার সময় সম্বন্ধে ও মাতৃমঙ্গল আদি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই যদি কাজ করে, তবে দৈনিক কর্ত্তব্য বাধা পায় না। পরন্তু, একটা স্বাস্থ্যকর পারিবারিক জীবন গ'ড়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী-মজুর স'রে যাবামাত্র পুরুষদের মজুরি বেড়ে যাবে না, মজুরি বাড়তে অনেক সময় লাগে। ইতিমধ্যে অন্য মজুরেরা এসে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর্‌বে। তাঁর মতে সম্ভব হ'লেই এই পারিবারিক জীবনের আবহাওয়া সৃষ্টি কর্‌তে হবে। তাতে এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে।

মজুরেরা কেন বিচরণশীল?

মজুরদের বিচরণশীল চরিত্রের অবশ্য কতকগুলি কারণ আছে। ডক্টর শীলের মতে কয়েকটি কারণ এইরূপ :—

(১) মজুরেরা চাষবাস দ্বারা তাদের আয় বাড়িয়ে নিতে চায়, (২) খনির নীচে সর্ব্বদা কাজ করা অস্বাস্থ্যকর, (৩) বাড়ীঘরের অবস্থা

ভাল নয়, (৪) স্বামিত্ব বা অধিকারিত্ব নাই; ছোট এক টুকরা জমি হোক বা বাগান হোক তার স্বামিত্বের আনন্দ লোকচরিত্র-গঠনের পক্ষে খুব কার্য্যকর।

মজুরি নির্ণয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চাই

ডক্টর শীল বলেন যে, প্রকৃত ও নামতঃ মজুরির মধ্যে ভেদরেখা টান্‌তে হবে বটে। কিন্তু এ বিষয়েও শুধুমাত্র সমাজ-হিতৈষণার ওপর ভর কর্‌লে চল্‌বে না, রাষ্ট্রেও হস্তক্ষেপ করা চাই। সর্ব্বনিম্ন মজুরির সীমা রাষ্ট্র বেঁধে দেবে। যে সব সুখ-সুবিধা মজুররা ভোগ কর্‌তে সমর্থ হবে, তাও আইনতঃ নির্ণীত হওয়া দরকার। খরচার কিছুটা মজুরেরা, কিছুটা খনির মালিকরা, আর কিছুটা রাষ্ট্র দেবে। বীমা (ব্যাধি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি, বিসমার্কের সামাজিক আইন-কানুন কর্ত্তব্য), স্থান ও কালের অবস্থা নির্ণয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হবে। মজুরের কার্য্যে একটা শৃঙ্খলা ও নিয়ম আন্‌তে হবে।

ঘরে ও বাহিরে লড়াই

উপসংহারে ডক্টর শীল বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক গোলমালের মধ্যে আমাদের জড়িয়ে পড়লে চল্‌বে না। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলা অনেক অগ্রসর হ'য়ে গেছে। তাদের আদর্শ আমাদের পূরাপূরি গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। সে জন্যে আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলার বিধি আমাদের সর্ব্বদা শিরোধার্য্য ক'রে নেবার উপায় নেই। অন্য দিকে দেশের মধ্যে মজুরের স্বাস্থ্য ও দেহ-রক্ষার জন্যে যা কিছু দরকার, তা দেবার জন্যে লড়াই করতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, কত রকমের কয়লা আছে ও কোন্ কোন্ রকম কয়লার কি প্রকার টান, তা গবেষণা ক'রে দেখা দরকার। ভারতীয় কয়লার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, অথচ ভারতীয় কয়লা কেন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করছে না, তা ভেবে দেখ্‌বার কথা। বাজারে ভারতীয় কয়লা কেন স্থান পাচ্ছে না, তার অনুসন্ধান হওয়া চাই।

র‍্যাশন্যালিজেশ্যন

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন যে, তার জন্যে দায়ী আমাদের অপচয়-কারী প্রণালী। কিন্তু ডক্টর শীল মনে করেন না যে, যুক্তি-প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে। অধ্যাপক সরকার বলেন যে, র‍্যাশন্যালি-জেশ্যন আরম্ভ হ'য়ে গেছে। শিববাবুর বক্তৃতার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন যে, আমরা দেখ্‌তে পেয়েছি যে, কয়লার কারবারে ভারতবর্ষেও জোট-বাঁধা, দল-বাঁধা, সঙ্ঘ-গঠন অর্থাৎ ট্রাষ্ট বা কার্টেল জাতীয় প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়েছে।

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ফুরণে মাইনে দেওয়ার নিন্দা করেন। মজুরদের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করার আবশ্যকতার দিকে সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাভঙ্গ কর্‌বার সময় অধ্যাপক বিনয়কুমার বলেন যে, কয়লা ভোগ (কন্‌জাম্পশ্যন্) ও কয়লার খনির মজুরের সংখ্যা—আধুনিক সভ্যতায় কোন্ দেশ কতদূর অগ্রসর, তা জান্‌বার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। এই মাপকাঠি প্রয়োগ কর্‌লে ভারত যে অনেক দেশেরই পশ্চাতে, তা সহজেই বোঝা যায়।

ডক্টর শীল বল্লেন যে, যেহেতু কয়লার যুগ অবসানের মুখে এসেছে

সেই জন্যে কয়লাকে মান ধরা উচিত হবে না। অধ্যাপক সরকার বল্‌লেন যে, মান অবশ্য একটা নয়, হাজারো মান র'য়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে কয়লা একটি। আমাদের অবস্থাটা এই বল্‌লেই পরিষ্কার হবে যে, ভারতের লোক-সংখ্যা গ্রেটবৃটেনের প্রায় ৭ গুণ হ'লেও আমাদের দেশের সমস্ত মজুর একত্রে—গ্রেটবৃটেনের কয়লার মজুর। আর আমাদের দেশে কয়লা খরচ হয় মাথা প্রতি গ্রেটবৃটেনের ৪½ ভাগ মাত্র।

কয়লার খনির মজুর *

কয়লার খনিতে নানা শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ মজুর কাজ ক'রে থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর মজুরের সংখ্যা কত তা নীচে দেওয়া গেল; ঝরিয়ার মজুরের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বৃটিশ ভারতের (কয়লার খনির) মজুরদেরও সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে,—

সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে,—	বৃটিশ ভারত	ঝরিয়া
যারা খাদের ভিতর কাজ করে—পুরুষ :—		
ওভারম্যান ও সর্দ্দার	২৯০১	১৩৮৯
মালকাটা	৩৬,৯৫২	১৬,৫৬২
বোঝাইকারী (লোডার)	৮,২১২	২৯৪৩
অন্যান্য দক্ষ শ্রমিক	৮,৭৬২	৩৯৫৪
অন্যান্য অদক্ষ (আন্‌স্কিল্‌ড্‌) শ্রমিক	১২,৪৮৮	৫,১৮২
নারী	২৮,০৪১	১৫,৪৪৯
যারা পুকুরখাদে কাজ করে—পুরুষ :—		
ওভারম্যান ও সর্দ্দার	১৫৫	৪২
মালকাটা	৪,৮৩৪	৫১৮
বোঝাইকারী	১,৭৪৮	১০৪
অন্যান্য দক্ষ (স্কিল্‌ড্‌) শ্রমিক	৪৬৮	৪৬
অন্যান্য অদক্ষ (আন্‌স্কিল্‌ড্‌) শ্রমিক	৩,৬০২	১৬০
নারী	৫,৯০০	৪৯৯

---

* কয়লার খনি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষক বর্ত্তমান গ্রন্থকারকে ধানবাদে পাঠানো হয়েছিল। তদুপলক্ষে সংগৃহীত তথ্য এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হ'য়েছে।

যারা খাদের উপর কাজ করে—পুরুষ :—

কেরাণী ও কর্ত্তৃত্বের ভার-প্রাপ্ত	৪,৪০১	২,০০৯
দক্ষ (স্কিল্ড্) শ্রমিক	১০,৮২৬	৫,২৭০
অদক্ষ (আনস্কিল্ড্) শ্রমিক	২২,৪২১	১১,১৪৯
নারী	১৩,৬০২	৬,৯৬৪
মোট	১৬৫,২১৩	৭২,২৪০

মজুরের যোগান

ঝরিয়া ক্ষেত্র মানভুম জেলার মধ্যে। ঝরিয়ার সীমানা ধানবাদ মহকুমার প্রায় সমান। এই ক্ষেত্রের অনেকগুলা মজুর পুরুলিয়া, টুণ্ডা প্রভৃতি মানভূম জেলার অন্তর্বর্ত্তী নানা স্থান থেকেই সংগৃহীত হ'য়ে থাকে। বাকী মজুর হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলা থেকে আনা হয়। মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ থেকেও মজুর সংগ্রহ করা হয়। মালকাটা (যারা গাঁথির সাহায্যে কয়লা কেটে থাকে) ও খাদের বোঝাইকারী (আণ্ডারগ্রাউণ্ড লোডার—এর কাজ হচ্ছে মালকাটার কাটা কয়লা ঝুড়িতে তু'লে কিছু দূরে যে টবগাড়ী আছে তাতে ফেলা) ছাড়া অন্য শ্রেণীর মজুর খনিগুলার কাছে কাছেই পাওয়া যায়।

আগে প্রতি বছরেই শোনা যেত যে, আবশ্যক মত মজুর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অনেকগুলা খনি বন্ধ হওয়াতে এখন চাহিদার তুলনায় যোগান বেড়েছে। অনেক স্থলেই এখন * আর গাঁয়ে গিয়ে মজুর সংগ্রহ করতে হয় না। কোলিয়ারীতে বসেই পাওয়া যায়।

* প্রবন্ধটি ১৩৩৫ সালে লেখা।

বছরের সমস্ত সময়টাই মালকাটার যোগান সমান থাকে না। বছরে তিনবার ক'রে মালকাটার যোগান ক'মে যায়। মার্চ্চ, এপ্রিল মাসে মজুরদের বিয়ে থা হয়—সেই জন্যে এই সময়ে কতগুলা মালকাটা বাড়ী যায়। মালকাটাদের অনেকেই কৃষিজীবী। জুলাই, আগষ্ট মাসে (যখন ধান রোপণ করা হয়) একবার এবং অক্টোবরের মাঝ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত (যখন ধানকাটা হয়) আর একবার একটা মোটা দল (শতকরা ৬০।৭০ ভাগ) দেশে চ'লে যায়। চাষের কাজ শেষ হ'লে আবার ফিরে আসে।

মালকাটারা যাতে কয়লা কাটাকেই তাদের স্থায়ী ও একমাত্র পেশা ক'রে নেয়, এর জন্যে কয়লার খনিওয়ালাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হ'য়েছে—কাজে বিশেষ কিছু হয় নি। শ্রীযুক্ত ট্রেহার্ণ রীজ (কয়লার অপচয় নিবারণ করবার উপায় বাৎলাবার জন্যে ১৯২০ সনে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হ'য়েছিলেন) এই উদ্দেশ্যে কতকগুলা প্রস্তাব ক'রেছিলেন—(১) যেখানেই দুর্ভিক্ষ হবে, সে স্থানের জনকয়েককে এনে দেখানো যে কয়লার খনিতে কেমন মাইনে পাওয়া যায়; (২) খনিতে স্থায়িভাবে থাকতে যাতে মজুরদের ভাল লাগে, তার জন্যে তাদের ভাল বাড়ীতে থাকতে দেওয়া এবং খনির পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি করা; (৩) মজুরদের বাড়ীর কাছে চাষের জন্য টুক্‌রা টুক্‌রা জমি দেওয়া; (৪) খনিগুলার খানিক দূরে গ্রামের মধ্যে মজুর উপনিবেশ গ'ড়ে তোলা। দ্বিতীয় উপায়টি বিশেষ কার্য্যকর হ'তে পারতো, তৃতীয়টিও হ'তে পারতো যদি চাষের জন্যে জমি না দিয়ে বাগান করবার জন্যে জমি দেওয়া হতো; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উপায়ই তেমন দৃঢ়তার সঙ্গে কাজে লাগানো হয় নি।

মালকাটাদের মধ্যে অন্ততঃ একটা ভাগ (শতকরা খুব সামান্য হ'লেও) কয়লার খনির কাজই তাদের একমাত্র পেশা ক'রে নিয়েছে।

মজুর-সংগ্রহ

মালকাটা সংগ্রহ ক'র্‌বার জন্যে কয়লার খনিওয়ালারা একজোট হ'য়ে কোন বন্দোবস্ত করেন নি। এতে মালকাটাদের সমূহ লাভ। এক জায়গায় কাজ হারালে আর এক জায়গায় সহজেই কাজ পাওয়া যায়।

মালকাটা সংগ্রহ করা হয় নিকটের বা দূরের গাঁ থেকে। তার জন্যে সর্দ্দার বা রেক্রুটিং কন্ট্রাক্টার নিযুক্ত করা হয়। এরা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে কমিশন পেয়ে থাকে।

যে সব মালকাটা কাজ ক'রতে রাজী হয়, তাদের দলে দলে খনিতে পাঠানো হয়। প্রত্যেক মালকাটাকে পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা (এই টাকাটা মালকাটা এবং তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী বোঝাইকারী উভয়ের জন্যেই) অবধি দেওয়া হয়। মালকাটার রোজগার থেকে পরে এই টাকাটা কেটে নেওয়া হয়। আসবার গাড়ী ভাড়া ও পথের খাই-খরচা খনিওয়ালাই ব'য়ে থাকে।

কতকগুলা মালকাটা আছে যারা কেবল এমন খনিতে কাজ করে যেখানে মেঝের কয়লা খুঁড়তে পারা যায় বা যেখানে গ্যালারী খুব স্বাস্থ্যকর। অনেক সময়ে এই ভ্রাম্যমান দল থেকে মালকাটা যোগাড় করা হ'য়ে থাকে।

মালকাটা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মজুর সাধারণতঃ কোলিয়ারীতে বসেই পাওয়া যায়।

স্বভাব-চরিত্র

ভুঁইয়া আর সাঁওতালিরাই সর্ব্বাপেক্ষা চালাক। সাঁওতালরা সব-চেয়ে সুস্থ সবল ও সবচেয়ে বেশী শাসন মানে। মালকাটাদের বেশীর

ভাগই ভুঁইয়া, সাঁওতাল, কোরা, কোল ইত্যাদি অর্দ্ধসভ্য জাতির অন্তর্গত।

বিলাসপুরীরা (মধ্যপ্রদেশ হ'তে আগত) ব্লাষ্টিংএ বিশেষ পটু, মদ খুব কম খায় এবং যথেষ্ট সঞ্চয়ী।

কলকব্জা যন্ত্রপাতির কাজে আজকাল পূর্ব্ব বাঙ্গলার মুসলমানদের আধিপত্য দেখা যাচ্ছে।

মজুরদের মধ্যে কুড়েমি ও কাজে অনিচ্ছা অত্যন্ত বেশী; এর কারণ :—(ক) অত্যন্ত বেশী কাজের চাপ ; (খ) মূর্খ ব'লে নিজেদের কাজে কোনও আনন্দ আহরণ করবার ক্ষমতার অভাব ; (গ) উপার্জ্জনের অল্পতা।

সাঁওতালদের বাদ দিলে সব মজুরই অত্যন্ত অপরিষ্কার ; অপরিষ্কার হবার নানা কারণ, যেমন—(ক) শিক্ষার অভাব, (খ) উপযুক্ত থাকার ঘরের অভাব ; (গ) নারীরা—যারা ঘরদোর পরিষ্কার রাখাতে বেশী মন দিতে পারতো—তাদের খাটানো। সাঁওতালরা গাঁয়ে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু কোলিয়ারীর অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার ছোঁয়াচ এদেরও লেগেছে।

মদ খায় না এবং জুয়া খেলে না এ রকম মজুর আছে কি না সন্দেহ।

চরিত্রহীনতাও মজুরদের মধ্যে কম নয়, তবে কতটা তা বলা শক্ত। ঝরিয়ার অধিকাংশ মালকাটা (শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ) তাদের স্ত্রীদের নিয়ে কোলিয়ারীতে থাকে। এর জন্যে মজুরদের স্বভাব বিগড়াবার যতটা সম্ভাবনা ছিল, তা হয় নি।

পটুতা

অন্যান্য দেশের কয়লার খনির মজুরের তুলনায় আমাদের দেশের মজুর বেশী দক্ষ না কম দক্ষ ? ভারতের বিভিন্ন স্থানের কয়লার খনির

মজুরদের দক্ষতায় পার্থক্য কতটুকু ? এ সব প্রশ্নের উত্তর নীচের অঙ্কগুলা থেকে পাওয়া যাবে :—

মজুর প্রতি কয়লা উৎপাদন

	কেবল খাদ ও পুকুরখাদের মজুরদের ধর্‌লে		খাদের ওপরের ও ভিতরের সকল মজুর ধর্‌লে	
	১৯২৭	১৯২২-২৬	১৯২৭	১৯২২-২৬
ব্রিটিশ ভারত	১৮৫ টন	১৭৪ টন	১২৮ টন	১০৮ টন
বাংলা ও বিহার	১৯০ "	১৮১ "	১৩১ "	১১৩ "
আসাম	১১৩ "	১২৮ "	৮০ "	৭৯ "
বেলুচিস্থান	৪৯ "	৫৫ "	৩৬ "	৩২ "
মধ্যপ্রদেশ	১৪৬ "	১০৬ "	১০২ "	৬৬ "
পাঞ্জাব	৯০ "	৭৯ "	৫০ "	৪৬ "

১৯২৭ সনে ঝরিয়া ক্ষেত্রে মজুর প্রতি কয়লা উৎপাদন :—কেবল খাদ ও পুকুরখাদে নিযুক্ত মজুরদের ধর্‌লে—২১২ টন খাদের ওপরের ও ভিতরের সমস্ত মজুরদের ধর্‌লে—১৩১ টন

অন্যান্য দেশে মজুর প্রতি কয়লা উৎপাদন :—

১৯২৫ সনে—

জাপানে	১২২ টন
বিলাতে	২২১ "
মার্কিযুণ ক্তরাষ্ট্রে	৭৭৭ "

১৯২৪ সনে—

দক্ষিণ আফ্রিকায়ঃ

ট্রান্সভালে	৪০২ টন
নেটালে	২২০ ”

ওপরে যে অঙ্কগুলা দেওয়া হ'য়েছে সেগুলা থেকে বোঝা যায় যে,—

(ক) বৃটিশ ভারতের মধ্যে বাংলা ও বিহারের মজুরই সবচেয়ে পটু ;

(খ) বাংলা বিহারের (ঝরিয়া সুদ্ধ) ঝরিয়ার মজুরদের উৎপাদন-শক্তি বেশী ;

(গ) বাংলা বিহারের মজুর পটুতাতে জাপানের মজুরকে হারিয়েছে ;

(ঘ) বিলাত বা দক্ষিণ আফ্রিকার মজুরের চেয়ে ভারতীয় মজুর কম পটু এবং মার্কিণ মজুরের চেয়ে অত্যন্ত কম পটু।

ভারতীয় মজুরদের দক্ষতা কম হবার কয়েকটা কারণঃ—

(১) শিক্ষার অভাবে ভারতীয় মজুরের বুদ্ধি মার্জ্জিত নয় ;

(২) উপযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে এবং জলবায়ুর প্রভাবে তার শরীর পাশ্চাত্ত্য মজুরের তুলনায় দুর্ব্বল ;

(৩) কয়লা-কাটার কল বেশী ব্যবহৃত হয় না ; সম্প্রতি মজুর প্রতি কয়লা উৎপাদন বাড়্‌বার একটা প্রধান কারণ কয়লা-কাটা কলের বেশী ক'রে প্রচলন ;

(৪) কোলিয়ারীগুলার সাইজ অত্যন্ত ছোট্ট, সেই জন্যে বেশী মাইনে ওয়ালা সুদক্ষ ম্যানেজার রাখা ও উন্নত শ্রেণীর কলকব্জা বসানো সম্ভব হয় না। সম্প্রতি কিন্তু ছোট কোলিয়ারীগুলা ক্রমেই ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে, বড় সাইজের কোলিয়ারীও বেশী সংখ্যায় দেখা দিচ্ছে। বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যার শতকরা ১৪ ভাগ কয়লা রেলওয়ে খনি থেকে উৎপন্ন

হ'য়েছে এবং শতকরা ৬০ ভাগ মাত্র ১৪টি ম্যানেজিং ফার্ম্মকর্ত্তৃক চালিত খনি থেকে উঠেছে (১৯২৭ সনের চীফ ইন্‌স্পেক্টারের রিপোর্ট) ;

(৫) খাদের ভিতর কয়লা বইবার জন্যে মেয়েদের নিযুক্ত করা হয় ; [১৯২৪ সনের জুলাই মাসের আগে ছোট ছেলেরাও (১৩ বছরের কম) খাদে কাজ করতো] মেয়েদের বদলে পুরুষরা কয়লা বইলে মজুর প্রতি উৎপাদন বাড়্‌বার সম্ভাবনা ;

ভাল যন্ত্রপাতি এবং উচ্চ শ্রেণীর ম্যানেজারের সাহায্য নিলে এবং মেয়েদের কাজ থেকে বাদ দিলে যে উৎপাদন বাড়ে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ জামাডোবা কোলিয়ারী। এই কোলিয়ারীর মজুর প্রতি উৎপাদন ৩৮০ টন।

মাইনে

মাঝারি সাইজের কোলিয়ারীগুলা বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরদের নিম্নোক্ত হারে মাইনে দিয়ে থাকে ঃ—

ফুরণে—

মালকাটা ও বোঝাইকারী (বা বোঝাইকারিণী)—১ টব গাড়ী (১ টনের প্রায় ⅚ ভাগ) কয়লা কাটা ও বোঝাই করার জন্যে ।৶০।

কয়লাকাটা কলচালক—প্রত্যেক 'কাটের' জন্যে ১৷৷০ থেকে ২৲।

ড্রিলার ও শটফায়ারার—প্রত্যেক টব-গাড়ী কয়লা ব্লাষ্ট করার জন্যে—৷৷৴০ (খাদের নীচে বোঝাইয়ের খরচা ও বারুদের দাম কেটে নেওয়া হয়) ; দৈনিক রোজগার প্রায় ৷৷৶০।

টব-গাড়ী চালক—প্রত্যেক টব-গাড়ী কয়লা ঠেলার জন্যে ৩ পয়সা থেকে ৪ পয়সা (দৈনিক রোজগার ৷৷৴০ থেকে ৸০)।

মালগাড়ী বোঝাইকারী কুলী—টন প্রতি ৭ পয়সা থেকে ১০ পয়সা।

সময় হিসাবে :—

(ক) দৈনিক মজুরি—

পাথর ব্লাষ্ট করার জন্যে	ড্রিলার—দৈনিক ৸৹ শটফায়ারার—দৈনিক ১৲ থেকে ১৷৹
টিম্বার মিস্ত্রী	দৈনিক ৸৹ থেকে ৸৵৹
টিম্বার কুলী	" ৷৹ " ৷৴৹
ট্রাম-লাইন-কুলী	" ৷৹ " ৷৴৹
পিট-অনসেটার (পিটের নীচে ঘণ্টা নেড়ে থাকে)	" ৷৹ " ৷৴৹
পিট ব্যাঙ্কস্‌ম্যান (পিটের মুখের কাছে ঘণ্টা নেড়ে থাকে)	" ৷৹ " ৷৴৹
কয়লা ঝাড়াইকারী	নারী দৈনিক ।৶৹ পুরুষ " ৷৵৹
কয়লা থেকে যারা পাথর বাছে	দৈনিক ।৴৹ থেকে ৷৹

(খ) মাসিক মাইনে—

সর্দ্দার	১৮৲ থেকে ২৪৲ ক্বচিৎ কখন ৪০৲
ট্রাম-লাইন মিস্ত্রী	২০৲ থেকে ৩০৲
হলেজ্‌ এঞ্জিনম্যান (টব-গাড়ী টানার এঞ্জিন চালক)	১৬৲ " ১৮৲
পাম্প খালসী	১৬৲ " ১৮৲

ফিটার মিস্ত্রী (যন্ত্রপাতি খারাপ হ'লে ঠিক করা এর কাজ)	৩০৲	”	৮০৲ ক্বচিৎ কখন ১০০৲
বয়লার ফায়ারম্যান	১৮৲	”	২২৲
ওয়াইণ্ডিং এঞ্জিনম্যান (যে এঞ্জিন সাহায্যে ডুলি নামানো ওঠানো হয়, তার চালক)	১৭৲	”	২২৲
কামার	৩০৲	”	৪০৲

চীফ ইনস্পেক্টরের ১৯২৭ সনের রিপোর্টে মজুরদের গড়ে দৈনিক রোজগারের যে হিসাব দেওয়া হ'য়েছে তা এই—

মালকাটা	৸৵০
খাদের নারী মজুর	॥৶১৫
খাদের ওপরের পুরুষ মজুর	॥০
খাদের ওপরের নারী মজুর	।৶০

মাইনে দেবার যে প্রণালীটা (ফুরণে অথবা সময় হিসাবে) অবলম্বন করলে খনি-ওয়ালার স্বার্থের অনুকূল হয়, সেটাই অবলম্বন করা হ'য়েছে।

মালকাটাকে (ও তার সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে) ফুরণে মাইনে দেওয়া হয় তিনটি কারণে :—(১) কাজের পরিমাণ অনুসারে মাইনে হিসেব করার সুবিধা আছে ; (২) ইচ্ছে ক'রে কাজে ঢিলে দিচ্ছে কি না, তা দেখার জন্যে লোক রাখবার দরকার হয় না ; (৩) বেশীর ভাগ মালকাটাকেই স্থায়ী মজুর বিবেচনা করা চলে না (চাষের সময় তারা বাড়ী যাবেই ; বেশী সুবিধা পেলে এক খনি ছেড়ে আর এক খনিতে যেতে একটুও দেরী করে না)।

মালকাটাদের সময় হিসেবে মাইনে দিলে তারা কয়লা কাটাকেই

স্থায়ী পেশা ব'লে বরণ ক'রে নিতে আকৃষ্ট হ'তে পারতো। দুর্ঘটনার সংখ্যাও কম্‌তো—কারণ, দৈনিক রোজগারের গড় হারটা যাতে না কমে, তার জন্যে এখন মজুররা অনেক সময় অত্যন্ত বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানেও কাজ কর্‌তে এগিয়ে যায়। মালকাটাদের ফুরণে মাইনে দেওয়ার প্রথা এত সুবিস্তৃত, আর খনিগুলার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, যে শীঘ্র এ প্রথা উঠে যাবে, এমন আশা করা নিছক পাগ্‌লামি।

মালকাটা ছাড়া অন্যান্য দক্ষ (স্কিল্‌ড) শ্রমিকদের মাস হিসাবে মাইনে দেওয়া হয়, তার কারণ—তাদের শীঘ্র যোগাড় করা শক্ত। সুতরাং তাদের কাজের অন্ততঃ একটু স্থায়িত্ব আছে, তা বোঝানো দরকার। অদক্ষ শ্রমিকদের (বোঝাইকারীদের বাদ দিয়ে) রোজ হিসাবে হপ্তার শেষে মাইনে দেওয়া হয়। মালকাটা ও বোঝাইকারীও হপ্তার শেষে মাইনে পেয়ে থাকে।

মালকাটারাই মজুরদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক। সুতরাং এদের মাসিক রোজগার সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। সাধারণতঃ একজন মালকাটা প্রতিদিন ৩ টব-গাড়ী কয়লা কাটে, আর তার সঙ্গিনী (ঝরিয়াতে শতকরা ৮০ ভাগ—মালকাটাদেরই স্ত্রী) বা সঙ্গী ৩ টব-গাড়ী কয়লা ও ১ টব-গাড়ী শ্ল্যাক (গুঁড়া কয়লা) বোঝাই করে। এর জন্যে মালকাটা ও বোঝাইকারী এক সঙ্গে পায়—৩ × ।৵০ + ।০ = ১৷৵০। হপ্তায় ৫ দিন কাজ করা হচ্ছে ধর্‌লে মোট দাঁড়ায়—৩১।০। অসুখ বিসুখ, ঝগড়া মাতলামি প্রভৃতির জন্যে এরা হপ্তায় ৫ দিনও কাজ কর্‌তে পারে না। জরিমানাতেও কিছু কাটা যায়। সেই জন্যে একটি মালকাটা ও তার স্ত্রীর মিলিত মাসিক আয় ২৪৲।২৫৲ টাকার বেশী হবে না—কম হ'তে পারে।

সকল শ্রেণীর মজুরই খনিওয়ালাদের কাছ থেকে বিনা পয়সায় নানা সাহায্য পেয়ে থাকে, যেমন,—(১) ডাক্তার দেখানো; (২) ঔষধপত্র; (৩) থাকবার ঘর; (৪) পানীয় জল; (৫) রান্নার জন্যে ও শীতকালে ঘর গরম রাখার জন্যে কয়লা; (৬) কেরোসিন তৈল।

মাইনে সম্বন্ধে মজুরদের নানা অভিযোগ; (১) অনেক সময়ে তারা আদবে মাইনে পায় না, অথবা নিয়মিতভাবে পায় না; (২) কোলিয়ারীর খরচ কমাবার দরকার হ'লেই মজুরদের মাইনে আগে কাটা হয়, কিন্তু পরে লাভ বাড়লেও মজুরদের মাইনে সহজে বাড়ানো হয় না; (৩) অসুখের সময় কোন মাইনে দেওয়া হয় না—গোটা-কয়েক কোলিয়ারীতে নামমাত্র খোরাকী দেওয়া হয়; (৪) দিন মজুরেরা কোলিয়ারীর স্থায়ী মজুর হ'লেও, আইনানুসারে হপ্তায় ১ দিন ছুটী পায় ব'লে, পূরা ৭ দিনের মাইনে না পেয়ে ৬ দিনের মাইনে পায়।

ঝরিয়া ক্ষেত্রে যে হারে মাইনে দেওয়া হয়, তার সঙ্গে অন্যান্য বৃটিশ ভারতীয় কয়লা-ক্ষেত্রের তুলনা করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলায় পৌঁছানো যায় :—

(১) আসাম, বেলুচিস্থান ও পাঞ্জাবে সাধারণতঃ ঝরিয়া ক্ষেত্রের চেয়ে বেশী মাইনে দেওয়া হয়;

(২) গিরিডির কয়েক শ্রেণীর মজুর ঝরিয়া ক্ষেত্রের চেয়ে বেশী মাইনে পায়, ঝরিয়ার অন্য কয়েক শ্রেণীর মজুর গিরিডির চেয়ে বেশী মাইনে পায়;

(৩) রাণীগঞ্জ ও মধ্যপ্রদেশের চেয়ে ঝরিয়ার মজুররা বেশী রোজগার করে;

(৪) শুধু মালকাটাদের মাইনে দেখলে—আসাম প্রথম, মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয়, ঝরিয়া তৃতীয়।

খাটুনির সময় ও ছুটী

ভারতীয় খনি আইনে লেখা আছে যে, খাদের ওপরে যারা কাজ করে, তাদের হপ্তায় ৬০ ঘণ্টা, আর খাদের ভিতরে যারা কাজ করে, তাদের হপ্তায় ৫৪ ঘণ্টা ও দৈনিক ১২ ঘণ্টার বেশী খাটানো চল্‌বে না। যাদের ওপর খনি চালানো বা কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আছে, তাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটবে না। কোন বিপদ আপদ হ'লে সেই বিপদ নিবারণের জন্যে যারা খাটবে, ঐ নিয়ম লঙ্ঘন ক'রেও তাদের খাটানো চল্‌বে।

মালকাটারা সাধারণতঃ ৯।১০ ঘণ্টার বেশী খাদে থাকে না—৪।৫ ঘণ্টা মাত্র কাজে যায়, বাকী সময়টা টব-গাড়ীর আশায় ব'সে থাকাতে কাটে। তিনটি কারণে মালকাটারা দরকারমত টব-গাড়ী পায় না—(১) টব-গাড়ী কিন্‌তে পয়সা লাগে। কোলিয়ারীগুলা যত কম টব-গাড়ীতে চালাতে পারে, তার চেষ্টা করে; (২) হলেজ এঞ্জিন লাইন থেকে যেখানে কয়লা কাটা হয়, সেই জায়গাটা অনেক দূরে হওয়াতে গাড়ী ঠেলে নিয়ে যেতে দেরী হয়; মালকাটাদের তদারক কর্‌বার জন্যে (কাজের সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া, গাড়ী যোগানো ইত্যাদির জন্যে) উপযুক্তসংখ্যক দক্ষ লোক থাকে না। টব-গাড়ী ঠিক মত যোগাতে পার্‌লে মালকাটারা এখন যত রোজগার কর্‌ছে, তা খুব অল্প সময়েই কর্‌তে পারতো। সুতরাং দৈনিক খাটুনির সময় ১২ ঘণ্টার জায়গায় যদি ৮ ঘণ্টা করা যেতো, তা হ'লে উৎপাদন যে ক'ম্‌তই—এ কথা বলা চলে না।

মালকাটারা সাধারণতঃ দু'দলে কাজ করে। এক দল সকালে নেমে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটে। আর এক দল সন্ধ্যার পর নেমে ভোর পর্য্যন্ত খাটে। যারা এক হপ্তায় দিনে কাজ করে, পরের হপ্তায় তারা রাত্রে

কাজ করে। নাম্‌বার ওঠ্‌বার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই—খুসীমত নামা-ওঠা চলে। গোটা কয়েক বড় বড় কোলিয়ারীতে রীতিমত শিফ্‌ট্‌ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ সকল খনিতেই ঐ অবস্থা। রীতিমত শিফ্‌ট্‌ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হ'লে নানা সুবিধে—(১) শ্রমিকদলকে আরও শাসনে রাখা যাবে; (২) কে কতক্ষণ কাজ কর্‌ছে, তা ঠিক করা আরও সোজা হবে; (৩) শ্রমিকদের পটুতা (এফিশিয়েন্‌সি) বাড়বে। শিফ্‌ট প্রণালী আইনের সাহায্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার—নয় ত, কোন একটা কোলিয়ারী স্বেচ্ছায় শিফ্‌ট্‌ প্রণালী অবলম্বন কর্‌লে শ্রমিকরা অন্য একটা কোলিয়ারীতে পালিয়ে যাবে।

মালকাটারা ছাড়া অন্য শ্রেণীর মজুরেরা ৯।১০ ঘণ্টা খেটে থাকে। মালকাটারা ফুরণে কাজ করে—তাদের পক্ষে দৈনিক কাজের ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট হওয়া তত দরকার নয়। যারা কোলিয়ারীর দিন বা মাস মাইনের চাকর (আর খাদের ওপর কাজ করে) কোলিয়ারী সহজেই তাদের বেশী খাটাতে পারে। দৈনিক কাজের ঘণ্টার উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্দিষ্ট হওয়া এদের পক্ষে বেশী দরকার।

খনি আইনানুসারে প্রত্যেক মজুর হপ্তায় ১ দিন ছুটী দাবী কর্‌তে পারে। এ ছাড়া আর কোনও ছুটি মজুররা দাবী কর্‌তে পারে না। মনিবের মর্জ্জির ওপর নির্ভর কর্‌তে হয়।

মালকাটারা হপ্তায় অন্ততঃ ২ দিন কাজ করে না। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও দোলের সময়েও তারা কাজ করে না। পূজার সময়ে মালকাটারা কাজ বন্ধ কর্‌লেও কখনও কখনও অন্য শ্রেণীর মজুরদের ওপর বেশী কাজের চাপ পড়ে।

ঘরদোর, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ও জল-সরবরাহ

মজুররা থাকবার ঘর বিনা ভাড়ায় পেয়ে থাকে। সাধারণতঃ একটানা একটি লম্বা বাড়ী করা হয়, আর সেই বাড়ীটাকে অনেক-গুলা পাশাপাশি ঘরে বিভক্ত করা হয়। সাম্‌নে একটা লম্বা বারাণ্ডা থাকে। বারাণ্ডাটাকে দেয়াল দিয়ে বিভক্ত ক'রে দেওয়া হয়। বারাণ্ডার সামনের দিকে কোন দেয়াল থাকে না। মজুরদের বাড়ীর নাম হচ্ছে—"ধাওড়া"।

ধাওড়ার দেয়াল সাধারণতঃ ইটের। মেঝ কংক্রিট বা পাথরের, ছাদ (সাধারণতঃ ইয়োরোপীয় খনিতে) পাকা, অথবা রাণীগঞ্জ বা টাইলের। প্রত্যেক ঘরের একটি দরজা ও জানালা আছে। পাকা বাড়ীর ঘরগুলার ওপরের দিক্‌টায় হাওয়া খেল্‌বার পথ থাকে। যেখানে মজুরদের ঘরগুলা পিঠাপিঠি সাজানো সেখানে ঘরের ভিতর হাওয়া সোজাসুজি খেল্‌তে পায় না। ঘরের সামনে বারাণ্ডায় অথবা বারাণ্ডার ঠিক নীচে একটি ক'রে উনান থাকে। অনেক সময়ে উঠানে স্থাপিত এক একটি বড় উনানে অনেক পরিবার রান্না কর্‌ছে, তাও দেখা যায়।

ঝরিয়া মাইনস বোর্ড অব্‌ হেলথ বাড়ীর মাপজোক সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি নিয়ম তৈরী ক'রেছেন। সে নিয়মগুলি ঠিক মানা হচ্ছে কি না সে দিকে চোখ রাখা হয়। পুরাণো ধাওড়াগুলাকে ভেঙ্গে ফেলান হয়। নিয়মমত ধাওড়া মেরামত ও চুণকাম করান হয় এবং যে ধাওড়ার মাপজোক ঠিক নয়, সে ধাওড়াকে নির্দ্দিষ্ট মাপে পরিণত করাতে বাধ্য করা হয়।

:৯২৬-২৭ সনে বোর্ড অব্‌ হেলথ্‌ কর্ত্তৃক লাইসেন্‌স করা ৩৬, ৬৫৪টা

ধাওড়ার মধ্যে ১১,৮৭০টা ধাওড়ার নির্দ্দিষ্ট মাপ ছিল না। ১১,৮৭০ টাব মধ্যে ৯৯৭ টা বাসের অযোগ্য ছিল।

কয়লা ব্যবসার দুরবস্থার জন্যে ১৯২৬ সন থেকে বোর্ড অব্ হেলথ ধাওড়া সম্বন্ধীয় নিয়ম মানা থেকে খনিওয়ালাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অব্যাহতি দেওয়ার সুবিধে এইটুকু যে—(১) কোন ধাওড়া সত্যই বাসের অযোগ্য কি না, তা বোর্ড নিজে বিবেচনা ক'রে দেখবেন, কেবল কর্ম্মচারীদের মতামতের ওপর নির্ভর করবেন না, (২) কোন ধাওড়ার মাপজোক ঠিক না হ'লে বাড়ীটাকে বদ্‌লে ফেল্‌তে আপাততঃ বাধ্য করা হবে না।

মজুরদের অসুবিধের কথা বিবেচনা না ক'রে খনিওয়ালাদের এ রকম অব্যাহতি দেওয়া নিতান্তই অন্যায়!

ধাওড়াগুলাকে আরও উন্নত শ্রেণীর ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা করা উচিত। তা ছাড়া, ধাওড়া সম্বন্ধে মজুরদের বিশেষ কতকগুলা অসুবিধে আছে, সেগুলা নিবারণ করারও চেষ্টা করা উচিত। অসুবিধেগুলা এই,—

(১) ধাওড়ার ঘরের সাম্‌নের বারাণ্ডাটা একেবারে খোলা—বোর্ড অব্ হেলথের নিয়ম-মতে কিছু ঢাকা দেওয়া চল্‌বে না। যে সব মজুর সস্ত্রীক বাস করে, তাদের এতে পর্দ্দা বজায় রাখা শক্ত হয়।

(২) প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর জন্যে ঘরের ভিতর কতখানি জায়গা থাকা দরকার, তা বোর্ড অব্ হেলথ্ নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। এ নিয়ম সাধারণতঃ পালন করা হয় না। মজুরদের সংখ্যার তুলনায় ঘরের সংখ্যা প্রায়ই কম।

অনেক সময়ে কিছু দূরে খালি ঘর থাকলেও, এক দেশের লোক এক জায়গায় থাকৃবে ব'লে কাছাকাছি ঘরে মজুররা গাদাগাদি করে।

(৩) প্রত্যেক পরিবারের জন্যে একটি ক'রে পৃথক্ ঘরও দেওয়া হয়

না। একই ঘর দিনের বেলা এক পরিবার কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়, রাত্রে আর এক পরিবার কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়।

(৪) ঘরগুলার সংখ্যা যদি এমন হয় যে, যারা দিনে অথবা রাত্রে বিশ্রাম কর্‌ছে কেবল তাদেরই কুলোতে পারে, তা হ'লে ছুটীর দিনে অথবা রাত্রে যখন সকল মজুরই খাদের ওপর থাকে, তখন সকলকে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না। তখন পুরুষরা কতকগুলা ঘরে গাদাগাদি করে, মেয়েরাও আর কতকগুলা ঘরে গাদাগাদি করে। অনেক কোলিয়ারীতেই এই অসুবিধে বর্ত্তমান।

(৫) মজুরদের ঘরগুলা পাশাপাশি, ধাওড়াগুলাও অনেক সময়েই কাছাকাছি থাকে—বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি শীঘ্র ছড়িয়ে পড়্‌বার সম্ভাবনা এতে বেড়ে যায়।

কোলিয়ারীর মধ্যে যাতে ময়লা না জমে, সে জন্যে বোর্ড অব হেল্‌থের কয়েকটা নিয়ম আছে। প্রত্যেক কোলিয়ারীই খনি পরিষ্কার রাখবার জন্যে মেথর রেখে থাকে। অপরিষ্কার হ'য়ে থাকাই বেশীর ভাগ মজুরের স্বভাব, সেই জন্যে ধাওড়াগুলা প্রায়ই অত্যন্ত অপরিষ্কার।

খাদ পরিষ্কার রাখবার জন্যে নানা নিয়ম আছে। সাধারণতঃ সেগুলা পালন করাই হয় না অথবা নামমাত্র পালন করা হয়।

মজুরদের কোন পাইখানা ও নাইবার ঘর নেই। পাইখানা ও নাইবার ঘর করাতে বাধ্য করার ক্ষমতা বোর্ড অব্ হেলথের আছে। এ ক্ষমতা এ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হয় নি। পাইখানা ও নাইবার ঘর সম্বন্ধে মেয়ে মজুরদেরই বিশেষ অসুবিধে।

পরেশনাথ পাহাড়ের তলায় একটা প্রকাণ্ড জলাশয় তৈরী হ'য়েছে। পাইপের সাহায্যে ঝরিয়া-ক্ষেত্রের প্রায় সর্ব্বত্রই সেই জল সরবরাহ করা হয়। প্রত্যহ ১২॥০ লাখ গ্যালন জল দেওয়া হয়। বাজারগুলাতে ১ লাখ

গ্যা'লন বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব অনেকটা নিবারিত হ'য়েছে।

কিন্তু জল সরবরাহ সম্বন্ধে এখনও কতকগুলা অসুবিধে বর্ত্তমান। মজুরদের প্রত্যেক পরিবারের পৃথক্ কল নেই—(ক) ২০।২৫টা পরিবার একটা সাধারণ কল ব্যবহার করে; (খ) কলের জল কেবল পানের জন্যে—কাপড় কাচতে বা বাসন মাজতে দেওয়া হয় না; (গ) কতকগুলা ছোট ছোট কোলিয়ারী খরচ বাড়বার ভয়ে কলের জল নেয় না—সেই সব কোলীয়ারীতে আগেকার দুরবস্থাই আছে—তারা পাৎকো, পুকুর বা নদীর জল সংগ্রহ করে।

স্বাস্থ্য

মজুরদের জনকয়েক বর্ষাকালে ম্যালেরিয়াতে ভোগে। শীতকালে অনেকে সর্দ্দি, জ্বর ও নিউমোনিয়াতে ভোগে। প্রতি বৎসরই জনকয়েক (১৯২৭ সনে কলেরায় মৃত্যু ৮৩, বসন্তে ৫৮) কলেরা ও বসন্তে মারা যায়। বছর কয়েক অন্তর মড়কও দেখা যায়।

ঝরিয়ার মজুরদের সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভাল।

রাণীগঞ্জের মজুররা হুকওয়ার্ম রোগে খুব ভোগে, কিন্তু ঝরিয়াতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব নেই। রাণীগঞ্জের মজুররা উপদংশ রোগে যত ভোগে ঝরিয়ার মজুররা তত ভোগে না। ঝরিয়ার নৈতিক আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল।

ঝরিয়া ক্ষেত্রের গাঁয়ের লোকগুলার চেয়ে কোলিয়ারীর অধিবাসী মজুরদের স্বাস্থ্য ভাল। ঝরিয়ার কয়লার খনিগুলাতে ১ লক্ষ ৮৮

হাজার মজুর আছে। গাঁগুলাতে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার লোক। কিন্তু কলেরা ও বসন্তে গাঁয়ের লোকই বেশী সংখ্যায় মরে।

ঝরিয়ার মজুরদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হ'লেও, আগেকার তুলনায় খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া নিজ নিজ দেশে মজুরদের যেমন স্বাস্থ্য থাকে, খনিতে তেমন থাকে না।*

আর্থিক অবস্থা

খনির মজুরদের আর্থিক অবস্থা সাধারণ ভারতীয় চাষীদের চেয়ে অনেকটা ভাল এই হিসেবে যে, তারা দুবেলা পেট ভ'রে ডাল-ভাত খেতে পায়, মাঝে মাঝে মাছ-মাংসও তাদের কাছে দুর্লভ নয়, এবং তাদের ঋণের পরিমাণও খুব সামান্য। মালকাটাদের মধ্যে বেশ দু'পয়সা জমিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

কিন্তু তা হ'লেও মালকাটা বা অন্য সব সাধারণ মজুরদের অবস্থা এমন কিছু নয় যাতে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া যেতে পারে। তারা যা রোজগার করে, তাতে খাওয়া পরার সব খরচ মিটিয়ে বিশেষ কিছু বাঁচে না, যা বাঁচে তা মদ ও জুয়াতেই অপব্যয় করে। শীত নিবারণের জন্যে গরম কাপড় এদের জোটে না, অনেকেই সর্দ্দি, কাশি, নিউমোনিয়াতে ভোগে। অস্থাবর সম্পত্তি এদের অতি সামান্য—একটা বাক্স, গোটা দুই পিতলের থালা বাটি, ২।৩ খানা কাপড় ইত্যাদি।

মালকাটাদের চেয়ে উঁচুদরের দক্ষ শ্রমিকদের (যেমন ফিটার মিস্ত্রী) রোজগার বেশী। এরা খায় পরে আরও ভাল এবং মদ আর জুয়াতে টাকা নষ্ট করে আরও বেশী।

* জন্ম-মৃত্যুর হার; ১৯২৮ সনে হাজারকরা জন্ম—৩৩·৭৪, মৃত্যু—১৬·৭৩।

দুর্ঘটনা

ভারতের রেলষ্টীমার ফ্যাক্টরী প্রভৃতির কয়লা যোগাবার জন্তে প্রতি বছর প্রায় দু'শ লোককে প্রাণ দিতে হয় এবং পাঁচ শ লোককে আহত হ'তে হয়।

বিলাতের খনি ভারতীয় খনি অপেক্ষা গভীরতর ও বেশী গ্যাসে ভরা হ'লেও সেখানকার দুর্ঘটনার হার ভারতের খনির চেয়ে কম। ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত দশ বছরে প্রতি হাজার মজুরের মধ্যে বিলাতে গড়ে ০'৯৮ জন মজুর ম'রেছিল এবং প্রতি হাজারে ভারতে ম'রেছিল গড়ে ১'২২ জন মজুর।

সমগ্র বৃটিশ ভারতে এবং ঝরিয়াতে মৃত্যুর সংখ্যা কম্‌ছে, কিন্তু সাজ্ঘাতিক জখমের সংখ্যা বাড়্‌ছে ঃ—

বৃটিশ ভারত

	মৃত্যু		সাজ্ঘাতিক আঘাত	
	সংখ্যা	হাজার প্রতি হার	সংখ্যা	হাজার প্রতি হার
১৯২৪	২৩০	১'১৩	২৯৯	১'৫
১৯২৫	১৮৬	১'০৭	৬৭৩	২'১৫
১৯২৬	১৭১	১'০০	৩৬৭	২'১৫
১৯২৭	১৯১	১'১০	৪৫৭	২'৭৭

ঝরিয়া

১৯২৪	১২৪	১'৪৩	১১৬	১'৩৪
১৯২৫	১১১	১'৩৮	১৬৫	২'০৫

	মৃত্যু		সাজ্ঘাতিক আঘাত	
	সংখ্যা	হাজার প্রতি হার	সংখ্যা	হাজার প্রতি হার
১৯২৬	৭২	০'৯৫	১৫৩	২'৬৭
১৯২৭	৯৭	১'৩৬	১২৩	৩'১২

ওপরের সংখ্যাগুলার তুলনা কর্‌লে বোঝা যাবে যে, হাজার প্রতি বৃটিশ ভারতে যত লোক মরে বা সাজ্ঘাতিকভাবে আহত হয়, ঝরিয়াতে তার চেয়ে বেশী লোক মরে ও সাজ্ঘাতিকভাবে আহত হয়।

ঝরিয়াতে মোট মৃত্যুর শতকরা ৯৪ ভাগ এবং মোট সাজ্ঘাতিক আঘাতের শতকরা ৮১ ভাগ খাদের ভিতর হ'য়েছিল (১৯২৭ সন)।

১৯২৭ সনে বৃটিশ ভারতের সকল প্রকার খনিতে (শুধু কয়লার খনিতে নয়) যত দুর্ঘটনা হ'য়েছিল তার ৬২'৬৮ ভাগ দুঃসাহসিকতার জন্যে এবং ২১'৫৩ ভাগ আহত বা মৃত ব্যক্তির দোষে।

কোলিয়ারী এম্‌প্লয়িজ এসোসিয়েশনের মত এই যে, কয়লার খনির দুর্ঘটনা শতকরা ২০ ভাগ মজুরের দোষে, কিন্তু বাকী শতকরা ৮০ ভাগের কারণ—(১) খনির দোষ, (২) উপযুক্ত তদারকের অভাব, (৩) দুর্ঘটনা নিবারণের যন্ত্রাদির সাহায্য না লওয়া।

মজুরদের দোষে যদিও বা বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা হয়, তার জন্যে তাদের দোষ দেওয়া যায় না; তাদের অসাবধান হ'বার দুটি বিশেষ কারণ আছে—(১) ফুরণে মাইনে দেবার প্রথা; (২) টব-গাড়ী ঠিক-মত না যোগানো—টব-গাড়ীর অভাবে ব'সে ব'সে মজুরদের মাথা গরম হ'য়ে উঠে, যখন টব-গাড়ী পায় তখন তারা বিপদ-আপদ ভুলে মরিয়া হ'য়ে কাজ কর্‌তে থাকে।

দুর্ঘটনা নিবারণের নানা আইন কানুন আছে,—ইণ্ডিয়ান মাইন্‌স্

অ্যাক্ট, ইণ্ডিয়ান কোল মাইনস রেগুলেশানস্, ইলেক্ট্রিসিটি রুলস ইত্যাদি। নিয়মগুলা ঠিক মানা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে আরও কড়া নজর রাখা দরকার।

দুর্ঘটনা অনেক সময়ে চাপা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের খনি বিভাগের আরও প্রখর দৃষ্টি থাকা দরকার।

আহতের সেবা

দুর্ঘটনা ঘটবামাত্রই যাতে আহত ব্যক্তি সুদক্ষ লোকের সাহায্য পায়, তার জন্যে নিয়ম করা হ'য়েছে যে, যদি খাদের ভিতর ১০০ জনের কম কাজ করে, তা হ'লে অন্ততঃ ১ জন; যদি ১০০ থেকে ২০০ লোক কাজ করে, তা হ'লে অন্ততঃ ২ জন; যদি ২০০ থেকে ৩০০ জন করে, তা হ'লে ৩ জন; যদি ৩০০ থেকে ৪০০ জন কাজ করে, তা হ'লে অন্ততঃ ৪ জন; যদি ৪০০ থেকে ৫০০ জন কাজ করে, তবে অন্ততঃ ৫ জন; যদি ৫০০ জনের বেশী কাজ করে, তা হ'লে প্রতি পূরা ১০০ জনের জন্যে ১জন লোক "ফার্ষ্ট এডে" দক্ষ হওয়া চাই।

প্রত্যেক খনিতে ঔষধ পত্র রাখ্‌তে বাধ্য করা হয়। প্রত্যেক কোলিয়ারীতে একজন পাশ করা (সাধারণতঃ ক্যাম্বেলের) ডাক্তার নিযুক্ত করা হয়।

"ফার্ষ্ট এডে" অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিম্নতম সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। কোলিয়ারীর ডাক্তারখানায় টাট্‌কা ঔষধ ও যত রকমের ঔষধ দরকার হ'তে পারে তা, থাকে কি না, সে বিষয়ে আরও কড়া নজর আবশ্যক।

একই ডাক্তার এক সঙ্গে ৩।৪টি কোলীয়ারীতেই চাকরী করেন ব'লে অনেক সময়ে দুর্ঘটনার স্থলে শীঘ্র উপস্থিত হ'তে অসমর্থ হন।

মজুরদের ক্ষতি-পূরণ

১৯২৪ সনের ১লা জুলাই হ'তে মজুরদের ক্ষতিপূরণ আইন চলিত হ'য়েছে। কয়লার খনির মজুরেরা এই আইনের জোরে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা আঘাতের জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। ক্ষতিপূরণ পেতে হ'লে—(ক) "মজুরের" ("এম্প্লয়েড") যে অর্থ খনি আইনে দেওয়া আছে, তার ভিতর পড়া চাই, (খ) শারীরিক শ্রমসংক্রান্ত কাজ করা চাই; (গ) ৩০০৲ টাকার বেশী মাইনে পেলে হবে না।

"কাজের জন্যে বা কাজ করতে করতে" আঘাত পেলে বা মৃত্যু ঘটলেই ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।

যদি (ক) আঘাতের জন্যে ১০ দিন বা তার কম সময়ের জন্যে অকর্ম্মণ্যতা হয়, কিংবা (খ) আহত হবার সময়ে মদ, গাঁজা, আফিং প্রভৃতির নেশা থাকে, অথবা (গ) দুর্ঘটনা নিবারণের কোন নিয়ম ভঙ্গ করা হয়, অথবা (ঘ) দুর্ঘটনা নিবারণের কোন যন্ত্রপাতি সরানো হয়, তা হ'লে ক্ষতিপূরণের দাবী চলবে না।

পূর্ণবয়স্ক ও নাবালকের মৃত্যু ও নানা শ্রেণীর জখমের জন্যে কি হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, তা ক্ষতিপূরণ আইনের ৪ ধারায় দেওয়া আছে।

মৃত মজুরের কোন্ কোন্ আত্মীয় ক্ষতিপূরণের দাবী করতে পারে, তা ক্ষতিপূরণ আইনের ২ (১) (গ) ধারায় পাওয়া যাবে।

ক্ষতিপূরণ আইন সম্বন্ধে মজুরদের দিক্ থেকে কয়েকটা বিশেষ কথা বলবার আছে:—

(১)—ভারতীয় মজুরের জীবনের মূল্য অত্যন্ত অল্প ধরা হ'য়েছে (পূর্ণ-বয়স্কের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ—২৫০০৲, নাবালকের—২০০৲)।

(২) শতকরা ৬০ ভাগ দুর্ঘটনায় মজুররা ১০ দিনের কম ভোগে, সুতরাং এরা ক্ষতিপূরণের কোন দাবী করতে পারে না;

(৩) খাদে দুর্ঘটনা ঘট্‌লে, দুর্ঘটনার স্থানে মজুরদের যাওয়া নিষেধ ছিল, এটা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে তারের বেড়া লাগিয়ে দিতে বেশীক্ষণ লাগে না ;

(৪) মজুরদের আত্মীয়দের কোন ঠিকানা রাখা হয় না ; মজুররা মারা গেলে সে খবর অনেক সময়ে তাদের বাড়ীতে পৌঁছায় না ;

(৫) আত্মীয়দের ঠিকানা থাকলেও তাদের অনেক সময়ে দেরী ক'রে জানানো হয়, যাতে তারা আইন কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবীর আবেদন কর্‌তে না পারে।

ক্ষতিপূরণ আইন মজুরদের কি অধিকার দিয়েছে, প্রায় সকল মজুরই তা জেনেছে। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে ও দারিদ্র্যের জন্যে তারা অনেক সময়ে তাদের ন্যায্য দাবী আদায় কর্‌তে পারে না। খনি-ওয়ালারাও দাবী সহজে মঞ্জুর করে না—মোকদ্দমা করে দেখে, যদি দাবী এড়ানো যায়। মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়্‌ছে।

বড় বড় কোলিয়ারীগুলা ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে বীমার বন্দোবস্ত ক'রেছে ; তা হ'লেও বড় ছোট সকল শ্রেণীর কোলিয়ারীই দুর্ঘটনা নিবা-রণের জন্যে আগেকার চেয়ে এখন বেশী সাবধান।

"কোলিয়ারী এম্‌প্লয়িজ' এসোসিয়েশান" মজুরদের হ'য়ে ৭টা মোকদ্দমা চালিয়ে ২টা জিতেছিলেন। ২টা তখনও চল্‌ছিল। ১৯২৭ সনের রিপোর্টে খনি বিভাগের চীফ ইন্‌স্পেক্টার বলেন যে, তাঁরা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে মজুরদের সাহায্য করেন। কতবার কি রকম সাহায্য ক'রেছেন, তার কিছুই জানা যায় না।

মজুররা কেমন ব্যবহার পায়

খনির ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীরা মজুরদের সঙ্গে সাধারণতঃ অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার ক'রে থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে এবং সম্প্রতি মাঝে মাঝে মজুরদের হাতে প্রহৃত হওয়ার ফলে এঁদের ব্যবহার একটু ভাল হ'য়েছে।

ভারতীয় কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে মজুররা অনেক সময়েই কর্কশ ব্যবহার পেলেও নিতান্ত নির্দ্দয় ও অমানুষিক ব্যবহার যে পায় না, এটা নিশ্চয়।

খনির কর্ম্মচারীদের হুকুমগুলা মজুরদের দিয়ে মান্য করাবার জন্যে জরিমানার সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু জরিমানা অনেক সময়েই অন্যায়ভাবে আদায় করা হয়। অন্যায়ভাবে আদায় করা না হ'লেও প্রায়ই অন্যায়ভাবে খরচ করা হয়।

ওপর-ওয়ালাকে অসন্তুষ্ট করলেই যে-কোন মজুর তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত ও বিতাড়িত হতে পারে। এর কোন প্রতীকার নেই।

মজুরদের স্ত্রীলোকরা বা নারী মজুররা কখনও কখনও উপরওয়ালাদের (ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়) হাতে লাঞ্ছিত হয়। মজুররা দুর্ব্বল ব'লে অথবা কিছু টাকা পায় ব'লে, চুপ ক'রে অত্যাচার সহ্য করে। কলেজে শিক্ষিত যুবকরা ম্যানেজার হ'তে আরম্ভ করার পর থেকে বাঙালী ম্যানেজারদের অনেকটা নৈতিক পরিবর্ত্তন এসেছে।

টেকনিক্যাল ও সাধারণ শিক্ষা

যারা এঞ্জিন চালায়, বয়লার দেখে, কলকব্জা যন্ত্রপাতি মেরামত করে—এ সব দক্ষ (স্কিল্‌ড) শ্রমিকদেরও কোন টেকনিক্যাল শিক্ষার

বন্দোবস্ত নেই। এদের জন্যে রীতিমত টেকনিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত হ'লে শ্রমিকদের পটুতা বাড়্‌বে, দুর্ঘটনার সংখ্যাও কম্‌বে।

শ্রমিকদের অধিকাংশই অর্দ্ধ-সভ্য বা অসভ্য আদিম জাতি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্রপাতি কলকারখানাওয়ালা কয়লার খনির সংস্পর্শে এসে তারা আধুনিক জীবনের ও সভ্যতার স্বাদ পেতে পেরেছে। তাদের যুগযুগান্তের মানসিক জড়তা অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও ধ্বংস হ'য়েছে।

পরোক্ষভাবে এই যে শিক্ষা আরম্ভ হ'য়েছে, তাকে আরও অগ্রসর করা দরকার। মজুররা কোন কাজ ভেবে কর্ত্তে পারে না। ভবিষ্যতের কোন চিন্তা এদের মনে স্থান পায় না, জীবনটা কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়াই যেন এদের ধর্ম্ম। এদের মনের জড়তা ভেঙ্গে দেবার জন্যে এদের লেখাপড়া শেখানো দরকার। এদের লেখাপড়া শেখালে এদের পটুত্ব বাড়্‌বে এবং তাতে খনিওয়ালাদেরই লাভ। অথচ তাঁরা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন।

ঝরিয়া-ক্ষেত্রে এখন মোট ১৬টি কোলিয়ারী স্কুল আছে। ছাত্রের সংখ্যা ৬১৭ জন। কোলিয়ারীর বাবু এবং উচ্চ শ্রেণীর দক্ষ শ্রমিকদের ছেলেরাই এখানে পড়ে।

১৩ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের খাটানো বন্ধ করা হ'য়েছে। তারা অনেক সময়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। এদের বসিয়ে রাখ্‌বার জন্যেও কতকগুলা স্কুল দরকার।

মজুর-সঙ্ঘের গোড়াপত্তন

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশান কয়লার খনির মজুরদের প্রথম মজুর-সঙ্ঘ। এখন এটি নবম বর্ষে পদার্পণ ক'রেছে।

সকল শ্রেণীর মজুরই এর মেম্বার আছে। মেম্বারের সংখ্যা এখন ২০০০। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের সহিত ইহা সংযুক্ত। তিনটি স্থায়ী কর্ম্মচারী এর অধীনে কাজ করে। ১৯২৭ সনে এর আয় ছিল ২২৬৭৲। বেশীর ভাগ আয় মেম্বারদের চাঁদা থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। অফিস চালাতেই বেশীর ভাগ টাকা খরচ হয়। অ্যাসোসিয়েশান মজুরদের ব্যক্তিগত অভিযোগগুলা (যেমন বিনা কারণে বিতাড়িত হওয়া) মেটাতে চেষ্টা করে, ক্ষতিপূরণ আদায়ের মোকর্দ্দমা করে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব শেখাবার জন্যে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করে এবং পেনশান, রোগীর ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করে।

অ্যাসোসিয়েশানটিকে প্রধানতঃ নিম্ন লিখিত বাধাগুলার সঙ্গে যুঝ্‌তে হচ্ছে :—(১) মজুরদের শিক্ষার, সুতরাং মার্জ্জিত বুদ্ধিরও অভাব ; (২) কোলিয়ারীগুলা বহুসংখ্যক পৃথক্ স্বত্বাধিকারীর অধীন ; (৩) কোলিয়ারীগুলা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে—চাঁদা সংগ্রহ একটা দুরূহ ব্যাপার ; (৪) অ্যাসোসিয়েশানটিকে মজুরদের প্রতিনিধিরূপে স্বীকার ক'রে নিতে খনিওয়ালারা একান্ত নারাজ।

খনিওয়ালারা এখন উদাসীন ভাব ছেড়ে শত্রুভাব অবলম্বন কর্‌ছে। মজুরদের মধ্যে অনেকটা সাড়া এসেছে।

• •

খাদের মজুররূপে নারী

ইয়োরামেরিকার কোন খনির খাদে মেয়ে শ্রমিকদের কাজ কর্‌তে দেওয়া হয় না।

সমগ্র বৃটিশ ভারতে কয়লার খনির খাদে ২৮,০৪১ জন নারী-মজুর কাজ করে ; ঝরিয়াতে ১৫,৪৪৯ জন কাজ করে।

১৯০১ সনের খনি আইনে ভারত গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছিল যে, যদি ভারত গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, খনিতে মেয়েদের কাজ তাদের জীবন বা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক, তা হ'লে খনিতে তাদের কাজ বন্ধ কর্‌তে পারেন। ১৯২৩ সনের আইনেও সেই ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, আগে তাঁরা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নি, কারণ তখন খনিগুলা বিপজ্জনক ছিল না। এখন প্রয়োগ কর্‌তে চেষ্টা ক'রছেন কেন না এখন খনিগুলা বিপজ্জনক হ'য়ে উঠছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান প্রস্তাব এই যে, ১৯২৬ সনে গড়ে যত মেয়ে শ্রমিক নিযুক্ত ছিল, ১লা এপ্রিল থেকে ঠিক তত সংখ্যায় কমিয়ে আন্‌তে হবে এবং পরে প্রতি বৎসর শতকরা ১০ ভাগ ক'রে কমাতে হবে।

খাদের ভিতর নারীদের কাজ বন্ধ করার পক্ষে যুক্তিগুলা এইরূপ—

১। অনেকে বলেন যে, খাদে কাজ করার জন্য মেয়েদের স্বাস্থ্য কিছু খারাপ হয় না। কিন্তু খারাপ হয়ই ;—কারণ (ক) খাদের ভিতর হাওয়া ভাল ক'রে খেলে না, (খ) খাদের ভিতর সকল স্থানের টেম্পারেচার সমান নয়, (গ) অনেক খাদে 'হিউমিডিটি' (শৈত্য) অত্যন্ত বেশী।

২। বলা হ'য়ে থাকে নারীদের কাজ (কয়লা বওয়া) খুব শ্রমসাধ্য হ'লেও বিপজ্জনক নয়। কিন্তু (ক) ১৯২৭ সনে ঝরিয়া ক্ষেত্রে ১৯,৪৪৯ জন নারীর মধ্যে ১৬ জন ম'রেছিল এবং ৪০ জন সাঙ্ঘাতিক আঘাত পেয়েছিল, (খ) খনিগুলা ক্রমেই গভীরতর হচ্ছে, বারুদের বেশী ব্যবহার হচ্ছে, বিপদের সম্ভাবনাও বাড়্‌ছে, (গ) দুর্ঘটনা নিবারণ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলা নারীদের দিয়ে মানানো অপেক্ষাকৃত শক্ত ব্যাপার।

৩। নারী-শ্রমিক বোঝা বইবার কাজ করার জন্যে পুরুষদের মাই-

নের হার ক'মে গেছে; যে কয়লা কাটে সে, তার স্ত্রী রোজগার না করলে, আরও বেশী মাইনে দাবী ক'রতো; নারী বোঝাইকারী অল্প রোজগারে সন্তুষ্ট হ'তে পারে, কেন না তার আয় দিয়ে একটা পৃথক্ সংসার চালানো হয় না, পুরুষ বোঝাইকারীর সংখ্যা বেশী হ'লে তারা নারী বোঝাইকারীর মত অত অল্প রোজগারে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারতো না। সুতরাং, দুদিক্ থেকে (সস্তায় কয়লা কাটা ও কয়লা বহান) খনি-ওয়ালা সুবিধা ভোগ করছে।

৪। অনেকে বলেন স্ত্রী স্বামীর পাশে কাজ করে, এ প্রথা কি সুন্দর! কিন্তু এ প্রথা পারিবারিক সুখ শান্তি না বাড়িয়ে ধ্বংসই করে দেয়। স্ত্রী সংসারের আয় বাড়ায় বটে, কিন্তু গৃহস্থালীর কাজ দেখ্‌তে পারে না, সন্তানদেরও দেখাশুনা করতে পারে না। মালকাটারা গরীব ব'লেই স্ত্রী যতটুকু রোজগার করে, তা ছাড়তে পারে না। অবস্থা ভাল হ'লে এরাও স্ত্রীকে দিয়ে রোজগার করানো পছন্দ করে না।

বিপক্ষের যুক্তি—

১। বলা হ'য়ে থাকে যে, নারীদের খাদের কাজ বন্ধ করলে মালকাটাদের নৈতিক অবনতি হবে, কারণ তাদের স্ত্রীদের তারা তখন দেশে রেখে আস্‌তে অথবা রোজগার বাড়াবার জন্যে অন্য কোথাও পাঠাতে বাধ্য হবে।

এর উত্তর এই যে, যদি খনিওয়ালারা মালকাটাদের স্ত্রীদের থাক্‌তে জায়গা দিতে অসম্মত না হয়, মালকাটাদের রোজগার যদি কিছু বাড়ে, তাদের বাড়ীগুলাও যদি আর একটু আব্রু-ওয়ালা হয়, তা হ'লে নৈতিক অবনতির ভয় নেই।

২। বলা হ'য়ে থাকে যে, মজুররা নিজে এই পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধতার আর্থিক কারণ (রোজগার কমার ভয়) ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।

৩। খনি-ওয়ালাদের অবস্থা সঙ্গীন হ'তে পারে—(ক) ১৫,৪৪৯ জন নারী মজুরের স্থানে পুরুষ মজুর সংগ্রহ করতে হবে, (খ) অনেক পুরুষ মজুরও চলে যাবে—তার জন্যেও আবার লোক জোগাড় করতে হবে, (গ) মালকাটা ও পুরুষ বোঝাইকারীরা বেশী মাইনে দাবী করবে। এতে খরচ বাড়বে। বেশীর ভাগ খনির যে রকম অবস্থা, পরিবর্ত্তনটা ১০ বছরে আস্তে আস্তে করলেও ধাক্কা সামলানো সোজা হবে না।

৪। মালকাটারা একা নয় খনিওয়ালাদেরও অবস্থা খারাপ। সুতরাং মালকাটাদের মাইনে নাও বাড়তে পারে। মালকাটাদের মাইনে না বাড়লে তাদের স্ত্রীরা দেশে থাকতে পারে বা রোজগারের জন্যে অন্য কোথাও থাকতে পারে—এতে নৈতিক অবনতির ভয় আছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ যুক্তি দুটার উত্তর দেওয়া শক্ত। সেই জন্যে মনে হয় যে, খাদে নারী-নিয়োগ প্রথা নিন্দনীয় হ'লেও আপাততঃ বন্ধ না করাই ভাল।*

---

* লেখকের মনে হয় যে, সকল খনির খাদের ভিতর নারী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করলে নারীদের যত উপকার হবে, নীচের প্রোগ্রাম মত কাজ করতে পারলে তার চেয়ে বেশী উপকার হবার সম্ভাবনা :—(ক) আব্রুওয়ালা বাড়ীর বন্দোবস্ত, (খ) দুর্ঘটনা নিবারণের নিয়মগুলা যাতে আরও ভাল ক'রে মানা হয়, তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা, (গ) খনি পরিদর্শনের জন্যে যাতে নারী ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়, তার চেষ্টা করা, (ঘ) যে খনিগুলার খাদের ভিতর কাজ করা নারীদের পক্ষে বিপজ্জনক সেই খনিগুলার খাদে নারীদের কাজ বন্ধ করান, (ঙ) কোলিয়ারীগুলা যাতে মেয়ে ডাক্তার ও নার্শ নিযুক্ত করে, তার চেষ্টা করা; (চ) সন্তান প্রসবের ছয় হপ্তা আগে ও পরে, তাদের কাজ বন্ধ ক'রে দেওয়া, (ছ) মাতৃত্বের ভাতার বন্দোবস্ত করা, (জ) নারী শ্রমিকদের শিশুদের দেখবার জন্যে নার্শারির বন্দোবস্ত করা (ঝ) আইনের দ্বারা নিম্নতম মজুরির হার নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া, (ঞ) রোগীকে নির্দ্দিষ্ট হারে ভাতা দেওয়া, (ট) খাদের ভিতর কেরোসিনের খোলা আলো উঠিয়ে দিয়ে -র বদলে লণ্ঠনের ব্যবহার চলিত করা, (ঠ) মেয়েদের জন্যে পায়খানা ও নাইবার ঘর

ভদ্র ও শিক্ষিত মজুর

ওভারম্যান, কেরাণী, সার্ভেয়ার, ম্যানেজার, অ্যাপ্রেন্টিস্—এরা ভদ্র ও শিক্ষিত মজুর ব'লে গণ্য হবার যোগ্য।

ম্যানেজারের স্বার্থের সঙ্গে মজুরের স্বার্থের অনেক বিরোধ; সুতরাং ম্যানেজারের কথা এখানে বাদ দেওয়া হ'ল।

ওভারম্যানদের মাইনে ৩০৲ থেকে ১২০৲; সার্ভেয়ারদের মাইনে ৩০৲ থেকে ১২৫৲; কেরাণীদের মাইনে ৩০৲ থেকে ১০০৲। মাইনের ঊর্দ্ধতম হারগুলা ক্বচিৎ দেওয়া যায়। অ্যাপ্রেণ্টিস্‌দের কোন মাইনে দেওয়া হয় না, এদের খুব খাটানো হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায় এরা অ্যালাউয়েন্সও পায় না।

এই সব ভদ্র মজুরদের প্রধান দুঃখ-দুর্দ্দশাগুলা এই :—(১) এদের চাকুরীর কোন স্থিরতা নাই; (২) সামান্য মাইনেতে আরম্ভ করতে হয় এবং তা নিয়মমত বাড়ে না; (৩) আর্থিক অবস্থা শোচনীয়—বিয়ের সময়ে বা গুরুতর অসুখ হ'লে ধার করা ছাড়া উপায় থাকে না; (৪) স্থানীয় জলবায়ু ভাল হ'লেও গুরুতর খাটুনির (দৈনিক ৮।১০ ঘণ্টা। জন্যে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না; (৫) সাধারণতঃ ইয়োরোপীয় খনিতেই এরা ভাল বাড়ী ও ভাল জল পায়; (৬) দুর্গা ও কালী পূজার সময় পালা করে ১০।১২ দিন ছুটী ছাড়া সারা বছরে আর বড় একটা ছুটী পায় না।

তৈরী করতে বাধ্য করা, (ড) ফুরণে মাইনে দেওয়ার প্রথা উঠিয়ে দেওয়া, (ঢ) বয়স্কা মেয়েদের জন্যে নাইট স্কুল করা, (ণ) মাদের উদ্বেগ কমাবার জন্যে ১৩ বছরের কম বয়সের ছেলে মেয়েদের স্কুল বাড়ানো, (ত) মেয়ে মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, (থ) মদের দোকানগুলা আরো শাসনে আনা কিংবা সম্ভব হ'লে মদ্যপান সম্পূর্ণ নিবারণ করা।

কিস্তিবন্দিতে ক্রয়-বিক্রয়

কর্জ্জ দুই শ্রেণীর হ'তে পারে—উৎপাদন-কর্জ্জ ও ভোগ-কর্জ্জ। উৎপাদনের জন্যে যদি কর্জ্জ নেওয়া হয়, তা হ'লে তাকে বলে উৎপাদন-কর্জ্জ। আর কোন ভোগ্য বস্তু ক্রয় কর্‌বার জন্যে যদি কর্জ্জ নেওয়া হয়, তাকে বলে ভোগ-কর্জ্জ।

ভোগ-কর্জ্জ সম্বন্ধে অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যানের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। গ্রন্থখানির নাম—"দি ইকনমিক্‌স্ অব্ ইন্‌ষ্টল্‌মেণ্ট সেলিং; এ ষ্টাডি ইন্ কন্‌জিউমার্স ক্রেডিট উইথ্ স্পেশাল রেফারেন্স টু দি অটো-মোবিল" (হার্পার, নিউ ইয়র্ক, ১৯২৭; ১২+৩৫৭ পৃষ্ঠা; ২য় ভাগ—৬২৩ পৃষ্ঠা; প্রত্যেক ভাগের দাম ৪ ডলার)। গ্রন্থখানি দু' ভাগে সমাপ্ত।

ভোগ-কর্জ্জের ফলাফল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে নানা আলোচনা হ'য়েছে। কিন্তু এবিষয়ে অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যানের দান সত্যই অত্যন্ত মূল্যবান। আগে এই বিষয়ে যত আলোচনা হ'য়েছে তার চেয়ে সেলিগ্‌ম্যানের আলোচনা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। সেলিগ্‌ম্যানের আলোচনার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিষয়টি সকল দিক্ হ'তে এবং তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি প্রয়োগ ক'রে আলোচনা ক'রেছেন।

গ্রন্থখানির প্রথম ভাগটি প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ও বিবরণাত্মক। দ্বিতীয়টি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে পূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক। প্রথম ভাগে যে সব সিদ্ধান্তে পৌছানো গিয়েছে, তার সমর্থনের জন্যে নানা অঙ্ক ও তথ্য দ্বিতীয়টিতে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে যে সব মাল মশলা

ঢুকানো হ'য়েছে ভবিষ্যতে তার সাহায্যে অনেক গবেষণা চল্‌তে পার্‌বে।

কেবল ভোগ-কর্জ্জ সম্বন্ধে আলোচনা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়। ভোগ-কর্জ্জের একটি বিশেষ ভাগ কিস্তিবন্দি কর্জ্জের আলোচনা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমভাগের আরম্ভেই বুঝানো হ'য়েছে কিস্তিবন্দি-কর্জ্জ কাকে বলে। মাল হস্তান্তরিত ক'রবার সময় দাম না দেওয়া, দাম-দেওয়াটা অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ ভবিষ্যতে পিছিয়ে দেওয়া এবং হস্তান্তরের সময়ে যেরূপ বন্দোবস্ত হয়, তদনুযায়ী কিস্তিতে কিস্তিতে দাম দেওয়া—এরই নাম কিস্তিবন্দি প্রণালী। একসঙ্গে থোক্ টাকা ধার নেওয়া এবং তা একেবারে শোধ দেওয়া থেকে কিস্তিবন্দি-কর্জ্জ পৃথক্ জিনিষ। কিস্তি-বন্দি কর্জ্জে টাকা একসঙ্গে শোধ দেওয়া হয় না। অল্পে অল্পে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ দেওয়া হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হ'তে এ পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দি প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কিভাবে জন্মেছে ও ক্রমে বেড়েছে অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান তার আলোচনা ক'রেছেন।

কিস্তিবন্দি প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় চালাতে হ'লে নানা শ্রেণীর লোকের পরস্পরের সহায়তার দরকার; যেমন, ক্রেতা, বিক্রেতা, কারখানাওয়ালা, ফিনান্স কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও পুঁজিওয়ালা জনসাধারণ। উক্ত নানা শ্রেণীর লোকের পরস্পরের সহায়তার জন্যেই কিস্তিবন্দিতে ক্রয়-বিক্রয় চল্‌তে পারে। ঐ সব শ্রেণীর লোক বা প্রতিষ্ঠানের পরস্পরের সম্বন্ধটা কিরূপ? গ্রন্থে তা খুঁটিয়ে আলোচনা করা হ'য়েছে।

কিস্তিবন্দি প্রণালীর সাহায্যে কত পরিমাণ মালের ক্রয়-বিক্রয় চ'লে থাকে, সে আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। * আগে

এ সম্বন্ধে যে সব গবেষণা হ'য়েছে সেগুলা বিশ্লেষণ করা হ'য়েছে, সেলিগ্‌ম্যান নিজে এ বিষয়ে যে সব তথ্য সংগ্রহ ক'রেছেন সেগুলাও কাজে লাগানো হ'য়েছে।

কিস্তিবন্দি প্রণালীর প্রকৃত স্বরূপটা কি? এটা বোঝাবার জন্যে গ্রন্থকার নানা সমস্যা তুলে সেগুলা বিষদভাবে আলোচনা ক'রেছেন —যেমন (১) উৎপাদনের জন্যেই কি কর্জ্জ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত? ভোগ-কর্জ্জ কি সব সময়েই নিন্দনীয়? (২) কর্জ্জের ক্রম-পরিণতিতে ভোগ-কর্জ্জের স্থান কোথায়? ভোগ-কর্জ্জ কি সাধারণ কর্জ্জেরই একটা স্বাভাবিক পরিণতি? (৩) যদি এটা সাধারণ কর্জ্জেরই পরিণতি হয়, তা হ'লে এ বৃদ্ধির গতি কোন্ দিকে? এটা বাড়্ছে কি? যদি বাড়ে ত কেন বাড়্ছে? ভোগ-কর্জ্জ আন্দোলনের মূল কারণগুলা কি? (৪) ভোগ-কর্জ্জেরও ত' নানা রূপ আছে; ভোগ-কর্জ্জ কি কেবল অত্যাবশ্যক জিনিষের জন্যেই নেওয়া যেতে পারে। বিলাস-দ্রব্যের জন্যে কি ভোগ-কর্জ্জ নেওয়া যেতে পারে না? (৫) ভোগ-কর্জ্জ ও কিস্তিবন্দি কর্জ্জের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? কিস্তি-বন্দি কর্জ্জের এমন কোন বিশেষত্ব আছে কি, যার জন্যে ভোগ-কর্জ্জ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধান্তগুলা এতে লাগানো যেতে পারে না? সাধারণ ভোগ-কর্জ্জের যে সব বিপদ বা সুবিধা আছে, কিস্তিবন্দি-কর্জ্জে কি তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ বা সুবিধা আছে? (৬) শেষ সমস্যাটি অটোমোবিল নিয়ে—অটোমোবিল বিলাসিতার জিনিষ, না অত্যাবশ্যক জিনিষ? এটা কি উৎপাদনের সহায়ক, না কেবল ভোগের জন্যে? এর উদ্ভাবন কি ভাল, না মন্দ? আধুনিক আর্থিক প্রণালীতে এর স্থান কি? মোটর ব্যবহারের ইচ্ছা বাড়ানো সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না?

কিস্তিবন্দি-কর্জ্জ সাধারণ ভোগ-কর্জ্জ (যেমন, কোন ভোগের জিনিষ কেন্‌বার জন্যে দোকানে দামী জিনিষ বন্ধক রেখে ধার করা) হ'তে দু'কারণে বিভিন্ন। প্রথমতঃ এতে ধার একসঙ্গে শোধ দেওয়া হয় না, অল্পে অল্পে শোধ দেওয়া হয়; দ্বিতীয়তঃ, এটা ভোগ্য অথচ কিছুকাল স্থায়ী জিনিষের জন্যেই কেবল দেওয়া হয়।

তারপর হচ্ছে, কিস্তিবন্দি-কর্জ্জের ফলাফল সম্বন্ধীয় আলোচনা। (১) ভোগ, (২) উৎপাদক (৩) কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান-সমূহ—এদের ওপর কিস্তিবন্দি-কর্জ্জের ফলাফল আলোচনা করা হ'য়েছে।

ভোক্তার ওপর কিস্তিবন্দি-কর্জ্জের ফল ভাল হ'তে পারে, আবার মন্দও হ'তে পারে। যে জিনিষের সত্যই দরকার নাই, যা কেবল সাময়িক খেয়াল সন্তুষ্ট করে, যার দাম এ রকম যে ভবিষ্যতের উপার্জ্জনের ক্ষমতার হিসাব নিলেও দাম শোধ দেওয়া অসম্ভব, এ রকম জিনিষ কিন্‌তে সাহায্য কর্‌লে কিস্তিবন্দি-প্রণালী ভোক্তাদের খরচে ক'রে তুল্‌বে; সুতরাং এটা নিন্দনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি জিনিষটি বিশেষ বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় হয়, নগদ টাকা দিয়ে কিনতে না পারার জন্যে যদি হবু ক্রেতাটির উৎপাদনের ক্ষমতা কমে যায় বা তার অত্যন্ত অসুবিধা হয়, তা হ'লে কিস্তিবন্দি প্রণালী ক্রেতাকে খরচে না ক'রে তার সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়াবে, আর তাকে বেশী ক'রে উপার্জ্জন কর্‌তেও বাধ্য কর্‌বে।

উৎপাদকের ওপর এর প্রভাবটা কি রকম? এটি ক্রেতাদের ক্রয়-শক্তি বাড়ায়—টাকা দেবার সামর্থ্যের অভাবে যে সব জিনিষ কেনা বন্ধ থাক্‌তো, এর সাহায্যে সে সব জিনিষ তাদের দ্বারা কেনা সম্ভব হয়। ক্রেতার সংখ্যা বাড়াবার জন্যে উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ানো আবশ্যক হয়; অর্থাৎ, কারখানা-ওয়ালারা আরও বেশী পরিমাণে কাজ পায়।

বাণিজ্যের অবস্থা কখনও মন্দা, কখনও পড়্‌তা। সমৃদ্ধি ও লোকসান—একের পর অপরটি চক্রাকারে ঘুরে থাকে। এই বাণিজ্য-চক্রের ওপর কিস্তিবন্দি-কর্জ্জের প্রভাব কি রকম? গ্রন্থকার তা আলোচনা করেন নি।

কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর এর প্রভাব কি রকম? সাধারণের ধারণা যে, ব্যবসার মন্দার সময়ে কিস্তিবন্দি-কর্জ্জ অত্যন্ত ক্ষতিকর। মন্দার সময় কেনা-বেচা ক'মে যায়। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলা কর্জ্জের পরিমাণও কমিয়ে দেয়। এই সময়ে কিস্তিবন্দি-প্রণালীতে বিক্রয় করা মানে কর্জ্জ বাড়ানো; সুতরাং, ব্যাঙ্কগুলাকে বিব্রত ক'রে তোলা।

গ্রন্থকার নানা অঙ্কের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, কিস্তিবন্দি-কর্জ্জের জন্যে মার্কিণ ব্যাঙ্কগুলাকে কখনও বিব্রত ক'রে তোলা হয় নি।

এও বলা যেতে পারে যে, মন্দার সময়ে ব্যবসার লাভ যত ক'মে যায়, ব্যক্তিগত আয় তত ক'মে যায় না; আর কিস্তিবন্দি-কর্জ্জ সাধারণতঃ শোধ দেওয়া হয় ব্যক্তিগত আয় হ'তেই।

আরও বলা চলে যে, মন্দার সময়ে কিস্তিবন্দিতে ক্রয়-বিক্রয় বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কারণ, কিস্তিবন্দি-প্রণালী ক্রয়-বিক্রয় বাড়িয়ে ব্যবসার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা করে।

লোকে ভেবে থাকে যে, কিস্তিবন্দি-প্রণালীতে বিক্রয় করলে ব্যবসাদারদের অত্যন্ত লোকসান সইতে হয়। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। জেনারেল মোটর অ্যাকসেপ্টেন্‌স কর্পোরেশান কিস্তিবন্দি-প্রণালীতে মোটর বেচে। ১৯২০ হ'তে ১৯২৬ সনের মধ্যে এর বার্ষিক লোকসানের পরিমাণ—ঊর্দ্ধতম শতকরা ·১০৯ (১৯২২ সনে) এবং নিম্নতম শতকরা ·০৩৫ (১৯২৬ সনে)। দেখা যাচ্ছে লোকসানটা নিতান্তই সামান্য।

ওপরে সেলিগ্‌ম্যানের গ্রন্থের ভেতরকার মালের সামান্য কিছু দেওয়া হ'য়েছে। বিরাট গ্রন্থের সব কথা ক্ষুদ্র সমালোচনায় দেওয়া সম্ভব নয়।

কিস্তিবন্দি-প্রণালীর গভীর আলোচনা ক'রে অধ্যাপক সেলিগ্‌-ম্যান যে প্রত্যেক ধনবিজ্ঞান-সেবীরই ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন, তা বলাই বাহুল্য।

ব্যাঙ্ক-যোগে যুবক বাঙলা*

প্রঃ—ব্যাঙ্ক ব্যবসায় আজকাল বাঙ্গালীর অবস্থা কি রকম ?

উঃ—বাংলা দেশের বড় বড় ব্যাঙ্ক সব ক'টাই বিদেশী। মফঃস্বলে অনেকগুলা লোন-অফিস দেখা যায়। তা ছাড়া, নানা সহরে ও গ্রামে অনেক মহাজন আছে। এরাই বাংলা দেশের চাষবাসের জন্মে যা কিছু টাকার দরকার হয়, তা যুগিয়ে থাকে।

কিন্তু মফঃস্বলে যে সব লোন-অফিস বা মহাজন দেখা যায়, তারা প্রধানতঃ জমিদারদের ও চাষীদেরকে টাকা দিয়ে থাকে। বাংলা দেশের পল্লীগুলা হ'তে প্রধান প্রধান সহরে, সহরগুলা হ'তে পল্লীতে এবং বাংলার এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে কম মাল আসা-যাওয়া করে না। এর জন্মে ব্যবসাদারদের মূলধনের খুবই দরকার হয়।

অপর দিকে, দেশে মূলধনের যে অভাব আছে, তাও বলা চলে না। স্থযোগ পেলে, টাকা হারাবার ভয় না থাক্‌লে এবং খাটানো টাকা থেকে লাভ পাবার সম্ভাবনা থাক্‌লে, দেশের লোক যে টাকা ঢাল্‌তে অরাজী নয়, তার প্রমাণের অভাব নেই।

স্থতরাং, এক দিকে টাকা খাটাবার যথেষ্ট স্থযোগ রয়েছে ; অপর দিকে, টাকারও অভাব বড় একটা নেই।

প্রঃ—এ অবস্থায় ব্যাঙ্কের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়াই ত স্বাভাবিক। অথচ, ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা বাড়্‌ছে না। এর কারণ কি ?

উঃ—এর গোটাকয়েক কারণ সজ্ক্ষেপে উল্লেখ করা যাচ্ছে :—

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সঙ্গে বর্ত্তমান গ্রন্থকারের কথোপকথন।

প্রথম—মাল চালানের রসিদ দেখে টাকা ধার দেওয়ার অভ্যাসের অভাব ;

দ্বিতীয়—যে সব বাণিজ্য-কাগজ আইনে গ্রাহ্য হ'তে পারে, সেগুলার সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ;

তৃতীয়—সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া সম্বন্ধীয় আইন অত্যন্ত জটিল। অনেকের দামী সম্পত্তি থাকলেও, আইনের জটিলতার জন্যে সম্পত্তির অধিকারিত্ব সম্বন্ধে ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করা, অথবা ব্যাঙ্কের সন্তুষ্ট হওয়া বর্ত্তমানে সহজ নয় ;

চতুর্থ—ব্যাঙ্ক-পরিচালকরা যাতে আমানতের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রিজার্ভ রাখ্‌তে বাধ্য হয়, আর ব্যাঙ্কের হিসাব নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে, সে সম্বন্ধে যথোচিত আইনের অভাব ;

পঞ্চম—বহির্ব্বাণিজ্যের জন্যে কল্‌কাতায় অনেক গুদাম ঘর আছে, তাও বিদেশীর হাতে ; কিন্তু বাংলার অন্তর্ব্বাণিজ্যের জন্যে বাংলার সর্ব্বত্র গুদাম-ঘরের অত্যন্ত অভাব। সর্ব্বত্র গুদামঘর প্রতিষ্ঠিত হ'লে, ব্যবসাদারেরা গুদামে মাল রেখে, গুদামের রসিদ দেখিয়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তখনি টাকা পেতে পারে ;

ষষ্ঠ—কল্‌কাতার বড় বড় মহাজন সোজাসুজি বড় বড় ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা ধার করতে পারে—মহাজনদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের এখানে একটা ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু মফঃস্বলে যে সব মহাজন আছে, তাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের যোগ নেই। তাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হবার সুযোগ হ'লে, ব্যাঙ্কের কার্য্যকেন্দ্র যে বাড়্‌বে, ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা বাড়্‌বারও যে সম্ভাবনা হবে, সে বিষয় সন্দেহ নেই। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের পথে যে বাধাগুলা আছে, সেগুলা অনুসন্ধান ক'রে স্থির করা ও সরানো একান্ত দরকার ;

সপ্তম—আমাদের দেশে সাধারণ মহাজনেরা বাজারে খুব চড়া হারে সুদ পায়, যার হাতে নগদ টাকা আছে, সেই লগ্নী-কারবারে বেশ লাভবান্ হ'তে পারে। তাদের পক্ষে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা পছন্দসই নয়। কাজেই সুদের হার দেশের ভেতরে কম্‌তে থাক্‌লেই, ব্যাঙ্কের দিকে এবং ব্যাঙ্ক-সংশ্লিষ্ট ব্যবসার দিকে টাকাওয়ালা লোকের নজর পড়্‌বে। এখন চল্‌ছে ধনিক মহলে লগ্নী-কারবার বনাম ব্যাঙ্ক-সমস্যা। তবে বিগত ১৫।২০ বছরের ভেতর সুদের হার কিছু কিছু ক'মেছে। পয়সাওয়ালা লোকেরা লগ্নী-কারবারটিকে যখের মতন আঁকড়ে ধ'রে থাক্‌তে আর তত বেশী ইচ্ছুক নয়—এ একটা সুলক্ষণ।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত কি কৃতিত্ব দেখিয়েছে ?

উঃ—আধুনিক নানা শ্রেণীর ব্যবসাতে বাঙ্গালী অনেক দিন বড় হ'য়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙ্গালী অতি অল্পদিনই হাত দিয়েছে। তবুও ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বেশ গৌরবময় ও উৎসাহজনক। গত ২৪ বছর যাবৎ, অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হ'তে, যুবক বাংলা ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিং-এর সকল দিকেই সাফল্যের পর সাফল্য লাভ ক'রে আস্‌ছে। আমাদের অনেক গলদ আছে সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা কি অদ্ভুত উন্নতি ক'রেছি, তা ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের জেনে রাখা উচিত।

প্রঃ—সারা ভারতের কথা ধর্‌লে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার বিশেষ উন্নতি হ'য়েছে কি ?

উঃ—হাঁ, অনেকটা উন্নতি হ'য়েছে বৈকি।

বর্ত্তমানের সঙ্গে ১৯০৫ সনের অবস্থা তুলনা করাই এটা মাপবার একটি উপায়। সারা ভারতের অঙ্কগুলা আলোচনা করা যাক্। ১৯০৫ সনে ভারতে ভারতীয়দের তাঁবে মাত্র ৯টি যৌথ ব্যাঙ্ক ছিল। এই

প্রতিষ্ঠান ক'টার মোট মূলধন ও আমানতের পরিমাণ ১৩½ কোটি টাকার বিশেষ বেশী ছিল না। যে সব ব্যাঙ্কের অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা মূলধন ছিল, তাদের কথাই আলোচনা কর্‌ছি।

১৯২৭-২৮ সনে ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা কত? এখন তো ২৭-এর অঙ্কে ঠেকেছে। মূলধন ও আমানতের পরিমাণও ৭০ কোটি ৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। এই সোজা অঙ্কগুলা যে কোন লোককে বুঝিয়ে দেবে যে, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, ভারত উল্লেখযোগ্য একটা কিছু ক'রেছে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে ভারতের উন্নতি, কাপড়ের ব্যবসাতে স্বদেশী আন্দোলনের ঠিক পাশাপাশি চলেছে। ১৯০৫ সনে গোটা ভারতে মাত্র ১৯৭টা কাপড়ের কল ছিল। এদের টাকু ছিল ৫ কোটি ২০ লক্ষটি, আর তাঁত ছিল ৫০ হাজারটা। আজকাল কাপড়ের কলের সংখ্যা—৩৩৪। এদের টাকুর সংখ্যা ৮ কোটি ৭০ লক্ষ এবং তাঁতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার। মজুরের সংখ্যা হিসাব কর্‌লে দেখতে পাই—১৯০৫ সনে কাপড়ের কলগুলাতে ২ লক্ষেরও কম লোক খাট্‌তো, কিন্তু এখন কাপড়ের কলের মজুরদের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭৪ হাজারের কাছাকাছি। বহির্ব্বাণিজ্য ঘটিত আঁকজোকেও বস্ত্রশিল্পের এই উন্নতির প্রভাবটা দেখা যাচ্ছে। ১৯০৫ সনে আমরা বিদেশী বস্ত্রের ওপর যতটা নির্ভর কর্‌তাম, এখন আর ততটা করি না। তুলার সূতার আমদানিও অনেক পরিমাণে ক'মেছে। কম নম্বরের সূতার (২১ হইতে ৩০) আমদানি নিতান্ত নগণ্য। ভারতে মোট ২১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের কম নম্বরের সূতা প্রস্তুত হয়, আমদানি করা' সূতার মোট ওজন মাত্র ১১ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতে প্রস্তুত কাপড়ও বিদেশী বস্ত্রকে অনেকটা হটিয়েছে। বিদেশী বস্ত্রের বিতাড়ন বেশ জোরের সঙ্গে এবং অবিচ্ছিন্ন-ভাবেই চল্‌ছে। বিদেশী কাপড়ের আমদানি শতকরা ৫০·৬০ ভাগ

ক'মেছে—১৯১৩-১৪ সনে ৩১৫ কোটি ৯৩ লক্ষ গজ আমদানি করা হ'য়েছিল। এখন আমদানি দাঁড়িয়েছে ১৫৪ কোটি গজ। কাপড় সম্বন্ধে আমাদের আত্ম-নির্ভরতা কি রকম বাড়ছে, তা এই অঙ্কগুলা হ'তেও মালুম হয়। আরও কয়েকটা অঙ্ক দেখা যাক্। ১৯০৪-৫ সনে ভারতের মোট দরকার ৩৫২ কোটি গজ কাপড়ের ২১৫ কোটি গজ, অর্থাৎ শতকরা ৬০ ভাগ, বিদেশ হ'তে এসেছিল; ১৯২৬-২৭ সনে মোট দরকার ৫০৯ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে ১৭৩ কোটি গজ, অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৩৪ ভাগ বাহির হ'তে এসেছিল। মোটের ওপর বলা যেতে পারে যে, এই শিল্পে স্বদেশীভাব বিশেষ জয়ী হ'য়েছে।

প্রঃ—এইবার বাংলা দেশের উন্নতির কথাটা সবিস্তারে বলুন। এই সম্পর্কে সমবায় ব্যাঙ্কগুলার কথাই বোধ হয়, প্রথম আলোচনা চল্‌তে পারে?

উঃ—হাঁ, প্রথমে সমবায়-ব্যাঙ্কের কথাই বল্‌বো। ১৯০৪ সনে সমবায়-সমিতি সম্বন্ধীয় আইন প্রথম পাশ হয়। অর্থাৎ, যে সময়ে যুবক বাংলা স্বদেশী আন্দোলন স্বরু করে, সে সময়ে সমবায়-ব্যাঙ্ক স্থাপনের কল্পনা-জল্পনা মাত্র চল্‌ছিল। আজ বাংলাদেশে বড়, মাঝারি ও ছোট এবং প্রাদেশিক ও পল্লী সকল প্রকারের প্রায় ১৩ হাজারটি সমবায়-ব্যাঙ্ক আছে। সমবায়-নীতিতে ব্যাঙ্ক চালানোর মানেটা তলিয়ে বোঝবার জন্যে এইখানে একটু থামা দরকার। প্রধানতঃ পল্লীগ্রামের চাষীদের টাকাই এই ব্যাঙ্কগুলা চালাচ্ছে। তারা নিরক্ষর হ'লেও তাদের পুঁজিতেই ব্যাঙ্কগুলা চল্‌ছে। এই ব্যাঙ্কগুলা এখন প্রায় ৮ কোটি টাকার মূলধন নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছে।

কেউ কেউ বল্‌তে পারেন যে, সমবায়-ব্যাঙ্কগুলা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং এদিকে গত ২৪ বৎসরে যে উন্নতি হ'য়েছে, তার জন্যে

যুবক বাংলার বাহাদুরি নেবার কোন অধিকার নেই। চাষীদের মধ্যে সমবায় ঋণ-সমিতি বাড়াবার জন্যে আমাদের স্বদেশ-সেবকরা যে বিশেষ চেষ্টা করেন নি, তা সত্য। কিন্তু সমবায়-ব্যাঙ্কের ফলে সমবেত চেষ্টায় ব্যবসা চালাবার অভ্যাস বেড়েছে এবং পরস্পরের সাহায্য করা ও সদ্ভাব বজায় রাখার অভ্যাসও বেড়েছে। এই গুণগুলা মূল্যবান্ জাতীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হবার যোগ্য। এরা বাঙ্গালী জাতির (বিশেষতঃ চাষীদের) চরিত্রের প্রধান উপাদান হ'য়ে উঠেছে। এটা স্বীকার করা অসঙ্গত নয়। কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে এই সঙ্ঘবদ্ধতা একটি অমূল্য জিনিষ। আগামী কয়েক বৎসরের আর্থিক উন্নতি সাধনে এটার সহায়তা বড় তুচ্ছ হবে না। দেশের ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার ও শিল্প-পতিগণ এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না।

প্রঃ—সরকারী সাহায্য না নিয়ে বাঙ্গালী কটা ও কি শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গ'ড়েছে?

উঃ—এর হিসাব পেতে হ'লে বাংলার জেলায় জেলায় যে সব যৌথ-ব্যাঙ্ক গ'ড়ে উঠেছে, তাদের দিকে চাইতে হবে। এই সব ব্যাঙ্কে নিম-সরকারী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা কিছু কিছু সইতে হ'য়েছে। সুতরাং, যৌথ-ব্যাঙ্ক ব্যবসাতে বাংলা যতটা সাফল্য অর্জ্জন ক'রেছে, তা বাঙ্গালীর ব্যবসা-পটুতা, সাধুতা এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে অভ্যস্ত হওয়ারই ফল—তা বুঝ্লে ভুল বোঝা হবে না।

১৯২৫ সনের শেষাশেষি আমি ভারতে ফিরি। সেই সময় হ'তে বাংলায় যতগুলা যৌথ-ব্যাঙ্ক আছে, তার একটা সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। বাংলার ব্যাঙ্কগুলার সংস্থান সম্বন্ধে সংখ্যামূলক সম্পূর্ণ বিবরণ এবং কি কি কাজে তারা হাত দেয়, তার বৃত্তান্তও জোগাড় করতে সচেষ্ট আছি। নানা কারণে এই তথ্যগুলা

সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। মোটামুটি হিসাবে জানা গিয়েছে যে, বাংলার পল্লী, মহকুমা ও জেলা-কেন্দ্র-যৌথ প্রণালীতে পরিচালিত প্রায় ৫০০টি ব্যাঙ্ক বা লোন-অফিস আছে। ১৯০৫ সনে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক এত অল্প ছিল যে, আঙ্গুলে গণা যেতো; ১৯১২-১৩ সনে কয়েক ডজন মাত্র ছিল; এই অঙ্কগুলা মনে রাখ্‌লে বর্ত্তমানের অঙ্কটা চমক লাগাবার মত মনে হ'তে বাধ্য। লোন-অফিসগুলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতনটি ১৮৭০-৭৫ সনের কাছাকাছি স্থাপিত হয়।

প্রঃ—বাঙ্গালীর কত মূলধন এই ব্যাঙ্কগুলাতে খাটছে?

উঃ—এদের প্রত্যেকের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ গড়ে ২৫ হাজার টাকা। পরিমাণটা খুব অল্প ক'রেই ধরছি। তা হ'লে আমাদের মোট পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায়, প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক মূলধনের দশগুণ টাকা (আন্দাজটা খুব কম ক'রেই ধরা হচ্ছে) নিয়ে কারবার করছে ধ'রে নিলে, আজ বাঙ্গালী এই ৫০০ ব্যাঙ্কের ভেতর দিয়ে ১২॥০ কোটি টাকার কারবার করছে বুঝ্‌তে হবে। এর মানে, বাংলার লোক-সংখ্যা যদি ৫ কোটী হয়, আমাদের প্রত্যেকের ২॥০ আনা ক'রে ব্যাঙ্ক-কারবারে খাটছে। মানে প্রত্যেক বাঙ্গালী—স্ত্রী, পুরুষ বা শিশু, ধনী বা দরিদ্র—ব্যাঙ্কের সাহায্যে বছরে আড়াই টাকার কারবার চালাচ্ছে। ১৯০৫ সনের তুলনায় এটা যথেষ্ট উন্নতি সন্দেহ নেই। কারণ, ১৯০৫ সনে যৌথ প্রণালীতে চালিত ব্যাঙ্কগুলা এত নগণ্য ছিল যে, ব্যাঙ্ক কারবারে খাটানো টাকাকে বাংলার লোক-সংখ্যা দিয়ে ভাগ ক'র্‌লে বাঙ্গালীর মাথা-পিছু একটা অঙ্কই পাওয়া যেতো না।

নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর করবার দরকার নেই। কারণ, আমার কাছে ৪২টি প্রতিষ্ঠানের হিসাব-পত্র আছে। এদের আদায়ী মূলধন ১৮ লক্ষ টাকা। প্রতি ব্যাঙ্কের গড়ে মূলধন দাঁড়ায়—৪২,৮৫৭ টাকা। এই গড়

ধ'রে হিসাব করলে ৫০০ ব্যাঙ্কের মোট মূলধন হবে—২,১৪,২৮,৫০০৲ টাকা। ৪ কোটি ৭০ লক্ষ বাঙ্গালীর মাথা-পিছু মূলধন আট আনারও কিছু কম।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কগুলার আমানতের পরিমাণ কিরূপ, তা হিসাব ক'রে দেখেছেন কি ?

উঃ—যে ৪২টি ব্যাঙ্কের কথা বল্লাম, তাদের আমানতের পরিমাণ ৩,৯৩,৮৫,২২৬৲ টাকার কাছাকাছি। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায়—৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তা হ'লে ৫০০টি ব্যাঙ্কের মোট আমানত হবে—৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বাংলার লোক-সংখ্যা যখন ৪ কোটি ৭০ লক্ষ, তখন মাথাপিছু আমানতের পরিমাণ দাঁড়ালো—১০৲ টাকা। অনুমানটি বরাবরই খুব কম ক'রে ধরা হ'য়েছে।

সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্বে চালিত যৌথ-ব্যাঙ্কগুলাকে নিয়েই এ হিসাব করা হ'য়েছে। বাঙ্গালীর মোট আমানতের হিসাব করতে হ'লে, অ-বাঙ্গালী ভারতীয়দের এবং বৈদেশিকদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলাতে বাঙ্গালীর যে সব স্থায়ী বা অস্থায়ী আমানত আছে, সেগুলারও হিসাব করা দরকার।

প্রঃ—৫০০টি লোন-অফিস বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রকে নতুন রূপ দিতে বা বাঙ্গালীকে নতুন কিছু শেখার সাহায্য করছে কি ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ৫০০ ব্যাঙ্ক থাকার মানে এই যে অন্ততঃ ৫০০০ জন ডিরেক্টার আছেন এবং এই ৫০০০ জন যৌথ-কারবারের প্রণালীতে কাজ চালাতে আইনতঃ বাধ্য। সভা করতে, হিসাবের খসড়া তৈরী করতে আর সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা হিসাব পরীক্ষা করাতে এরা অভ্যস্ত। আর, এই ৫০০০ জনের সবই উকীল বা জমিদার নন্। এঁদের মধ্যে অনেকেই পাকা ব্যবসাদার, খাঁটি কারবারী লোক, কন্ট্রাক্-

টার, ইঞ্জিনিয়ার, আমদানি-রপ্তানি-কারক ও খুচরা জিনিষের বেপারী। সুতরাং, যৌথ-প্রণালীতে ব্যাঙ্ক চালানোর অভ্যাসটা বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের মজ্জাগত হ'য়ে আস্‌ছে। আর এই অভ্যাসটা ক'লকাতায় বা জেলা-সহরগুলাতেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সর্ব্বত্র, এমন কি, সুদূর পল্লীতেও, তা ছড়াতে আরম্ভ ক'রেছে।

প্রঃ—ব্যাঙ্কগুলা মধ্যবিত্তদের কতটা কাজ যোগায়?

উঃ—একটা ব্যাঙ্ক চালাতে হ'লে ম্যানেজার শুদ্ধ অন্ততঃ ৬।৭ জন লোক দরকার। তা হ'লে ম্যানেজার, হিসাব-নবিস্, পরিদর্শক, কেরাণী প্রভৃতি নিয়ে অন্ততঃ ৩৫০০জন ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী আজ বাংলাদেশে আছে। এদের মধ্যে সবাই গ্র্যাজুয়েট নয়—এটা ধ'রে নিতে পারি। লেখাপড়ায় এদের কৃতিত্ব যাই হোক্ না কেন, এদের সবাই ভদ্রলোকের সন্তান। এরা সবাই ব্যাঙ্কপরিচালনা-তত্ত্বে ও ব্যাঙ্কের বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা কাজে দক্ষ হ'য়ে উঠ্‌ছে। এরা দক্ষ হ'য়ে উঠুক, বা না উঠুক, স্বদেশী আন্দোলনের পর হ'তে যে সব ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হ'য়েছে সে গুলাতে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী মস্তিষ্ক-জীবী যে কাজ পেয়েছে, সে বিষয় ত' সন্দেহ করা যায় না। যুবক বাংলা গত ২৪ বছর যাবৎ নানা নতুন নতুন পেশায় প্রবেশ কর্‌ছে; এর নানা প্রমাণ আছে। ব্যাঙ্ক-ব্যাবসা ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা তাদের একটি।

প্রঃ—বিদেশী ব্যাঙ্কগুলার সঙ্গে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলার শ্রীবৃদ্ধির তুলনা ক'রে দেখেছেন কি? তুলনা কর্‌লে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, না পিছিয়ে যাচ্ছি, বলে মনে হয়?

উঃ—ভারতে যে সব বৈদেশিক ব্যাঙ্ক আছে, সাধারণতঃ সে গুলাকে 'বিনিময়-ব্যাঙ্ক' বলা হ'য়ে থাকে। ১৯০৫ সনে এরা সংখ্যায় ১০টি ছিল আর এদের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি টাকা। আজ এদের

সংখ্যা দাঁড়িয়েছে—১৮, আর এদের মোট আমানতের পরিমাণ হ'য়েছে ৭১৷৷০ কোটী টাকা।

বর্ত্তমানে, অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা মূলধনওয়ালা ২৭টি ভারতীয় ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ—৬০ কোটি টাকা। ১ লক্ষ হ'তে ৫ লক্ষ টাকা মূলধনওয়ালা ৪৬টি প্রতিষ্ঠানকেও এদের সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে; এই ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের আমানতের পরিমাণ প্রায় ৩½ কোটি টাকা। ভারতীয়দের দ্বারা চালিত এই ৭৩টি বড় ও মাঝারি যৌথ-ব্যাঙ্কের মোট আমানত হচ্ছে ৬৩½ কোটি টাকা।

সহজেই বোঝা যায় যে, ১৯০৫ সনে আমানত হিসাবে বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলা ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলার চেয়ে যেরূপ শ্রেষ্ঠ ছিল, এখনও সেই-রকম আছে। কিন্তু, আপেক্ষিক ভাবেই দেখে বোঝা যাবে যে ১৯০৫ সনে ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলার আমানত ছিল যথাক্রমে ১২ ও ১৭ কোটি এই অনুপাতে; আর এখন ওদের আমানতের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৬৩½ ও ৭১½ কোটি—ভারতীয় ব্যাঙ্কের আমানত ৫.২৯ গুণ বেড়েছে; কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কগুলার আমানত কিছু কম (৪.২ গুণ) বেড়েছে। এ থেকে অন্ততঃ এটুকু সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভারতীয়েরা তাদের উন্নতির গতি-বেগটা বজায় রেখেছে। আরও বোঝা যায় যে, বৃদ্ধির দৌড়ে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলা তাদের আরও পেছনে ফেলে চ'লে যায় নি।

ভারতের লোক-সংখ্যা ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ, সুতরাং ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলার আমানত দিয়ে হিসাব করলে মাথাপিছু আমানত দাঁড়াবে —মাত্র ২৲ টাকা। ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলাতে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের যত আমানত আছে, তা এখানে ধরা হয় নি।

প্রঃ—বিলাতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসার সঙ্গে তুলনা কর্‌লে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসার স্থান কোথায় ?

উঃ—১৯২৪ সনে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে (লোক-সংখ্যা—৩ কোটি ৯০ লক্ষ, বাংলাদেশেরও কম) ১৩টি যৌথ-ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক চালিত ৮০০০টি ব্যাঙ্ক অথবা ব্যাঙ্ক অফিস ছিল। এদের আমানতের পরিমাণ ছিল—২০০ কোটি পাউণ্ড, আর এদের মোট পুঁজি ছিল ৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। তা হ'লে প্রত্যেক ইংরেজ সন্তানের ব্যাঙ্ক নিয়োজিত পুঁজি দাঁড়াবে—২ পাউণ্ড ৪ শিলিং (২৯৲ টাকা) এবং আমানত দাঁড়াবে—৫১ পাউণ্ড ৬ শিলিং (৬৮৪৲ টাকা)। বিলাতে প্রতি ৪,৭৭৭ জন লোকের জন্যে একটি ক'রে ব্যাঙ্ক আছে। ব্যাঙ্কের সুবিধা বিলাতে কত বিস্তৃতভাবে ছড়িয়েছে, তা এ থেকে বোঝা যাবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে ব্যাঙ্কের কারবারে বিলাতের উন্নতিই জগতে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। বিলাতী ব্যাঙ্কগুলার কার্য্যকলাপের সঙ্গে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক-প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনা করতে যাওয়া দৈত্যের সঙ্গে বামনের শক্তি পরীক্ষা কর্‌তে যাওয়ার মতই মূর্খামি।

প্রঃ—মার্কিণেরা ব্যাঙ্ক-ব্যাবসাতে কতদূর সাফল্য লাভ করছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আমাদের সাজে কি ?

উঃ—মার্কিণেরা ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে জগতে শ্রেষ্ঠ বটে ; কিন্তু সেজন্যে মার্কিণেরা কতটা উন্নতি ক'রেছে তার হিসাব নিতে ইতস্ততঃ কর্‌বার দরকার নেই। ১৯২৭ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২৭ হাজার ব্যাঙ্ক ছিল। এদের মোট আমানত ছিল—৫৬,৭৩৫,৮৫৮,০০০ ডলার। এর এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে ১০০টি বৃহত্তম ব্যাঙ্কের আমানত। অর্থাৎ ছোট ও মাঝারি সাইজের ব্যাঙ্কের সংখ্যা অগণ্য। যুক্তরাষ্ট্রের লোক-সংখ্যা ১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৬ হাজার। সুতরাং প্রতি ৪৩৩৮ জন লোকের

জন্যে একটি ব্যাঙ্ক-অফিস আছে। ব্যাঙ্কের সুবিধা-বিস্তৃতির তরফ হ'তে যুক্তরাষ্ট্র বিলাত হ'তে সামান্য শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্যান্য দিক্ দেখলে যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্ব বিলাত হ'তেও অনেক উর্দ্ধে। কারণ প্রত্যেক মার্কিণের গড়ে আমানত হচ্ছে—৪৮৪ ডলার (১৩৩১৲ টাকা), এবং ব্যাঙ্কে খাটানো পুঁজি—২৫ ডলার (৬৮৸০ আনা)। (এক ডলার ২৸০ আনা)।

প্রঃ—বিলাত ও যুক্তরাষ্ট্র না হয় আমাদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু ইয়োরামেরিকার অন্যান্য দেশগুলাও কি বিলাত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতই আধুনিক।

উঃ—প্রত্যেক পাশ্চাত্য বা স্বাধীন দেশই বিলাত বা যুক্তরাষ্ট্র নয়। মার্কিণ বা বিলাতী মাপে অনেক ছোট বড় স্বাধীন জাতই "সেকেলে" ব'লে মালুম হবে। তুলনায় সমালোচনার জন্যে ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত আঁক-জোকের খুটিনাটি দিয়ে এখানে আপনাদের বোঝা বাড়াতে চাই না। সবাইকে শুধু এইটুকু লক্ষ্য করতে বলি যে, বিলাত বা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জীবনযাত্রার ধরণধারণ, জাতীয় আয় বা সাধারণ আর্থিক পটুতা বিষয়ে টক্কর না দিয়েও স্বাধীন হওয়া ও "একেলে" হওয়া সম্ভব।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে ইতালির কৃতিত্ব কতদূর? আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ইতালিতে কতদিন হ'ল আরম্ভ হ'য়েছে?

উঃ—ইতালি একটি ইয়োরোপীয় দেশ এবং একটি জবর শক্তিও বটে। কিন্তু ব্যাঙ্ক-কারবারে ইতালির অতীত বা বর্ত্তমানের কীর্ত্তিকলাপ নিতান্তই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

আধুনিক ইয়োরোপে তার প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের জন্যে ও ব্যাঙ্ক কাগজগুলার জন্যে যে, ইতালির নিকট ঋণী, তা সত্য। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবজনিত সামাজিক ওলট-পালটের সময়ে ইতালির সব পুরাণো

ব্যাঙ্কই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেবল মস্তে দেইপাশি নামে একটি "জমি-বন্ধক-ব্যাঙ্ক" বেঁচেছিল। এই ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যণ্ড স্থাপিত হবার বহু পূর্ব্বে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপিত হয়। মোটামুটি ধরা যেতে পারে যে, ইতালিতে আধুনিক ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রতিষ্ঠা ১৮১৫ সনের শান্তিস্থাপনের আগে নয়। বস্তুতঃ, ১৮৪৪—৪৯ সনে জেনোয়া ও টিউরিনের দুইটি ব্যাঙ্কের মিলনে যখন বাঙ্কা নাৎস্যনালে নেল্‌রেগ্নো নামে ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয়, সেই সময় থেকেই ইতালিতে আধুনিক ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রতিষ্ঠা বল্‌লেই ঠিক হয়।

এই ব্যাঙ্কটির নোট জারি কর্‌বার ক্ষমতা ছিল। গবর্ণমেণ্টকে এটি ক্রমাগত ধার দিত। নোটের জন্মে কতখানি ধাতুমুদ্রা রিজার্ভ রাখ্‌তে হবে সেই সম্বন্ধে, এবং নোটকে ধাতুমুদ্রাতে ভাঙ্গাতে বাধ্য কর্‌বার জন্মে ইতালিতে তখন একটি আইন ছিল। এই আইন মানা হ'তে বারবার অব্যাহতি দিয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কের উপকার শোধ দিত। ঐ ব্যাঙ্কের ইতিহাসটি কেবল এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙ্কা নাৎস্যনালে ও এর অগ্রগামী ব্যাঙ্কগুলা অনেকদিন ধ'রে—১৮৪৮, ১৮৫৯, ১৮৬৬, ১৮৬৮ প্রভৃতি সনে—নোটগুলাকে মুদ্রারূপে গণ্য হবার অধিকার ভোগ কর্‌ছিল। ঠিক ঐ ক'টা বছরেই যন্ত্রণাপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনের ভিতর দিয়ে ইতালি স্বাধীনতা ও একত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ইতালির ব্যাঙ্কগুলা ঐ সময়ে যে শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-কারবার চালাতো তাকে স্বদেশী, রাজনৈতিক বা সামরিক ব্যাঙ্কিং বলা চলে। সাধারণ অর্থ-নৈতিক ব্যাঙ্কিং—যা ঝুঁকির যথাযথ বিচার ও মূলধন বিবেচনার সঙ্গে খাটানোর ওপর নির্ভর করে—তার মধ্যে একে গণ্য করা যেতে পারে না।

রিসর্জি মেন্ত (১৮৪৮—১৮৭০) এই যুগটার (মাৎসিনি, গারিবাল্‌দি, কাভুর প্রভৃতির কীর্ত্তিকলাপের জন্মে জাতীয়তার ইতিহাসে এই যুগ

বিখ্যাত) সমস্তটিতে মাত্র ৬টি নোট-ব্যাঙ্ক ছিল। এদের প্রত্যেকটাই রাজশক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা পেয়ে এমন এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক কারবার চালাচ্ছিল, যা আইনবিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর এবং এক কথায় ব'লতে গেলে, অস্বাভাবিক। যে জাতি আইন ও নীতি-সঙ্গত প্রথায় ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রসার চায়, তার পক্ষে ইতালির দৃষ্টান্ত কোনও কাজেই লাগ্‌তে পারে না।

আধুনিক ইতালির প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরেই ১৮৭৪ সনে একটি আইন পাশ হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল—ব্যাঙ্ক-জগতের অরাজকতা দূর ক'রে শৃঙ্খলা স্থাপন করা। কিন্তু কি রিজার্ভ রাখা, কি নোট ভাঙানো—কোন বিষয়েই ১৮৯৩ সন পর্য্যন্ত আইনটি মানাই হ'ত না। ঐ সনে "বাঙ্কা দিতালিয়া" স্থাপিত হয়। ইতালির অন্যান্য সমসাময়িক ব্যাঙ্কগুলার ভিত্তিও ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সনের আগে বিশ বছরে রাজনৈতিক নেতা ও ব্যাঙ্কগুলার লজ্জাকর ঘনিষ্ঠতা দেখা গিয়েছিল। কেবল যে ফরাসী ও অন্যান্য বিদেশী সমালোচকরাই এর নিন্দা ক'রেছেন, তা নয়। পারেত প্রভৃতির ন্যায় নামজাদা ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতরাও এর যথেষ্ট নিন্দা ক'রেছেন। রাজস্ব-সচিবরাও ঐ সব হাঙ্গামায়, এমন কি, হিসাব ও রিপোর্ট গোলমাল করার অভিযোগেও জড়িয়ে প'ড়েছিলেন। ইতালি "ট্রিপ্‌ল্‌ অ্যালায়েন্স" নামক রাষ্ট্র-সন্ধিতে যোগ দিয়েছিল, ফলে যুদ্ধের খরচ অত্যন্ত বাড়্‌তে থাকে। আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে সমরাভিযানগুলাও ব্যর্থ হয়। সুতরাং, ব্যাঙ্কগুলার কাছ হ'তে ধার পাবার জন্যে যা কিছু বে-আইনী ও অর্থ-নীতি-বিরুদ্ধ কাজ চল্‌ছিল, গবর্ণমেণ্ট সেদিকে নজরই দিত না। ঘরবাড়ী, জমিজমা এবং সরকারী পূর্ত্তকার্য্য সম্পর্কিত ঝুঁকিদার ব্যবসাতেও ব্যাঙ্কগুলাকে টাকা খাটাতে দেওয়া হ'ত। ১৮৯৩ সনে বাঙ্কো রোমাণা ফেল মারে ; অন্য ৫টা নোট

ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি হয় নষ্ট হ'য়েছিল, না হয়, এমনভাবে খাটানো হ'য়েছিল যে, তা তুলে নেওয়া অসম্ভব হ'ল।

প্রঃ—ইয়োরোপীয় দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাতেও সমূহ গলদ থাকা যে সম্ভব, তা জেনে আনন্দিত হ'লাম। ইয়োরামেরিকার ব্যাঙ্ক-ব্যবসার ইতিহাস হ'তে আর কোনও মূল্যবান্ কথা শিখ্তে পারি কি ?

উঃ—হ্যাঁ, একটি কথা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য কর্বার যোগ্য। তা এই, ইয়োরামেরিকার নানাদেশে আধুনিক যৌথ-প্রণালীতে চালিত ব্যাঙ্ক-কারবারের আরম্ভের দিক্‌টা, বাংলায় আমরা ব্যাঙ্ক-কারবারের যে অবস্থা এখন দেখ্‌ছি, তার চেয়ে বেশী গৌরবজনক বা আশ্বাসপূর্ণ ছিল না।

কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। বিলাতের ব্যাঙ্কগুলার মোট পুঁজিকে ১ কোটি হ'তে ৪ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত দাঁড় করাতে ৫০ বৎসর (১৮৩৬—১৮৮৬) লেগেছিল। ১৮৪০ সনের কাছাকাছি বিলাতে বৎসরে প্রায় ২৪।২৫টা ক'রে ব্যাঙ্ক ফেল মারতো। ১৮৭০ সনে ১৩৩টা যৌথ কোম্পানীর অধীনে ৯৭০ টার বেশী ব্যাঙ্ক-অফিস ছিল না। অধিকন্তু বিলাতের ব্যাঙ্ক-কারবারে "সীমাবদ্ধ দায়িত্বের" নীতিটা কায়েম কর্‌তে ১৮৫৮ সন পর্য্যন্ত দেরী হ'য়েছিল।

১৮৪৮ সনের আগে ফ্রান্সে আধুনিক যৌথ ব্যাঙ্কিং-এর চিহ্নই পাওয়া যায় না। ১৮৪৮ সনে "কঁতে আর দেস্কঁৎ" স্থাপিত হয়। ১৮৭০ সন পর্য্যন্ত মাত্র ১৯টা দেপৎর্মাঁতে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান (ব্যাঙ্কের প্রধান বা শাখা অফিস) ছিল অর্থাৎ ঐ সময়ে ৭৪টা দেপৎর্মাঁতে কোন ব্যাঙ্কই আদবে ছিল না। কেবলমাত্র ৫।৬টা সহরে একের বেশী ব্যাঙ্ক ছিল। ১৮৭০ সনে প্রুসীয়-ফরাসী যুদ্ধ আরম্ভ হবামাত্র "ক্রেদি লিয়নের" আমানতের শতকরা ৭০ ভাগ এবং "সোসিয়েতে জেনের‍্যালের" শতকরা ৮৫ ভাগ

তুলে নেওয়া হ'য়েছিল। ১৮৭০ সনের কাছাকাছি ফরাসী ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্ব কি ধরণের চীজ ছিল, তা এই দৃষ্টান্ত হ'তেও সম্‌ঝানো চলে।

১৮৫১ ও ১৮৭০ সনের জার্ম্মাণিতে সব কটা যৌথ ব্যাঙ্কের মোট পুঁজি কখন ১০ কোটি মার্ককে (১ মার্ক—৮০ আনা) ছাড়িয়ে যায় নি। ১৮৭০ সনে যে কটা বড় বড় ব্যাঙ্ক নূতন স্থাপিত হয়, তাদের মোট পুঁজি প্রায় ১০ কোটি মার্ক ছিল। অঙ্কগুলা খুব বড়, সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯২৯ সনের বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও কল্পনার পক্ষে ওগুলা ধারণার অতীতরূপে বড় নয়।

তা হ'লে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে, গোটা স্বদেশী যুগটায় যুবক বাংলা ও যুবক ভারত যৌথ-ব্যাঙ্ক কারবারে যা কিছু ক'রেছে, তা পাশ্চাত্ত্য জগতের আধুনিক ব্যাঙ্ক-কারবারের আরম্ভের দিক্‌টার সঙ্গে তুলনায় নগণ্য নয়। আজকাল যে সব অবস্থার জন্যে ফ্রান্স বা জার্ম্মাণি দুনিয়ায় মহাপরাক্রম-শালী হ'য়ে উঠেছে, ১৮৭০ সনে এদের কেউ সেই অবস্থা আয়ত্ত করতে পারে নি। সেই সময়ে ইতালির অবস্থাও এখনকার তুলনায় দুর্ব্বল ছিল। আজকালও ইতালি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি। ১৮৭০ সনে আধুনিক জাপান, জগতে ছিল না বল্লেই হয়। মাত্র ১৮৮৬ সনের কাছাকাছি জাপান আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ও আধুনিক বাণিজ্য ও শিল্পে শিক্ষা-নবিশী সুরু করে।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে জাপানের স্থান কোথায়? জাপানের তুলনায় আমাদের কৃতিত্বের চেষ্টা কিরূপ?

উঃ—১৯২৭ সনে সকল শ্রেণীর জাপানী ব্যাঙ্কের (বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক, সেভিংস ব্যাঙ্ক ও বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যাঙ্ক) মোট আমানত ছিল ১১,৪০৩, ৩৯৯,০০০ ইয়েন এবং মোট আদায়ী পুঁজি ছিল ২০০ কোটি ইয়েন। জাপানের লোক-সংখ্যা ৬ কোটি, সুতরাং জনপ্রতি আমানত ছিল ১৯০

ইয়েন (২৩৮৲ টাকা) এবং পুঁজি ছিল ৩৩ ইয়েন (৪১৲ টাকা)। আজকাল কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,১০০ ; আর এদের শাখার সংখ্যা ৬০০০। তা হ'লে জাপানের প্রত্যেক ৭৪০০ জনের জন্য একটি ক'রে ব্যাঙ্ক-আফিস আছে। বিলাতের ৪,৭৭৭ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬৩৮—এ দুটা অঙ্কের সঙ্গে জাপানের অঙ্কটা তুলনা করা যেতে পারে। তুলনা করলে দেখা যায় যে, কোন কোন দিকে জাপান ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মাকিণ কৃতিত্বের স্তরে পৌচেছে। ৪ কোটি ৭০ লক্ষ বাঙালীর মাত্র ৫০০টি কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পুঁজি নগণ্য—১৲ টাকারও কম। স্থতরাং জাপান বাঙালীর পক্ষে অনেক উঁচুতে।

কিন্তু জাপানের আধুনিক ব্যাঙ্কিং আরম্ভ হ'য়েছে মাত্র ১৮৭২ সনের "জাতীয় ব্যাঙ্কিং আইন" হ'তে। ১৮৭৬ সন পর্য্যন্ত মাত্র ১৫০টি ব্যাঙ্ক ছিল। ১৯০৭ সনে ২,১৯৪টি প্রতিষ্ঠান ও তাদের ৯২১টি শাখা—সবশুদ্ধ ৩১১৫টি ব্যাঙ্ক-অফিস ছিল। এদের মোট আদায়ী পুঁজি ছিল ৪৪৪,২০৪,০৪১ ইয়েন। কুড়ি বছর আগে জাপানের লোক-সংখ্যা ছিল ৫ কোটী। তা হ'লে ১৯০৭ সনে প্রত্যেক জাপানীর ব্যাঙ্ক পুঁজির পরিমাণ ছিল ৯ ইয়েন (১৩৷৷০ আনা)। আজকাল এক ইয়েনের দাম ১।০ আনা। অর্থাৎ আধুনিক জাপানের প্রথম ৩৫ বছরে মাথাপিছু ব্যাঙ্ক পুঁজির পরিমাণ ১৩৷৷০ আনা দাঁড়িয়েছিল। পরের কুড়ি বছরে যে হারে ব্যাঙ্ক পুঁজি বেড়েছিল (১৩৷৷০ আনা হ'তে ৪১৲ টাকা) তার তুলনায় এই বৃদ্ধি নিতান্তই সামান্য। পরিষ্কার মালুম হচ্ছে যে, ১৯০৭ সনে যেমন বাঙালী জাপানের পেছনে ছিল, এখনও তেমনি আছে।

প্রঃ—জগতের প্রধান শক্তিগুলার অবস্থা ত' আলোচনা করা হ'ল। এর ফলে, আমাদের দেশকে কোন্ দিকে এবং কি ভাবে চালাতে হবে, সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব কি ?

উঃ—ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার এই জাতিগুলা আমাদের চেয়ে ৬০।৭০ বছর এগিয়ে গিয়েছে। তবে আরম্ভটা মন্দ হয় নি, আর যে গতিতে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, তাতে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম মাথাওয়ালা বাঙালী ব্যবসাদারেরও বিশ্বাস কর্‌বার অধিকার আছে যে, আমাদের উন্নতি যে কোনও জাতির পক্ষেই গর্ব্বের বিষয়।

যা হোক, মূল নীতিটা অতি পরিষ্কার। ফ্রান্স, এবং ইতালি ও জাপানের অভিজ্ঞতার আলোচনা সকল উদীয়মান জাতিরই চোখ খুলে দেবে। ব্যাঙ্কিং বিদ্যা, কারখানা শিল্পের প্রসার ও ব্যবসা পত্তন প্রভৃতি বিষয়ে "আধুনিক" হ'তে শত শত শতাব্দী লাগে না। ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিক্ষার বিষয়ে জগতে আধিপত্য বিস্তার কর্‌তেও শত শত শতাব্দী লাগে না।

যুবক বাংলা আজ পুঁজি ও শিল্প-শক্তি বাড়াতে উন্মুখ। সেই জন্যে যুবক বাংলার দরকার—জগতের নবীন জাতিগুলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা। যুবক বাংলার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল সে সম্বন্ধে প্রেরণা আহরণ করা সম্ভব হবে, কেবল এই মেলামেশার ভেতর দিয়েই। বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণাটা দূর কর্‌বার জন্যই জাপানী, ইতালীয়, ফরাসী ও জার্ম্মাণদের আর্থিক ক্রম-বিকাশের খবর রাখা, আর ঐ সব জাতির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা-বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো, একান্ত দরকার।

প্রঃ—বাংলায় বাণিজ্য-ব্যাঙ্কিংএর আরম্ভ কিছু দেখা যাচ্ছে কি?

উঃ—বলা হ'য়েছে বাংলায় ৫০০টি লোন-আফিস আছে। জিনিষ বন্ধক রেখে ধার দেবার কারবার এরা কিছু কিছু করে। কিন্তু এদের প্রধান কাজ হচ্ছে জমি ও বাড়ী বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়া। এরা 'জমি বন্ধক ব্যাঙ্কের'ই শ্রেণীভুক্ত। এদের মধ্যে গোটাকয়েক

ব্যবসাতেও টাকা খাটায়। এখন এমন কয়েকটি ব্যাঙ্কও স্থাপিত হ'য়েছে যার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে ব্যবসাতে টাকা খাটানো।

এই যে নতুন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপিত হ'তে স্থরু হ'য়েছে, তার ওপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। ছুনিয়ার মাপকাঠিটি ব্যবহার করলে দেখানো যেতে পারে যে, নানাশ্রেণীর ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম্মের ভেতর এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য-ব্যাঙ্কিংএ হাতেখড়ি ছাড়া কিছুই নয়। ইয়োরা-মেরিকা ও জাপানের বাণিজ্য-ব্যাঙ্কগুলা এবং এদেশের বিদেশী বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলা আরও উচ্চশ্রেণীর ও জটিল কাজে হাত দেয়। নানাশ্রেণীর বিল বেচা-কেনা, "অ্যাক্সেপটেন্স," রি-ডিস্কাউন্ট—ব্যাঙ্ক-ভাষার এই সব অ, আ, ক, খ-ও এখনও বাঙালী আয়ত্ত করে নি। নতুন নতুন শিল্প খাড়া করা, শেয়ারে টাকা খাটানো,—এই সব কাজও আছে। অনেক আধুনিক ব্যাঙ্ক এই সব বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জ্জন ক'রেছে। কিন্তু আমরা এখনও শিশু, ঐ সব বড় বড় ব্যাপারে হাত দেবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। তা হ'লেও, কয়েকটা বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক যে স্থাপিত হ'য়েছে এটা বাংলার ব্যাঙ্ক-বাবসার ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে কার্য্যগত বৃদ্ধির দিক্ থেকে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশা করা যায় যে, আগামী কয়েক বছরে, যে সব নতুন নতুন ব্যাঙ্ক আরম্ভ হবে, সেগুলা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে চলবে।

প্রঃ—লোন অফিসগুলার কয়েকটা উপকারের কথা আগেই ব'লেছেন। ওগুলা থেকে আমরা কি আর কোনও উপকার পাচ্ছি না?

উঃ—এরা বাঙালীর আর্থিক জীবনের একটা অভাব পূরণ ক'রেছে। এদের সাহায্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাঙালীদের ব্যাঙ্কে আমানত রাখার অভ্যাস বাড়ছে। জমিদাররাও লোন-অফিসে জমি বাঁধা রেখে টাকা সংগ্রহ করতে পারে; সুতরাং তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখাও

এদের সহায়তায় সম্ভব হ'য়েছে। কিন্তু লোন-আফিসগুলার টাকা যথার্থই লাভ-জনক কাজে খাটানো হচ্ছে কি না, তা ব্যবসায়ী মহলে আলোচনার যোগ্য।

প্রঃ—বাংলার ব্যাঙ্কগুলাকে এখন কোন্ কোন্ দিকে উন্নত করা দরকার ?

উঃ—ইয়োরামেরিকার ইতিহাস হ'তেই এর উত্তর পাওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনীতিতে দখল পেতে হ'লে, ইয়োরামেরিকার ১৮৫০ হ'তে ১৮৭৫ এবং জাপানের ১৮৭৫ হ'তে ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় তুলনা-সহায়ক অঙ্কগুলার মত মুল্যবান্ আর কিছুই নেই। ঐ তারিখগুলায় জগতের প্রধান প্রধান জাতের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় সংখ্যাগুলা আলোচনা করলেই আমাদের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের গলদ্‌গুলা ধরা পড়্‌বে। আর এই তুলনামূলক আলোচনা হ'তেই খুব পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে যে, ব্যাঙ্কের সংখ্যার দিক্ হ'তে দেখ্‌তে গেলে, বাঙালীকে এখনও অনেকটা পথ অগ্রসর হ'তে হবে। সংখ্যার দিকে বৃদ্ধির সম্ভাবনা অসীম বল্লেও চলে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের নানা শ্রেণীর কাজ-গুলার তরফ হ'তে আলোচনা ক'রলে বলা চলে যে, বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান-গুলা সবেমাত্র নব-জীবনের হাতেখড়ি সুরু ক'রেছে। ব্যাঙ্কের কার্য্যগত বৃদ্ধির জন্য অসংখ্য পরীক্ষা ও অসংখ্য দুঃসাহসিক্ কাজের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। আমাদের আর একটি তৃতীয় গলদ্ আছে। কি 'তাত্ত্বিক', কি 'কাজের লোক', এটি সকলেরই নজর এড়াতে পারে। কিন্তু, তুলনা সহায়ক সংখ্যাগুলা এই দোষটা বিশেষ ক'রেই দেখিয়ে দেয় এবং বৃদ্ধির নতুন দিকটাও নির্দ্দেশ করে। আমি ব্যাঙ্কগুলার গড়ন-গত দোষগুলার কথাই বলছি। আজ আমরা যৌথ কারবার, অসীম, দায়িত্ব এবং যৌথ কোম্পানীর সাহায্যে ব্যবসা চালানো—এ সব ব্যাপারে যে

অভ্যস্ত হচ্ছি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যবসা পরিচালনার একটি প্রধান নীতি আমাদের আর্থিক ধুরন্ধরেরা এখনও দখল করতে পারেন নি। চাষের কাজে যেমন জমির টুকরা একটি নির্দ্দিষ্ট মাপের চেয়ে ছোট হ'লে লাভ পাওয়া সম্ভব হয় না, তেমনি প্রত্যেক ব্যবসারও একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ আছে, যার চেয়ে ছোট হ'লে লাভ থাকতে পারে না—এই কথাটি তাঁদের মনে রাখ্‌তে হ'বে। আরও মনে রাখ্‌তে হ'বে যে, ব্যাঙ্কগুলা সম্বন্ধে এই মাপটি বেশ উঁচু। আজ যে দুনিয়া হ'তে কুটির-শিল্প বিলীন হচ্ছে তার একটা প্রধান কারণ—ব্যবসার বহর সম্বন্ধীয় উক্ত আইনটি। কারবারগুলা লাভ-জনক করতে হ'লে সেগুলার মাপ বেশ বড় হওয়া চাই। যদি তারা এই মাপের চেয়ে ছোট হয়, তা হ'লে তারা প্রকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একক ব'লে গণ্য হ'তে পারে না। "ছোট ছোট জোতগুলা" নেহাৎ ছোট হ'লে চলবে না।

বর্ত্তমান বাংলার ধনদৌলতের পরিমাণও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক্ হ'তে ব্যাঙ্কগুলা ঠিক কত বড় হ'লে "আর্থিক একক" ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে, তা বলা শক্ত। এই বছরে জাপানীরা একটা নতুন আইন ক'রেছে—তাতে এই নিয়ম করা হ'য়েছে যে, যে প্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ ৫ লক্ষ হ'তে ২০ লক্ষ ইয়েন আদায়ী পুঁজি নেই, তাকে ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে নাম্‌তে দেওয়া হ'বে না। তবে, আমাদের দেশে এই কথাটার ওপর এখন বিশেষ জোর দেবার দরকার নেই। কারণ জাপান ইতিমধ্যেই ইয়োরামেরিকার স্তরে উঠেছে।

প্রঃ—অন্যান্য দেশে ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীকরণ কি রকম চলেছে? এদেশের ব্যাঙ্কগুলার কেন্দ্রবদ্ধ হওয়া এখন দরকার আছে কি? যদি দরকার হয়, তা কি শ্রেণীর হ'বে? তার উদ্দেশ্যই বা কি হওয়া উচিত?

উঃ—ইয়োরামেরিকা ও জাপানে, অবস্থার চাপে প'ড়ে ছোট ছোট

ব্যাঙ্কগুলা তাদের স্বার্থ কেন্দ্রীভূত ক'রে বড় বড় ব্যাঙ্কে পরিণত হ'তে বাধ্য হ'য়েছে। এই কেন্দ্রীকরণের ফলে, তাদের আর্থিক সংস্থান বেড়েছে। ঝুঁকি বইবার ক্ষমতাও বেড়েছে। একীককরণ, মিলন, স্বার্থ সঙ্ঘর্ষের লোপ সাধন, ট্রাষ্ট বা কার্টেল-স্থাপন—যে নামই ব্যবহার করা যাক্ না কেন—দুনিয়া আজ কেন্দ্রীকৃত ও সঙ্ঘবদ্ধ পুঁজি-প্রতিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পুঁজির পরিমাণ যত বেশী, আধুনিক দুনিয়ায় সফল হবার সম্ভাবনাও তত বেশী। দুনিয়ার উন্নতিশীল জাতি ক'টার গত ৫০ বৎসরের ইতিহাসের মূল কথাটাই এই। অন্যান্য দিকে "বৃহৎ কারবার" যেমন একান্ত আবশ্যক জিনিষ ব'লে গণ্য হ'য়েছে, তেমনি ব্যাঙ্কের একীকরণও একান্ত দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। এটাও লক্ষ্য করা দরকার যে, আজকাল "যুক্তিযোগে"র নামে কেন্দ্রীকরণের আন্দোলন বিশেষ বল পেয়েছে—এমন কি, এটা শিল্প-বাণিজ্য জগতে বিপ্লব এনে ছেড়েছে।

বাংলাদেশের ব্যাঙ্কগুলাকে এমন সব কর্ম্মকৌশলের কথা ভাব্‌তে হবে, যাতে আমাদের লোকসান সইবার ক্ষমতা; আর দরকার হ'লে আরও ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা বাড়্‌তে পারে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের শক্তির বৃদ্ধি ঘট্‌তে পারে, আর পুঁজিওয়ালা ও ব্যবসাদারদের বিশ্বাস বাড়্‌তে পারে। তাদের সংস্থানগুলা বুদ্ধিমানের মত খাটাতে হবে, আর ১৯২৯ সনে জগতে প্রচলিত কেন্দ্রীকরণ যদি সম্ভব না হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ পাদে যে শ্রেণীর কেন্দ্রীকরণ প্রচলিত ছিল, অন্ততঃ সেই শ্রেণীর কেন্দ্রীকরণ অবলম্বন কর্‌তে হবে।

ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীকরণের দিকে গত তিন চার বৎসর ধ'রে আমি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ছি। আমার একান্ত বিশ্বাস এই যে, নিছক ব্যবহারিক কাজের চাপেই বাধ্য হ'য়ে আমাদের কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানগুলা ছোট ছোট কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ গ'ড়ে তুল্‌বেই।

প্রাঃ—ব্যাঙ্কগুলার ভেতর মিলন সাধিত হবে কাতে কাতে ?

উঃ—যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যে ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক মিল বা লেন-দেন আছে।

কোন্ জেলার কোন্ ব্যাঙ্ক সেই জেলা বা অন্য কোন জেলার কোন্ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হবে, তা একজন "বাইরের লোকের" (তিনি "বিশেষজ্ঞই" হোন বা "নামজাদা দেশভক্ত"ই হোন) পক্ষে ব'লে দেওয়া সম্ভব নয়। কারবারের অভিজ্ঞতা, কারবারের রীতি-নীতি এবং আগেকার লেন-দেন এইগুলাই কোন্ ব্যাঙ্কের সঙ্গে অপর কোন্ ব্যাঙ্কের মিলন ঘটবে, তা নিয়ন্ত্রিত করবে। যে ভাবেই কেন্দ্রীকরণ ঘটুক না কেন, এর প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত—প্রথমতঃ, মূলধন বৃদ্ধির দিকে এবং দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস বাড়াবার দিকে।

প্রঃ—আগামী ৫।৭ বছর কোন্ কোন্ দিকে আমাদের চেষ্টা চালানো দরকার, তা সংক্ষেপে বলতে পারেন ?

উঃ—বাঙলার ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাদের কর্ম্মক্ষেত্রও প্রসারিত করতে হবে। ব্যাঙ্ক-পরিচালনা-কর্ম্ম-কৌশলে (কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের পরিচালনাই হোক বা ব্যাঙ্কগুলার পরস্পরের সম্বন্ধ-সম্পর্কিত পরিচালনাই হোক), আমাদের আরও অগ্রসর হ'তে হবে। আগামী ১০ অথবা ২৫ বছর নানা বাধার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার সকল দিকেই আমাদের উন্নতি করতে হবে। এই রকমে সজ্ঞানে ও বর্ত্তমানের বাধাগুলা পরিষ্কাররূপে জেনে নিয়ে বাঙলাকে নিকট ভবিষ্যতের কার্য্য-প্রণালী স্থির করতে হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি কথা ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। যুবক বাংলার সাধনা হচ্ছে—জগতের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্বের

অধিকারী হওয়া। কিন্তু বর্ত্তমানের উৎকট সত্যগুলা আমরা না দেখে পারি না। আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের প্রথম পথপ্রদর্শকেরা ১৮৮৬ বা ১৮৭০ সনের কাছাকাছি যে উন্নতি লাভ ক'রেছিলেন, ব্যাঙ্ক ব্যবসাতে (সংখ্যা, কাজ-কর্ম্ম ও গড়নের দিক্ হ'তে) আমাদের বর্ত্তমান কীর্ত্তি তারই কাছাকাছি। তা হ'লেও, আমাদের উন্নতির বেগ বজায় থাক্‌বে ও বাড়বে আর আগামী ২৫ বছরের মধ্যে আমরা শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে প্রধান দেশগুলার নাগাল ধর্‌তে পারবো অথবা কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো—এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারি।

বৃটিশ শিল্প-প্রদর্শনীর জন্ম-কথা

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের বাজারে নানা বিদেশী জাতি ভাগ বসিয়েছিল। বিলাতের জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট যে এ কথা জান্‌তো না, তা নয়। তা সত্ত্বেও শিল্প-প্রসারের জন্যে গবর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করেন নি। শিল্পের উন্নতি আপনা আপনি হবে—শিল্পের স্বাধীন বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কর্‌বার অধিকার নেই—এই নীতিই বিলাতের ভোটারদের ও গবর্ণমেণ্টকে পেয়ে ব'সেছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর বিলাতের লোকের ভাল ক'রে চোখ ফুট্‌লো। শিল্প-ক্ষেত্রে বিলাত অন্যান্য দেশের ওপর কতকটা নির্ভরশীল হ'য়ে প'ড়েছিল, তা বেশ বোঝা গেল। কামান তৈয়ারীর জন্যে, কল, রং এমন কি, খেলনার জন্যেও বিলাত পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে প'ড়েছিল।

অবস্থা গুরুতর বুঝে বোর্ড অব্‌ ট্রেড উঠে প'ড়ে লাগলো। লর্ড মোলটন ও অন্যান্য কয়েকজনের চেষ্টায় রং ও বিস্ফোরক তৈরীর বন্দোবস্ত হ'ল। অন্যান্য যে সব জিনিষ অত্যন্ত আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছিল, সেগুলা প্রস্তুতের জন্য কয়েকটা কোম্পানী ভার নিল।

শিল্প-জগতে, বিলাতের যখন এই অবস্থা, তখন বৃটিশ শিল্পপ্রদর্শনীর জন্ম হ'ল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের ব্যবসায়ীরা লাইপৎসিগের মেলায় গিয়ে জিনিষপত্র পছন্দ ক'রে অর্ডার দিত। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, পণ্য-নির্ম্মাতাদের সঙ্গে সম্পর্কে আসা তাদের পক্ষে দুরূহ হ'ল। "টাইমসে" এই সময়ে একটি পত্র বেরোয়। তাতে প্রস্তাব করা হয় যে, ক্রেতাদের সঙ্গে বিলাতের পণ্য-উৎপাদকদের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি মেলা

স্থাপনের চেষ্টা গবর্ণমেণ্টের করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন।

যুদ্ধের পর বিলাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নতুন কারখানা দেখা দিয়েছিল। পণ্য সম্বন্ধে বিদেশের ওপর নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। একটি শিল্পপ্রদর্শনী খুল্‌লে এই সব উৎপাদকদের উৎসাহিত করা সম্ভব হবে—গবর্ণমেণ্ট এ কথাটাও ভেবে দেখেছিল।

প্রদর্শনী-স্থাপনের জন্য বোর্ড অব্ ট্রেডের "বাণিজ্যসংবাদ" বিভাগের জনকয়েককে ভার দেওয়া হ'য়েছিল। তাঁরা যে রকম উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে খেটেছিলেন, তা সত্যই বিরল। কর্ম্মীদের মধ্যে জনকয়েক স্বেচ্ছা-সেবকও ছিল, তবে বেশীর ভাগই বিলাতের সিবিল সার্ভিসের লোক। যাঁরা প্রদর্শনী-স্থাপনের জন্য খেটেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিলাতের বাণিজ্য-বিস্তারে বিশেষ কাজ দেখাচ্ছেন।

১৯১৫ সনের মে মাসে ইসলিংটন সহরের কৃষি-ভবনে এই প্রদর্শনী প্রথম খোলা হয়।

বিলাতে উৎপন্ন হয় নি এমন পণ্য প্রদর্শনীতে আদৌ স্থান পায় নি। যে সব পণ্য পাঠানো হ'য়েছিল, তা সত্যই বিলাতে উৎপন্ন হ'য়েছিল কি না, তা পরখ কর্‌বার জন্যে শিল্প-প্রদর্শনীর কর্ম্মচারীরা পণ্য প্রদর্শক-দের কারখানাগুলা পরিদর্শন কর্‌বার ক্ষমতা পেয়েছিল।

প্রথমবারের প্রদর্শনীতে যে সব জিনিষ দেখানো হয়, সেগুলা বর্ত্তমানের উৎকর্ষে পৌঁছতে পারে নি, এ কথা সত্য। তা হ'লেও নানাশ্রেণীর এত পণ্য সংগ্রহ করা হ'য়েছিল যে, তাতে বিস্মিত না হ'য়ে থাকা যায় না।

প্রথমবারের প্রদর্শনীর শেষ দিনে পণ্য-প্রদর্শকরা বোর্ড অব ট্রেডের

প্রেসিডেণ্টকে একটি ভোজ দেয়। সেই ভোজে তারা প্রস্তাব করে যে, শিল্প-প্রদর্শনীটিকে একটি বার্ষিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হোক্। প্রেসিডেণ্ট মহাশয় এই প্রস্তাবে সম্মত হন।

যুদ্ধের সময় প্রতি বৎসরে প্রদর্শনী খোলা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রথমতঃ, সকল শিল্পকেই এই সময় গবর্ণমেণ্টের নানা আইনকানুন মেনে চল্‌তে হ'ত; দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সব বাড়ীগুলাই গবর্ণমেণ্ট সামরিক কাজে লাগাতে স্থরু করেন। যা হোক্ প্রদর্শনী কোন বছর বন্ধ থাকে নি। ১৯১৬ ও ১৯১৭ সনে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শনী বসে। ১৯১৮ সনে লণ্ডনের ডকগুলার কাছে একটি মাল্‌গুদামে খোলা হয়; ১৯২০ সনে 'ক্রিষ্টাল প্যালেসে'; ১৯২১ সনে—'হোয়াইট সিটি'তে।

১৯২০ সনে 'বার্মিংহাম বিভাগ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। এই বৎসর হ'তে মেলা একই সময়ে বার্মিংহাম ও লণ্ডনে ব'সতে থাকে। ১৯২৪ সনে লণ্ডনের ওয়েম্বলি পল্লীতে বিরাট সমাজ প্রদর্শনী খোলা হয় ব'লে বৃটিশ শিল্পপ্রদর্শনীটি নিতান্ত নগণ্য ব'লে মনে হয়। ১৯২৫ সনে প্রদর্শনী কেবল বার্মিংহামেই ব'সেছিল, লণ্ডনে বসে নি।

১৯২৬ সনে গবর্ণমেণ্ট প্রদর্শনীর সাহায্যের জন্ম ২৫ হাজার পাউণ্ড দিয়েছিলেন; , ঐ বছর প্রদর্শনীর কথাটা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে চারিদিকে আরও ছড়ানো হয় এবং ষ্টলের ভাড়া আরও কমানো হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর জনসাধারণকে প্রদর্শনীতে ঢুক্‌তে দেওয়া হ'ত না, তারা অনেক সময়ে পণ্য-প্রদর্শকদের টিকিট নিয়ে লুকিয়ে ঢুক্‌তো। ১৯২৬ সন হ'তে কিছু ফি নিয়ে সন্ধ্যাবেলা তাদের, ঢুক্‌তে অনুমতি দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যের মালপত্রও মাত্র এই সনে প্রথম ঢোক্‌তে পায়।

বলা হ'য়েছে যে, মেলার দুটি বিভাগ। কিন্তু একই জিনিষ এই

দুটিতে স্থান পায় না। হাল্কা জিনিষ—যেমন চীনামাটী ও কাচের জিনিষ, কাগজ, চামড়া, খেলনা, রং, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি—লণ্ডনে দেখানো হয়। ভারি জিনিষগুলা (লোহালক্কড়, বাড়ী তৈরী মালপত্র, বৈদ্যুতিক, এঞ্জিনিয়ারিং ও খনি-খনন সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি) বার্মিংহামে দেখানো হয়।

বিলাত গবর্ণমেণ্টের "ওভারসীজ ট্রেড" (বৈদেশিক বাণিজ্য) বিভাগটি লণ্ডন বিভাগের ভার নিয়ে থাকে। বার্মিংহাম চেম্বার অব কমার্স ও বার্মিংহাম কর্পোরেশান (ওভারসীজ ট্রেড বিভাগের অধীনে) বিভাগটি চালিয়ে থাকে।

বার্ম্মিংহাম চেম্বার অব কমার্স

বার্ম্মিংহাম বাণিজ্য-ভবনটি অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ১৭৮৩ সনের ১৫ই জুলাই তারিখে বার্ম্মিংহাম সহরের অধিবাসীরা একটা সভাতে একটা কমিটি গঠন করে এবং সেই কমিটীকে একটি বণিক্-সভা গঠনের ভার দেয়। কমিটীর চেষ্টার ফলে, জেনারল কমার্শ্যাল কমিটী, নামে একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া হয়। ১৭৯০ সনে এই প্রতিষ্ঠানটি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং তার স্থানে একটি 'কমার্শল সোসাইটি' স্থাপন করা হয়।

১৮১৩ সনের ২১শে জুলাই তারিখে সহরবাসীদের একটি সভায় একটি বাণিজ্য-ভবন-গড়্বার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের ফলে যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সেইটাই বর্ত্তমান "বার্ম্মিংহাম চেম্বার অব্ কমার্সে"র যথার্থ পূর্ব্বপুরুষ। ১৯১৩ সনে বাণিজ্য-ভবনের শত বর্ষ পূর্ণ হ'য়েছে। বাণিজ্যভবনের প্রথম শতবর্ষের ইতিহাস শ্রীযুক্ত জি হেনরি রাইট প্রণীত "ক্রনিকল্স্ অব দি চেম্বার (৭০০ পৃষ্ঠা) নামক গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বাণিজ্য-ভবনটি পুনর্গঠিত হয়। এই সময়েই একটি পূরা সময়ের মাইনে-করা সেক্রেটারী প্রথম নিযুক্ত করা হয়।

বর্ত্তমানে এর সভ্যের সংখ্যা ৩০০০। এটি বিলাতের দ্বিতীয় বৃহত্তম চেম্বার।

১৯০৩ সনে এর পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সাহায্যে বাণিজ্য-ভবনের কাউন্সিলের সঙ্গে সভ্যদের ঘনিষ্ঠতা রক্ষিত হয়।

বিদেশে পত্রিকাটির যথেষ্ট কাটতি ব'লে এর সাহায্যে বিদেশে বার্ম্মিংহামের মালেরও কাটতি বাড়ে।

১৯০৫ সনে চেম্বারের 'কমার্শ্যাল ইয়ার বুক' (বাণিজ্য বার্ষিকী) প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময় থেকে প্রতি বছরই এটি প্রকাশিত হচ্ছে। বার্ষিকীতে নানাশ্রেণীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বাণিজ্য-ভবনের সভ্যেরা কি কি জিনিষের ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তার বিবরণও স্থান পায়। জগতের সর্ব্বত্রই এর কাটতি। এর সাহায্যে বার্ম্মিংহামের ব্যবসা যে বেড়েছে, তার নানা প্রমাণ আছে।

বাণিজ্য-ভবন আর একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বের ক'রেছে। তার নাম—'অফিসিয়াল গাইড টু বার্ম্মিংহাম (বার্ম্মিংহাম-প্রদক্ষিণের সহায়)। ইতিমধ্যেই গ্রন্থখানির তিনটি সংস্করণ হ'য়েছে।

বাণিজ্য-ভবনের প্রধান উদ্দেশ্য—কল-কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন। সভ্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত একটি কাউন্সিল বাণিজ্য-সভার কাজ-কর্ম্ম চালিয়ে থাকে এবং সরকার, পাল্যার্মেণ্ট, রেল কোম্পানী প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবসাদারদের হ'য়ে কথাবার্ত্তা চালিয়ে থাকে। আলোচনার সুবিধার জন্যে কাউন্সিল কয়েকটা স্থায়ী কমিটির সাহায্য নিলেও সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার ভার নিজের হাতেই রেখেছে।

বাণিজ্য-ভবনটি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয় না; কেবল যেসব আইন-কানুন ব্যবসায়ীদের স্বার্থের বিরোধী, সে গুলাকে বাধা দেয়, আর যেগুলা তাদের স্বার্থের অনুকূল সেগুলা পাশ করাবার চেষ্টা করে।

দুনিয়ার সব দেশেই কোথায় কি রকম আইন-কানুন হচ্ছে, বা আমদানি শুল্কের কিরূপ পরিবর্ত্তন হচ্ছে এবং বিলাতের ব্যবসাদারদের স্বার্থের ওপর সেই সব আইন-কানুন ও আমদানি-শুল্কের প্রভাব কি রকম

সে সম্বন্ধে বাণিজ্য-ভবন রীতিমত অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে থাকে।

১৯১৫ সন হ'তে বিলাতে প্রতি বৎসর একটি বিরাট শিল্প-প্রদর্শনী বসেছে। এর এক ভাগ বসে বার্ম্মিংহামে, আর এক ভাগ লণ্ডনে। বার্ম্মিং-হাম বিভাগটি প্রধানতঃ বার্ম্মিংহাম বাণিজ্য-ভবন কর্তৃকই চালানো হ'য়ে থাকে।

ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘবদ্ধতা আধুনিক আর্থিক জীবনের একটি প্রধান ব্যাপার। ব্যবসায়ী সঙ্ঘগুলা কি রকম ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে, তা ওপরের দৃষ্টান্ত হ'তেই বোঝা যাবে। ১৭৮৩ সন হ'তে চেষ্টা স্রুরু হয়। তারপর নানা পরিবর্ত্তনের পরে ১৮১৩ সনে—অর্থাৎ ৩০ বৎসর পরে—বাণিজ্য-ভবনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হ'ল। প্রতিষ্ঠা ১৮১৩ সনে হ'লেও, রীতিমত সেক্রেটারী নিযুক্ত হ'ল ১৯০২ সনে—অর্থাৎ আরও ৮৯ বৎসর পরে।

একটি বাণিজ্য-ভবন যে কেবল ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে নয়—সেটি যে লেখাপড়ারও একটি প্রধান আড্ডা—দুনিয়ার নানা স্থানের খবরাখবর সংগ্রহ ও তার চর্চ্চা করা, পত্রিকা ছাপানো, বই প্রকাশ করা—এগুলাও যে বাণিজ্য-ভবনের কাজের মধ্যে, তাও লক্ষ্য করবার বিষয়।

জার্ম্মাণ মজুরদের "কর্ম্ম-সভা"

আমরা জানি যে মজুরেরা নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যে ট্রেড্-ইউনিয়ন গ'ড়ে থাকে। ট্রেড-ইউনিয়নের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াতে তারা একজোটে কাজ কর্‌তে পারে। তা ছাড়া, বেকার বা রুগ্ন অবস্থায় মজুরদের সাহায্য করা ধর্ম্মঘটের সময় মজুরদের চালানো, মজুরদের হ'য়ে মনিবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া—এ সব কাজও ট্রেড-ইউনিয়ান ক'রে থাকে।

ইয়োরামেরিকার নানা দেশে মজুর-সঙ্ঘ বা ট্রেড-ইউনিয়ানের অস্তিত্বের কথা আমরা অবগত আছি। ভারতবর্ষেরও ট্রেড-ইউনিয়ান আছে, তা আমরা জানি; কিন্তু জার্ম্মাণি কেবল মামুলি ট্রেড-ইউনিয়ান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে নি। জার্ম্মাণি আরও এক ধাপ অগ্রসর হ'য়েছে।

১৯২০ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী জার্ম্মাণিতে এক নতুন আইন জারি হয়। তদনুযায়ী, অন্ততঃ ২০ জন মাইনে পাওয়া লোক নিযুক্ত করে; এ রকম প্রত্যেক কর্ম্মকেন্দ্র—তা সে আফিস, ব্যাঙ্ক বা ফ্যাক্টরী বা আর যা কিছু হোক্ না কেন—একটি করে "কর্ম্মসভা" কায়েম কর্‌বার নিয়ম হয়। কর্ম্ম-সভার সভ্যেরা কর্ম্মকেন্দ্রের মজুরদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হবে, স্থির হয়। আইনানুসারে কর্ম্মসভার একতিয়ারটা এ রকম:—(১) কর্ম্ম-কেন্দ্রের পটুতা বাড়াবার জন্যে মনিবেদের পরামর্শ দেওয়া; (২) মজুরদের অভিযোগ মেটাতে চেষ্টা করা এবং মনিবে মজুরে যাতে সংঘর্ষ না বাধে, তার জন্যে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা; (৩) মজুরদের সম্বন্ধে আপোষে মীমাংসা ক'রে যা কিছু স্থির হ'য়েছে, তা কাজে লাগানো; (৪) মনিব-পক্ষ কর্ত্তৃক প্রস্তুত কর্ম্মকেন্দ্রের নিয়মাবলীতে সম্মতি জানানো; (৫) কারখানার

ভেতর মজুররা যাতে নিরাপদে ও স্বাস্থ্যের হানি না ক'রে কাজ কর্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা করা; (৬) মজুর-মঙ্গল সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলা সম্পাদন করা।

এতদ্ব্যতীত কর্ম্মসভার অন্যান্য কাজও আছে। মজুররা যেখানে ট্রেড-ইউনিয়ানের সহায়তায় মনিবদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চুক্তি ক'রেছে, সেখানে চুক্তি ঠিক পালন করা হচ্ছে কি না, তা দেখা কর্ম্মসভার অন্যতম কাজ। যেখানে চুক্তি নেই সেখানে কর্ম্মসভা চুক্তি কর্‌তে চেষ্টা করে। মনিবরা যাতে অসঙ্গত কারণে মজুরদের না তাড়িয়ে দেয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখাও কর্ম্মসভার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

দেখা যাচ্ছে যে, কর্ম্ম-সভা জিনিষটা ট্রেড-ইউনিয়ান হ'তে অনেকটা তফাৎ। ট্রেড-ইউনিয়ানের সহায়তায় মজুররা কর্ম্ম-কেন্দ্রের বাহির হ'তে তাদের প্রভাব জারি কর্‌তে চেষ্টা করে। কিন্তু কর্ম্মসভা স্থাপনের ফলে, মজুররা তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সাহায্যে, কারখানা ব্যাঙ্ক প্রভৃতির শাসনের ভেতরকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর্‌তে অধিকারী হয়।

ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর জার্ম্মাণির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে মহা বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কর্ম্মসভাগুলার জন্ম। প্রথমে কমিউনিষ্টরা কর্ম্ম-সভাগুলাকে নিজ আয়ত্তে এনে ট্রেড-ইউনিয়ান-আন্দোলনের বিরোধী একটা আন্দোলনের সৃষ্টি কর্‌বার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কর্ম্ম-সভাগুলার ওপর ট্রেড-ইউনিয়ানের প্রভাব বজায় থাকে। ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ ক্রমাগতই বাড়্‌ছিল। এই সময়ে বাজার-দর চড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার বাড়িয়ে নেওয়া কর্ম্ম-সভাগুলার একটা প্রধান কাজ ছিল। ১৯২৩ সনের নভেম্বর মাসে সোনার সঙ্গে

কাগজী মুদ্রার সম্বন্ধ একটা বিশেষ হারে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয় এবং কাগজী মুদ্রার পরিমাণও কমানো হ'তে থাকে। এর ফলে অনেক ফ্যাক্টরী ফেল মারতে থাকে। বেকারের সংখ্যা খুব বাড়ে, ট্রেড-ইউনিয়ানের সভ্যের সংখ্যা ক'মে যায়। অনেকগুলা কর্ম্ম-সভারও পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। ১৯২৫ সনে ট্রেড-ইউনিয়ানগুলা আবার জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। ঐ বৎসরের শেষে বড় বড় প্রতিষ্ঠান-সমূহে কর্ম্ম-সভাগুলা বেশ কাজ কর্‌ছিল। কিন্তু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে তাদের সংখ্যা আরও ক'মে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের আফিসগুলাতে ওরা একেবারেই লোপ পায় বল্‌লেও চলে।

কর্ম্ম-সভার সাহায্যে মজুররা অনেক কিছুই কর্‌তে পার্‌বে, আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, কার্য্যতঃ তা ঘটে ওঠে নি। মজুররা ক্রমেই কর্ম্ম-সভাগুলাতে বিশ্বাস হারাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা কর্ম্ম-সভার প্রতিনিধিদের আদৌ নির্ব্বাচিতই কর্‌ছে না।

এরূপ ঘট্‌বার নানা কারণ আছে :—(১) কর্ম্মসভাস্থ মজুর-প্রতিনিধি-দের জোর অনেকটাই নির্ভর করে, তাদের নিজেদের ওপর নয়, কিন্তু মজুররা কর্ম্মকেন্দ্রের বাহিরে কতদূর সঙ্ঘবদ্ধ, তার ওপর ; অর্থাৎ যে সব মজুর শক্তিশালী ট্রেড-ইউনিয়ানে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নি, তারা কর্ম্ম-সভায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধা কর্‌তে পারে না ; (২) মজুর-প্রতিনিধি ও মনিবে মিলে মিশে সব ক্ষেত্রে কাজ কর্‌তে পারে না। যেখানে দুই দিকেই সহযোগিতার সঙ্গে কাজ কর্‌বার একটা আন্তরিক ইচ্ছা আছে, কেবল সেইখানেই পরামর্শ ক'রে কাজ চালানো সম্ভব হ'য়েছে ; (৩) যে সব মজুর কর্ম্মসভার জন্যে নির্ব্বাচিত হয়, তাদের কাজ চালানোও বড় সহজ নয় ; যদি তারা বেশী বিক্রম না দেখায়, তা হ'লে মজুররা তাদের ভীরু বলে; আর যদি বেশী বিক্রম দেখায়, তা হ'লে

মনিবরা তাদের শত্রু ব'লে গণ্য করে ; (৪) মজুর-প্রতিনিধিদের ওপর আইন যে সব কাজ চাপিয়েছে, সে সব কাজ কর্বার জন্যে যেরকম জ্ঞান ও শিক্ষা থাকা দরকার, তা তাদের অনেকেরই নেই ; কর্ম্ম-সভা প্রণালী ভাল ক'রে কাজ না করবার এটিও কারণ।

ব্রজেন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক মতামত

[স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে বর্ত্তমান গ্রন্থকারের অর্থনীতি সম্বন্ধে যে কথোপকথন হ'য়েছিল, তার মর্ম্ম এই—]

প্রঃ—এখন কি বিষয়ে গবেষণা করা আপনার মতে সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত ?

উঃ—বাংলার পাট একটা মস্তবড় জিনিষ, এই নিয়ে যদি অনুসন্ধান চালানো যায়, তবে একটা বড় কাজ হয়।

প্রঃ—কি রকমভাবে অনুসন্ধানে চালাতে বলেন ?

উঃ—তিনটে দিকে অনুসন্ধান চালাতে হবে। প্রথমতঃ, উৎপাদন সম্বন্ধে। চাষাদের পাট তৈরী কর্‌তে কত খরচ পড়ে, কত দরে এবং কাদের কাছে তারা বেচে, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর্‌তে হবে। দ্বিতীয়তঃ, ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে অনুসন্ধান। ফ্যাক্টরীতে মজুরা কি রকম ভাবে থাকে, কত রোজগার করে, কি রকম ব্যবহার পায় ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, বাজার সম্বন্ধে অনুসন্ধান। আমাদের দেশের কাঁচা পাট, চট ইত্যাদি কাদের হাত দিয়ে জগতের কোন্ কোন্ দেশে কত দরে বেচা হয়, সে বিষয়েও খোঁজ নিতে হবে।

প্রঃ—বই ও রিপোর্টে এ সব খবর পাওয়া সম্ভব হবে কি ?

উঃ—পাটকলগুলার বার্ষিক রিপোর্টগুলা থেকে কিছু কিছু সহায়তা হবে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ খবরই ঘুরে সংগ্রহ কর্‌তে হবে। পাটকলের মজুর-সঙ্ঘের নেতাদের কাছে অনেক ভেতরকার দরকারী কথা জানা যাবে। পাটের দালাল ও গাঁয়ের চাষীদের কাছে গিয়ে বাকী খবর সংগ্রহ কর্‌তে হবে।

প্রঃ—দেখ্‌ছি এ অনুসন্ধানটি নিতান্ত সোজা ব্যাপার হবে না; এর জন্যে রীতিমত সময় ও টাকা খরচ করা দরকার; তাই নয় কি?

উঃ—তা সত্যি।

প্রঃ—পাট সম্বন্ধে অনুসন্ধানটা এত প্রয়োজনীয় মনে করেন কেন?

উঃ—আমাদের দেশটাকে যদি উন্নত করতে হয়, তা সম্ভব হবে কেবল চাষের ভেতর দিয়ে। আবার চাষের জিনিষের মধ্যে পাট হচ্ছে প্রধান। পাট ভারতের একচেটে। পাটের সাহায্যে দেশটাকে অনেকটা এগিয়ে দেওয়া সম্ভব।

প্রঃ—পাটের সাহায্যে দেশটাকে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব! কথাটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

উঃ—পাটকলওয়ালারা পাট বেচে কি বিপুল লাভ করে, শতকরা ২০০৲।৩০০৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেয়। অথচ যারা পাট উৎপন্ন করছে সেই চাষীরা ভাল ক'রে খেতে পর্‌তেও পায় না। এই চাষীদের সমবায় সমিতির সাহায্যে (বা অন্য যে কোন উপায়েই হউক,) যদি সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তা হ'লে তারা কম দামে পাট ছাড়বে না, বেশী দাম চাইবে। পাটকলওয়ালারাও বাধ্য হ'য়ে তাই দেবে, কারণ, তারা যদি শতকরা ২০০৲।৩০০৲ টাকা হারে লাভ না পেয়ে, শতকরা ২০৲।৩০৲ হারে লাভ পায়, তা হ'লেও তারা কারখানা বন্ধ কর্‌বে না। শতকরা ২০০৲।৩০০৲ হারে লাভ কোন কারখানাওয়ালাই সাধারণতঃ আশা কর্‌তে পারে না। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'লেই আর্থিক অবস্থা ভাল কর্‌তে পারবে। আর, তাদের অবস্থা ভাল হওয়া মানেই বাংলাদেশের একটা মোটা ভাগ লোকের অবস্থা ভাল হওয়া।

প্রঃ—পাট যেন আমাদের একচেটে, সুতরাং পাট আট্‌কে রেখে এর

দর বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য কৃষিজাত জিনিষের যোগান আট্‌কে রেখে দর বাড়ানো কি সম্ভব?

উঃ—হাঁ, তাও সম্ভব। গম, চাল প্রভৃতির চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসার-শক্তিহীন (অর্থাৎ চাহিদার প্রকৃতি এ রকম যে, এদের যোগানের পরিমাণ কিছু কমালেই দর খুব বেশী বেড়ে যায়)। এদের যদি যোগান আট্‌কানো যায়, তা হ'লে এদের চাহিদা "কিউবিক কোয়ান্টিটি"তে বাড়্‌বে। সুতরাং, চাষীরা অনেকটা লাভ কর্‌তে পারবে।

প্রঃ—মজুর-ধর্ম্মঘটের দ্বারা দেশে উন্নতি কতদূর সম্ভব?

উঃ—ধর্ম্মঘটের দ্বারা দেশটা বেশী অগ্রসর হ'তে পারবে বলে মনে হয় না। ধর্ম্মঘট বড় ব্যয়সাপেক্ষ অস্ত্র। ওটা যত কম ব্যবহার করা হয়, ততই ভাল। ধর্ম্মঘটের সোজাসুজি কুফল—কাজের ঘণ্টা নষ্ট, মাহিয়ানা লোকসান—তা ত' আছেই, এর অন্য কুফলও আছে। ধর্ম্মঘটের ফলে, মজুররা যে প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কিছু খেতে পর্‌তে পার্‌ছিল, তাকেই ধ্বংস করা হয়—ধর্ম্মঘট করাটা হচ্ছে যে, হাঁসটা সোনার ডিম পাড়ছিল, অতিলোভে তাকেই মেরে ফেলার মত মূর্খামি।

এই দেখনা "বিলাতে" সাধারণ ধর্ম্মঘট কর্‌লে, কিন্তু তা সফল হ'ল কি? বরং তার ফল হ'ল এই যে, ওদের ঐ যে প্রকাণ্ড ট্রেড-ইউনিয়ান কংগ্রেস—যার পেছনে পঞ্চাশ বছরের গৌরবময় ইতিহাস র'য়েছে—অত বড় প্রতিষ্ঠানটা একেবারে ধ্বংস হ'য়ে গেছে বল্লেই হয়। সহানুভূতি-সূচক ধর্ম্মঘট কড়া আইন ক'রে বন্ধ করা হ'য়েছে। রাজনৈতিক কাজের জন্যে চাঁদা নেওয়া বন্ধ হ'য়েছে। এই সমস্তর জন্যে ট্রেড-ইউনিয়ান কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা খুব কমে গেছে।

প্রঃ—বিলাতে সাধারণ ধর্ম্মঘটটা বিফল হ'ল কেন?

উঃ—তার কারণ অতি সোজা—বিলাতের লোক-সংখ্যার অধিকাংশ

বেশ আরামে থাকে। এদের প্রত্যেকেরই কম-বেশী পুঁজি আছে, এরা সকলেই ছোটখাটো পুঁজিপতি। সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক গড়নটা বদলাবার পক্ষে তারা কখন মত দিতে পারেই না, বরং তারা প্রাণপণে সমাজের বর্ত্তমান গড়নটাকে বজায় রাখ্‌তে সচেষ্ট। বিলাতের অল্পসংখ্যক লোকই ভাল ক'রে খেতে পর্‌তে পায় না। এরাই বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট, এরাই কেবল ধর্ম্মঘট করে বা জোরজার ক'রে বর্ত্তমান আর্থিক বন্দোবস্তগুলা উল্‌টে দিতে চায়। এদের চেষ্টাতেই গতবারের সাধারণ ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি হ'য়েছিল। যেখানে সমাজের বেশীর ভাগই অল্প-বিত্তর ধনী, সেখানে সাধারণ ধর্ম্মঘট করা মানে, সমাজের অধিকাংশেরই সঙ্গে যুদ্ধ-ঘোষণা করা। এর ফলও হ'ল ভীষণ—প্রায় সমস্ত দেশটাই ধর্ম্মঘটী-দের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো—ট্রেড-ইউনিয়ান কংগ্রেসও প্রায় ধ্বংস হ'য়ে গেল।

প্রঃ—আপনার মত যখন এই যে, যে দেশে ধনী বেশী সে দেশে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট টিঁকতে পারে না, তা হ'লে যে, দেশে গরীব বেশী, সে দেশে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটের খুব সুযোগ আছে। সুতরাং, আপনার মতে দরিদ্র-প্রধান ভারতবর্ষ এই অস্ত্র প্রয়োগের একটা ক্ষেত্র ?

উঃ—না, ভারতবর্ষের পক্ষে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের লোকেরা এতদুর অসাড়, নির্জীব হ'য়ে প'ড়েছে যে, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটের জন্যে এদের সঙ্ঘবদ্ধ করা অসম্ভব। এদের যদি বলা যায়, "তোরা মরছিস্ যে, জাগ্‌না কেন।" এরা বল্‌বে, "মর্‌বার জন্যেই ত' আমরা জন্মেছি। বাঁচবার ত' আমাদের দরকার নেই।" দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা মুখ বুঝে সইবার এত সহিষ্ণুতা জগতে আর কোথাও দেখা যায় না—সহিষ্ণুতাই ত এদের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে। মায়াবাদের তত্ত্ব এদের শিরায় শিরায় ঢোকার ফলে; এরা আরও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে উঠেছে। এই সব লোক নিয়ে কি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট চলে ?

প্রঃ—মহাত্মা গান্ধী ত' অনেকটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটেরই পক্ষে। তাঁর কার্য্যকলাপ আপনার কেমন লাগে?

উঃ—মহাত্মা গান্ধী প্রণম্য ব্যক্তি, অদ্ভুত ত্যাগ তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনিও একটা মস্ত ভুল কর্ছেন। চরকা ও রাজনীতির মধ্যেও তিনি ধর্ম্মকে টেনে এনেছেন। ধর্ম্ম কিছু মন্দ জিনিষ নয়। ধর্ম্মের সার জিনিষটাকে খুবই শ্রদ্ধা করি—কিন্তু ধর্ম্মের কুসংস্কারগুলাকে ত সমর্থন কর্তে পারি না। গান্ধীর শিক্ষার ফলে, এই কুসংস্কারগুলা দৃঢ় হ'য়েছে।

প্রঃ—গোড়ার কথাটাতেই আবার ফিরে আস্‌ছি। তা হ'লে আপনার মত হচ্ছে এই যে, ভারতের আর্থিক অবস্থা ভাল কর্তে হ'লে চাষের উন্নতি ও চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করাটা একান্ত দরকার?

উঃ—হাঁ, ঠিক তাই। চাষ হিসেবে ভারতবর্ষ যে বড়—এটা আমাদের হাতে একটা মস্তবড় অস্ত্র। এই অস্ত্রটা বুদ্ধিমানের মত প্রয়োগ কর্তে পারলে দেশটাকে অনেক দূর অগ্রসর করা সম্ভব

প্রঃ—দেশের জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির পক্ষে পুঁজিতন্ত্রকে বাধা ব'লে গণ্য করা উচিত কি?

উঃ—নিশ্চয়। শুধু পুঁজিতন্ত্র নয়, জমিদার-তন্ত্রও বটে। এ দুটা না থাক্‌লে, বিজ্ঞানের ইতিমধ্যে যত উন্নতি হ'য়েছে, তাতে ভাল করে খেতে পর্তে পারার জন্যে দৈনিক ৩।৪ ঘণ্টার বেশী খাটবার দরকার নেই।

প্রঃ—জনসাধারণ খুব কম খাটে, এটা কি খুব বাঞ্ছনীয়?

উঃ—নিশ্চয়। যদি অল্প খাটুনিতে জীবিকা অর্জ্জন করা সম্ভব হয়, তবে সকলেই খাওয়া-পরার চিন্তাতেই দিনরাত না কাটিয়ে, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, দর্শন প্রভৃতি—যার যাতে প্রবৃত্তি আছে—তার আলোচনায় সময় দিতে পারবে। তাতে প্রত্যেকেই আনন্দ পাবে অফুরন্ত, সমাজেও উন্নতি হবে যথেষ্ট।

প্রঃ—আপনি এদেশের লোকের অভাব বাড়াবার পক্ষপাতী, না কমাবার পক্ষপাতী?

উঃ—অন্য দেশে লোকের অভাব আকাঙ্ক্ষা এত বেশী যে, তা কমানো দরকার হ'য়েছে, কিন্তু ভারতের লোকগুলার অভাব-বোধ এত কম যে, তা জাগিয়ে তোলা দরকার হ'য়েছে।

প্রঃ—আপনি এ পর্য্যন্ত যে সব কথা ব'লেছেন, তাতে মনে হয় যে ভারতের জাগরণের উপায় হচ্ছে—পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্ঘবদ্ধতার প্রণালী আয়ত্ত করা। ভারতবর্ষের কি তা হ'লে জগৎকে দেবার মত কিছুই নেই?

উঃ—আছে বই কি। ভারতবর্ষে এমন কতকগুলা জিনিষ আছে, যা জগতের আর কোথাও নেই। ২।১টা উদাহরণ দিচ্ছি। ভারতবাসী অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি। বিরোধের পর শীগ্‌গির শান্তির ভাব আনা কেবল ভারতবাসীর পক্ষেই সম্ভব। জগতের সর্ব্বত্রই আজ জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ চলেছে, সংগ্রাম যখন বাধ্‌বে, তখন তা নির্ম্মমভাবেই চল্‌বে। সেই সংগ্রামের পর মিলন-সমন্বয় আনা বড় সহজ হবে না। তা আন্‌তে পারবে কেবল ভারতেরই লোক। তারপর, ওদের দেশে ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখা হয়, এর ফলে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিছক উচ্ছৃঙ্খলতায় দাঁড়াতে পারে। ভারতবর্ষে সমাজকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখা হয়। তার ফলে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিছু কিছু বাধা পায়। সেই জন্যে ভারতেও পশ্চিমের মতই ব্যক্তিত্ব খানিকটা পুষ্ট হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, পাশ্চাত্ত্যের ব্যক্তিপ্রাধান্যের কুফলের ওষুধ কেবল ভারতই যোগাতে পারে। ভারতবর্ষের আরও একটি দেবার জিনিষ আছে—সেটি হচ্ছে সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম-দর্শনের সাধনা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব উপলব্ধি—এটা ভারতেই সম্ভব হ'য়েছে। এটা ভারতেরই একচেটে জিনিষ, আর এটা জগতের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকও বটে।

মার্কিণ শিল্পগুলার কি দুর্দ্দিন উপস্থিত ?

১৯০০ হ'তে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন বৎসরে গড়ে শতকরা ৩ হারে এবং লোক-বৃদ্ধি বৎসরে গড়ে শতকরা ১½ হারে বেড়েছে। লোক-বৃদ্ধি অপেক্ষা উৎপাদন-বৃদ্ধি বেশী হওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের অসামান্য ঐশ্বর্য্যের মূল কারণ।

উৎপাদন-বৃদ্ধির কারণগুলা কি? সংক্ষেপে সেগুলা বিবৃত করা যাচ্ছে :—(১) ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ডের সুবন্দোবস্ত—মুদ্রা ও কর্জ্জের পরিমাণ দরকার হ'লে বাড়ানো হয়, আবার দরকার শেষ হ'লেই কমানো হয়; (২) মাল বেশী পরিমাণে জমা করা হয় না, চাহিদা বাড়্‌লে তখনই মাল উৎপন্ন করা হয়; (৩) বিক্রয় বাড়াবার জন্যে, অর্থাৎ খাদকদের বিশেষ বিশেষ জিনিষ ব্যবহার কর্‌তে অভ্যাস করাবার জন্যে যথেষ্ট খরচ করা হয়; (৪) সব সময়েই উন্নততর কলকব্জার সহায়ে উৎপাদনের খরচা কমাবার চেষ্টা করা হয়, (৫) যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য পেশাদারী 'উদ্ভাবক' আছে, তারা কখন কি নূতন জিনিষ উদ্ভাবন কর্‌ছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখা হয়; এবং তাদের অভিজ্ঞতাগুলা কাজে লাগানো হয়; (৬) যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরই কলেজ হ'তে অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ার ও রসায়নবিৎ বেরোয়; কলেজ হ'তে নূতন পাশ করা লোকদের বেশী মাইনে দিতে হয় না; কোথায় কি ভাবে খরচা কমানো যেতে পারে, সে বিষয়ে চর্চ্চা করবার জন্যে ইঞ্জিনিয়ার ও রসায়নবিদ্‌দের দলে দলে ভর্ত্তি করা হয়; (৭) পুঁজির অভাব নেই—ধনীদের টাকা, এত বেশী যে, তাদের সমস্ত অভাব ও খেয়াল মেটাতেও তাদের আয়ের খুব অল্প ভাগই খরচ হয়, বাকী ভাগ শিল্পে খাটানো ছাড়া উপায়

নেই; শিল্পগুলাও তাদের লাভের সবটাই অংশীদারদের দেয় না—তার একটা মোটা ভাগ (শতকরা ৩৫ হইতে ৪০) শিল্পগুলাতে আবার খাটানো হয়; (৮) খরচ কমাবার জন্যে শিল্পগুলা সুবিধা বুঝলেই সঙ্ঘ-বদ্ধ হয়; (৯) সব সময়েই বিবিধ নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হচ্ছে; যেমন, রেডিও উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা রেডিও শিল্পের সৃষ্টি হ'য়েছে।

১৯২৭ সনের শেষ শিল্পগুলার লাভের হার ক'মে যায়, বেকারের সংখ্যাও বাড়ে। এর মানে কি? যুক্তরাষ্ট্রের দুর্দ্দশার দিন কি অগ্রসর হচ্ছে, শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা সুরু হচ্ছে কি?

শিল্প-বাণিজ্য মন্দা যে সব মামুলি কারণ থেকে উদ্ভূত হয় (যেমন মুদ্রা বা কর্জ্জের অত্যধিক বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণে মাল উৎপাদন, অসংখ্য কারবার ফেল হওয়া ইত্যাদি) তাদের একটিও যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না। লাভের হার কমবার ও বেকারবৃদ্ধির কারণগুলা তা হ'লে কি?

বলা হ'য়েছে, শিল্পগুলাকে উন্নত কর্‌বার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবিশ্রান্ত চেষ্টা চল্‌ছে; উন্নততর কলকব্জা সৃষ্টি হ'লেই তার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক কারবার ছোট হ'তে বড় এবং আরও বড় হ'তে চেষ্টা ক'রছে, বড় কারবারগুলা আবার সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে—অর্থাৎ শিল্প-জগতে সব সময়েই একটা ওলটপালট চল্‌ছে। এই সব নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে শিল্পগুলা খাপ খাওয়াতে বেগ পাচ্ছে ব'লেই ১৯২৭ সনের শেষে ওদের একটু দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। এই ধরণের দুরবস্থায় শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই, এটা উন্নতিরই পরিচায়ক এবং এটা কখনই স্থায়ী হ'তে পারে না।

ধর্ম্মঘট, জলপ্লাবন এগুলাও ঐ সাময়িক দুরবস্থার জন্যে আংশিকভাবে দায়ী, একথাও ভুল্‌লে চল্‌বে না।

ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর বিলাতের শিল্পসমূহ

ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পগুলাতে অনেক ওলটপালট দেখা দিল। কিন্তু বিলাতের গবর্ণমেণ্ট তখন আন্তর্জাতিক ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত, ঘরোয়া ঘটনার দিকে নজর দেবার তত সময় ছিল না। এ বিষয়ে বেসরকারী চেষ্টা দরকার বুঝে বিলাতের উদারনৈতিক দল একটি কমিটি নিয়োগ করেন। শিল্পগুলার অবস্থা ও তাদের উন্নতির উপায় আলোচনা কর্‌বার জন্যেই এই কমিটি নিযুক্ত করা হয়। গত ১৯২৭ সনে এই কমিটির রিপোর্টটি বের হ'য়েছে।

রিপোর্টটি নিতান্ত ছোট খাটো জিনিষ নয়। ২ লাখ কথায় এই রিপোর্টটি ভরা। তা ছাড়া ৪১টি সংখ্যা-তালিকা দেওয়া হ'য়েছে। উপক্রমণিকায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত উদারনৈতি দলের মতভেদটা দেখানো হ'য়েছে। সিদ্ধান্তগুলার একটা ৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী সারসঙ্কলন রিপোর্টের শেষে স্থান পেয়েছে।

৫টি ভাগে রিপোর্টটি বিভক্ত। যুদ্ধের পর বিলাতের শিল্পগুলার অবস্থা প্রথম ভাগে বর্ণনা করা হ'য়েছে। এ সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে:—(১) যুদ্ধের পর বিলাতের সকল শিল্পগুলায়ই যে মন্দা অবস্থা ছিল, তা নয়, কেবল রপ্তানি শিল্পগুলারই অবস্থা খারাপ ছিল; (২) শিল্পগুলার অবস্থা খারাপ হবার কারণ যুদ্ধ নয়, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কয়েকটি বিশেষ অবস্থাই তার কারণ। উক্ত, দুটি কথাই পূর্ণতঃ সত্য নয়। যুদ্ধের পর বিলাতের অন্য শিল্পগুলার অবস্থা যে খারাপ হয় নি এবং রপ্তানি-শিল্পগুলারই অবস্থা খারাপ হ'য়েছিল তার কারণ অন্য শিল্পগুলা

নানাভাবে সাহায্য পেয়েছিল আর রপ্তানি-শিল্পগুলার ওপর বোঝা ছিল অত্যন্ত বেশী। দ্বিতীয় কথাটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। যুদ্ধের জন্যে বিলাতকে যথেষ্ট খরচ কর্তে হ'য়েছে, যুদ্ধের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ওলট্পালট হ'য়েছে তার টাকাও বড় কম নয়।

দ্বিতীয় ভাগটিতে বিলাতী শিল্পের গড়নের কথা বলা হ'য়েছে। কমিটি বলেন যে, বিলাতের বৃহদাকার শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের ⅓ ভাগ সরকার-চালিত শিল্পে খাটছে। রেল কোম্পানীগুলা ও সমবায় সমিতিগুলা বিশেষ বিশেষ আইনের দ্বারা শাসিত। এগুলা আংশিক ভাবে সরকারের অধীন বলা চলে। এই সব ব্যবসাতে অংশীদারেরা যাতে স্থদ ছাড়া আর কিছু না পায়, আর কাজের ধরণ অনুযায়ী যাতে ডিরেক্টাররা নির্ব্বাচিত হয়, এ সম্বন্ধে নিয়ম করা দরকার। যে সব যৌথ কারবার সাধারণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ (যেমন ট্রাম চালান, গ্যাস সরবরাহ করা ইত্যাদি) নিয়ে ব্যবসা করে না, সেগুলা যদি অংশীদারদের শাসনের বাইরে গিয়ে থাকে, তা হ'লে তাদেরও বিশেষ আইনের সাহায্যে শাসন করা দরকার। এ সব যৌথ কারবারের হিসাবপত্র যাতে নিয়মিতভাবে বেরোয় এবং যোগ্যব্যক্তি যাতে এদের ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হন, সে সম্বন্ধে নিয়ম হওয়া দরকার। যে সব শিল্প-সঙ্ঘ ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটে অধিকার স্থাপন করে, তাদের অস্তিত্বে আপত্তি নেই, তবে তাদের ভেতরকার ব্যাপারগুলা প্রকাশ্যে জাহির কর্বার ক্ষমতা বোর্ড অব্ ট্রেডের হাতে থাকা দরকার।

বিলাতের নবসঞ্চিত মূলধন কোন্ কোন্ শিল্পে কি কি পরিমাণে খাটাতে হবে, তা স্থির কর্বার জন্যে একটি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হ'য়েছে। আর্থিক বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্যে একটি স্থায়ী

প্রতিষ্ঠান (ইকনমিক্ জেনারেল ষ্টাফ্) কায়েম কর্‌বার প্রস্তাব দেওয়া হ'য়েছে।

মনিব-মজুরের সম্বন্ধের আলোচনা তৃতীয় ভাগটিতে স্থান পেয়েছে। কমিটী বলেন যে, এমন কোন বিশেষ ওষুধ নেই, যার সাহায্যে মনিব-মজুরের সম্বন্ধটা ভাল হ'য়ে যাবে। যাই হোক, তাঁরা কয়েকটি উপায় অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন—(১) শিল্প-বিবাদ মেটাবার জন্যে শ্রমিক মন্ত্রীকে সচেষ্ট থাকৃতে হবে.—বাধ্যতামূলক সালিশের সাহায্য নেওয়া হবে না ; (২) যে সব কারবার সাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষ যুগিয়ে থাকে, সে সব কারবারে মনিব-মজুরে বিবাদ ঘট্‌বার পূর্ব্বে বিবাদ মেটাবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা ; (৩) মজুররা যাতে কারবারের লাভের অংশ পায়, তার বন্দোবস্ত করা ; (৪) মনিবরা এখন স্বেচ্ছাচারীর মত কারখানা শাসন ক'রে থাকে। এই স্বেচ্ছাচারিতা দমন কর্‌বার জন্যে জার্ম্মাণদের অনুকরণে মজুরদের দ্বারা নির্ব্বাচিত কর্ম্মসভা গঠন করা ও কর্ম্মসভাকে কারখানার ওপর কিছু কর্ত্তৃত্ব দেওয়ার কথাও বলা হ'য়েছে।

ভবিষ্যতের আর্থিক কার্য্য-প্রণালী কি রকম হবে, তা চতুর্থ ভাগটিতে দেওয়া হ'য়েছে। প্রধান সমস্যা হচ্ছে, বেকারদের নিয়ে—বেকারের সংখ্যা কমানো যায় কি করে ? কমিটির প্রস্তাব এই যে, বিশেষ ক'রে কৃষির উন্নতি কর্‌লে অনেক লোককে কৃষিতে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। এই প্রস্তাবের মূলে ধারণা এই যে, খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে বিলাতের পর-মুখাপেক্ষিতা ধ্বংস করা দরকার। কিন্তু কমিটী ভুলে যাচ্ছেন যে, বিলাতের শস্য আমদানি ক'মে গেলে অন্য দেশগুলা বিলাতী কারখানাজাত মাল কম ক'রে কিন্‌বে, ফলে বিলাতের শিল্পগুলার ঘোরতর দুর্দ্দিন উপস্থিত হবে। গৃহ-নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তার ও রাস্তা

নির্ম্মাণের কাজেও বেকারদের লাগানো হবে বলা হ'য়েছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে গৃহ-নির্ম্মাণের জন্যে অনেক টাকা ঢেলেছেন, আর তার ফলে, গৃহ-নির্ম্মাণ শিল্পে অনেক লোক ঢোকাতে তাদের মধ্যে অনেকেই বেকার হ'য়ে ব'সে আছে। বৈদ্যুতিক শিল্পেও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কিছু করবার নেই। যতটা বৃদ্ধির দরকার, তা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলা ইতিমধ্যেই করছে। রাস্তা-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা কমিটী খুব বেশী বিশ্বাস করেন ব'লে মনে হয় না। কারণ, মোটর-বৃদ্ধির আবশ্যকতা স্বীকার করলেই রাস্তা-নির্ম্মাণের একটা সুসঙ্গত কারণ পাওয়া যায়। কিন্তু কমিটী মোটর অপেক্ষা রেলেতেই বেশী বিশ্বাসী। তাঁদের এই বিশ্বাসের কারণ এই যে, রেল মোটরের মতই জোরে যেতে পারে এবং মোটরের চেয়ে বেশী মাল বইতে পারে।

শেষ ভাগটিতে জাতীয় রাজস্বের কথা আলোচনা করা হ'য়েছে। এসম্বন্ধে কমিটীর তিনটি কথা উল্লেখযোগ্য :—(১) "খরচ কমানো" কথাটার অর্থ কি, তা ভাল ক'রে বোঝানো হ'য়েছে। (২) জাতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব আরও শৃঙ্খলার সঙ্গে রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হ'য়েছে, (৩) দেখানো হ'য়েছে যে, আয়-ব্যয়ের হিসাব এ রকম-ভাবে রাখা হয়, যাতে প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় কত, তার প্রকৃত ধারণা করা শক্ত; আয়-ব্যয়ের হিসাবে এই রকম কৌশল খাটানো নিন্দনীয়।

রিপোর্টটি সরকারী রিপোর্ট নয়; একটি রাজনৈতিক দলের রিপোর্ট। তা হ'লেও, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহায়তার জন্যে রিপোর্টটি লেখা বা সিদ্ধান্তগুলা খাড়া করা হয় নি। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর সাহায্যে রিপোর্টটি লেখা হ'য়েছে।

রিপোর্টটিতে যে সব প্রস্তাব করা হ'য়েছে সেইগুলা অনুযায়ী যে, কাজ হবেই, তা বলা চলে না। কিন্তু তা না হ'লেও ক্ষতি নেই। শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে এতে অনেক কথা পাওয়া যাবে। বিলাতের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্যে নানা উপায় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক এখন আরও উঁচু দরের হ'তে পার্‌বে।

রুশিয়ার 'গস্‌প্ল্যান'

প্ল্যান ক'রে দেশের আর্থিক জীবন চালানো কি সম্ভব? বড় জোর বড় বড় ফ্যাক্টরী, বা বড় বড় ট্রাষ্ট আগে হ'তে প্ল্যান ক'রে সেই প্ল্যান অনুযায়ী চালানো সম্ভব হ'য়েছে। কিন্তু একটা দেশের অর্থনৈতিক জীবন কোন্ দিকে কি রকমভাবে চল্‌বে, তা আগে থাকৃতে ঠিক ক'রে নিয়ে, সেই অনুযায়ী চালানো অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, নানাশ্রেণীর ফ্যাক্টরী, ব্যাঙ্ক, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কত টাকা দেওয়া হবে, তারা কি পরিমাণ উৎপাদন কর্‌বে. তাদের উন্নতির জন্যে কি কি করা দরকার, এ সমস্ত আগে থাকৃতে স্থির ক'রে নিয়ে, সেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ চালানো— এটা জগতে এ পর্য্যন্ত কোথাও সম্ভব ব'লে মনে করা হয় নি। কিন্তু আধুনিক রুশিয়া এটা সম্ভব ব'লে মনে ক'রেছে এবং এ দিকে অনেকটা সফলও হ'য়েছে। এ বিষয়ে রুশিয়ার দুঃসাহসিকতা দেখে অবাক্ না হয়ে থাকা যায় না।

রুশিয়াতে একটি কমিটি আছে, তার নাম "গস্‌প্ল্যান।" এটা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ সনে। বল্‌শেভিকরা যখন প্রথম প্রবল হয়, তখন ধনসাম্যবাদ পূরাপূরি চালাবার চেষ্টা হয়। কিন্তু নানা কারণে সে চেষ্টা বিফল হয়। তখন লেনিন তাঁর "নতুন আথিক-নীতি" জারি কর্‌লেন। এর ফলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং বেসরকারী উৎপাদন ও ব্যবসা কিছু কিছু জেগে ওঠে। লেনিনের নতুন নীতি কাজে লাগাবার একটি প্রধান অঙ্গরূপেই গস্‌প্ল্যানের সৃষ্টি হয়। গবর্ণমেণ্টের অধান সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলা গস্‌প্ল্যানের আদেশের

অধীন ক'রে দেওয়া হয়। সেই সময় হ'তে গস্‌প্ল্যানই রুশিয়ার আর্থিক জীবন চালাচ্ছে। ১৫ বছরের একটি মোটামুটি প্রোগ্রাম এবং প্রত্যেক ৫ বছরের ও প্রত্যেক পরবর্ত্তী বছরের একটি বিস্তারিত প্রোগ্রাম স্থির ক'রে সেই অনুযায়ী গস্‌প্ল্যান রুশিয়ার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলার পরিচালনা কর্‌ছে।

ষোল জন বিশেষজ্ঞ—কেউ এঞ্জিনিয়ার, কেউ কেমিষ্ট, কেউ ধনবিজ্ঞান-সেবী—গস্‌প্ল্যানের মেম্বার। কমিটীর মেম্বাররা রুশিয়ার মন্ত্রী-সভা "কাউন্সিল অব দি পিপল্‌স্ কমিসারস্" কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত এবং তাঁদেরই নিকট দায়ী। আইনের দিক্ থেকে কমিটীটি কেবল একটা পরামর্শ দেবার সভামাত্র, কিন্তু কার্য্যতঃ এটাই আর্থিক রুশিয়ার সকল বিষয়ে চরম কর্ত্তা।

মস্কো সহরে ক্রেমলিন প্রাসাদের কাছে এর একটা প্রকাণ্ড আফিস হ'য়েছে। ৫ শতেরও ওপর লোক সেখানে খাট্‌ছে। অবিশ্রান্ত কর্ম্মপ্রবাহের আবহাওয়ায় সারা আফিসটি ছেয়ে আছে। পার্টিশানওয়ালা ছোট ছোট ঘর, টাইপরাইটিংএর অবিশ্রান্ত শব্দ, হিসাব কর্‌বার কলের আওয়াজ, ম্যাপপ্ল্যানের ছড়াছড়ি। কর্ম্মচারীদের ব্যস্তসমস্ত ভাব—এসব দেখলেই বোঝা যায় যে, সমগ্র আফিসটি তার গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশ সচেতন।

গস্‌প্ল্যানের কাজ কর্‌বার মত অবকাশ রুশিয়ার আছে কি? অর্থাৎ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষির কতখানি গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে? এর উত্তর এই যে, রুশিয়ার আর্থিক জীবনের সমগ্রটা না হ'লেও, প্রায় সমগ্রটা, রুশিয়ার গবর্ণমেণ্টই চালাচ্ছে। কৃষিতে শতকরা ৯০ ভাগ, খুচরা দোকানদারিতে শতকরা ৩০ ভাগ এবং ফ্যাক্টরী সাহায্যে উৎপাদনে শতকরা ১০ ভাগ ব্যক্তিগত উৎপাদক বা ব্যবসাদারের

হাতে আছে; কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বাকী ভাগগুলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই (কিছু কিছু সমবায়-সমিতি কর্ত্তৃকও) চালিত হচ্ছে। এ ছাড়া রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট রেল ও ষ্টিমার চালাচ্ছে। টেলিগ্রাফ টেলিফোঁর ও বিজলী ঘরের পরিচালনা করছে এবং বাজার দর, মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং, কর্জ্জ, আমদানি-রপ্তানি—এই সবই নিজের হাতে রেখেছে।

সরকারী ফ্যাক্টরীগুলা শত শত ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক চালিত হচ্ছে। ট্রাষ্ট-গুলা গবর্ণমেণ্টেরই সম্পত্তি এবং অনেকটা স্বাধীন। কেবল ট্রাষ্টগুলার ম্যানেজার নিয়োগ, উৎপন্ন মালের বাজার-দর নিরূপণ ও পুঁজি-নিয়োগ সম্বন্ধে ট্রাষ্টগুলা গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ট্রাষ্টের লাভটা অন্যদেশে অংশীদাররা পায়, রুশিয়াতে সেটা গবর্ণমেণ্ট পায়।

দেখা যাচ্ছে যে, রুশিয়াতে গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক কাজকর্ম্মের তালিকাটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নয়। এতেই বোঝা যায় যে, গস্‌প্ল্যানের কাজ কর্‌বার অবকাশটা কতখানি এবং তার দায়িত্বের পরিমাণই বা কত।

গস্‌প্ল্যানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব কম শ্রম খরচ ক'রে দেশের উৎপাদন যতদূর সম্ভব বাড়ানো। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর দিকেই কেবল নজর দিলে চল্‌বে না—মজুরদের দিক্‌টাও দেখ্‌তে হবে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে মজুরদের সুখ, সুবিধা, স্বার্থ—এগুলা অবহেলা করা হবে না। অর্থাৎ মজুরদের স্বাস্থ্য, নির্ব্বিঘ্নতা, শিক্ষা, অবসর, কর্ম্মস্থানের অবস্থা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা কর্‌তে হবে।

উক্ত উদ্দেশ্য লাভ কর্‌বার জন্যে যে সব উপায় অবলম্বন করা হবে, ঠিক করা হ'য়েছে, তাদের মধ্যে গুটিকয়েক উল্লেখ করা যাচ্ছে—

(ক) যেখানে কাঁচামাল পাওয়া যায়, তার কাছে ফ্যাক্টরী স্থাপন; (খ) প্রতিযোগিতার জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় বাড়াবার চেষ্টা—এই সবের লোপ সাধন; (গ) যেসব শিল্প অত্যন্ত পিছিয়ে আছে (যেমন লোহা ও ইস্পাত শিল্প) সেইগুলাতে বেশী পুঁজি ঢেলে তাদের উন্নত কর্‌বার চেষ্টা করা; (ঘ) যেখানে শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা চাহিদার তুলনায় বেশী, সেখান থেকে টাকা তুলে নেওয়া; (ঙ) রুশিয়ার লোকের জন্যে জুতা, কাপড়, চিনি প্রভৃতি যে জিনিষ যত পরিমাণে দরকার, তার বেশী উৎপাদন না করা; (চ) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক শক্তির ওপরই নির্ভর করা।

প্রথম হ'তেই গস্‌প্ল্যানকে প্রধানতঃ দুটি বিপদের সঙ্গে যুঝতে হ'য়েছিল :—(১) প্রত্যেক শিল্প ও রুশিয়ার প্রত্যেক প্রদেশ ও জেলা বেশী বেশী পুঁজির জন্যে তাগাদা কর্‌ছিল, অথচ চাহিদা মেটাবার মত পুঁজি গস্‌প্ল্যানের কাছে ছিল না; (২) দেশের আর্থিক জীবনের নানা অঙ্গ সম্বন্ধে নিখুঁত সংখ্যা-সংগ্রহ না থাক্‌লে একটা বিরাট দেশের অর্থ-নৈতিক জীবনকে এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র হ'তে নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব; অথচ নিখুঁত সংখ্যা-সংগ্রহ রুশিয়াতে ছিল না; সংখ্যা-তালিকার অভাবটা গস্‌প্ল্যানকে প্রথম প্রথম বেশ তীব্রভাবেই অনুভব কর্‌তে হ'য়েছিল।

প্রথম অভাবটা এখনও মেটে নি। এখনও রুশিয়া পুঁজির অভাব বোধ কর্‌ছে। দ্বিতীয় অভাবটা অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে অনেকটা মেটাবার উপায় হ'য়েছে।

গস্‌প্ল্যানের বর্ত্তমান চেষ্টা হচ্ছে প্রধানতঃ দুটি :—(১) উপাদানকে প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের সমান করা; (২) আর্থিক বিষয়ে রুশিয়াকে সকল দিক্ হ'তে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা।

প্রথম চেষ্টাটি ইতিমধ্যেই অনেকটা সফল হ'য়েছে। বেশীর ভাগ শিল্পেই উৎপাদন প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে। কোন কোন শিল্পে এখনও তার চেয়ে কম। মোটের ওপর, প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের উৎপাদনের হারটায় পৌছানো হ'য়েছে বলা চলে।

দ্বিতীয় বিষয়ে চেষ্টাটা বড় সহজ নয়। রুশিয়া খাদ্যদ্রব্য ও ও কাঁচামাল যথেষ্ট উৎপন্ন করে সত্য; কিন্তু কারখানা-জাত মালের দিক্ থেকে রুশিয়া বড় পশ্চাৎপদ্। কারখানা-জাত মাল খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের বদলে বিদেশ থেকে সস্তায় কেনা হয়। দেশে উৎপাদন কর্‌তে গেলে খরচ পড়্‌বে বেশী। সেই জন্যে এদিকে রুশিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'তে বাধ্য হ'য়েছে।

কোন্ শিল্পে কতটা স্বাবলম্বী হ'তে হবে, সেটা মোটামুটি ঠিক ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। স্থির করা হ'য়েছে যে, লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুত এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে যা কিছু দরকার, তা সবই রুশিয়ার মধ্যেই উৎপন্ন কর্‌তে হবে। রবার, তুলা, কর্ক প্রভৃতির উৎপাদনের জন্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আবাদ এবং মোটরগাড়ী ও মোটর-চালিত লাঙ্গলের কারখানা তৈরীর কথাও হচ্ছে।

১৯২৬ সনের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৩১ সনের ১লা অক্টোবর —এই ৫ বছরের মধ্যে শিল্পোৎপন্ন জিনিষের পরিমাণ শতকরা ৭৮ ভাগ, কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ানো হবে, ঠিক করা হয়েছে। সুতরাং শিল্পজাত জিনিষের বার্ষিক বৃদ্ধি হবে শতকরা ১৫ হারে এবং কৃষিজাত জিনিষের বার্ষিক বৃদ্ধি হবে শতকরা ৬ হারে। বস্তুতঃ, ১৯২৭ সনে ঐ নির্দ্ধারিত অঙ্কগুলায় প্রায় পৌছানো হ'য়েছিল। ১৯২৭ সনে শিল্পজাত মালের বৃদ্ধি হ'য়েছিল শতকরা ১৩·৭; কৃষিজাত জিনিষের বৃদ্ধি হ'য়েছিল শতকরা ৮·৭। এ থেকে মনে হয় যে,

গস্‌প্ল্যান নিতান্তই একটা অসম্ভব আকাশ-কুসুম ফাঁদে নি। প্ল্যান অনুযায়ী কাজ কর্‌বার ক্ষমতা তার আছে।

১৯২৮ সনের জন্যে ১৯২৭ সনে যে প্রোগ্রামটা ঠিক করা হ'য়েছিল, তার মোট কথাগুলা এই—(১) ১৯২৭ সনে ৯,৮০৬,০০০,০০০ ডলার দামের কৃষি ও শিল্প-জাত মাল তৈরী হ'য়েছিল; ১৯২৮ সনে ১০,৮৭৪,০০০,০০০ ডলার দামের মাল উৎপন্ন করা; (২) ১৯২৮ সনে জিনিষপত্রের দাম কমাবার ব্যবস্থা; এর ফলে, মালের পরিমাণ হিসাব কর্‌লে আগের বছরের তুলনায় উৎপাদন-বৃদ্ধির হার শতকরা ১৩·২ হ'লেও, দরের দিক্ থেকে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হবে শতকরা ৬·৪; (৩) মজুরদের উৎপাদন-শক্তি শতকরা ১১ ভাগ বাড়ানো; (৪) যান-বাহন শতকরা ১২ ভাগ বাড়ানো; (৫) উৎপাদন-খরচা শতকরা ৬ ভাগ কমানো (৬) মোট ২,৬৭৮,০০০,০০০ ডলার শিল্প-বাণিজ্যে ফেলা; তার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট-চালিত শিল্পগুলাতে ৬৩০,০০০,০০০ ডলার, যান-বাহনে ৩৮৫,০০০,০০০ ডলার এবং কলকারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করার জন্যে ১৪৪,০০০,০০০ ডলার দেওয়া; (৭) যেসব মজুর শারীরিক পরিশ্রম করে, তাদের শতকরা ৮০·৬ ভাগ গবর্ণমেণ্টের ও সমবায় সমিতিগুলার অধীনে খাটে, এদের আরও বেশী সংখ্যায় গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত করা; (৮) কেনা-বেচার শতকরা ৭২·৬ ভাগ গবর্ণমেণ্ট ও সমবায় সমিতিগুলার অধীনে; এটা শতকরা ৮৪·৫ ভাগে দাঁড় করানো; (৯) ভোগ্য জিনিষের উৎপাদনের দিকে আগেকার চেয়ে কম নজর দিয়ে, উৎপাদন-সহায়ক মাল তৈরীর ওপরই বেশী ক'রে জোর দেওয়া; (১০) কর্জ্জের পরিমাণ শতকরা ২৩·২ ভাগ বাড়িয়ে মোট ৬০৫,১২৫,০০০ ডলারে দাঁড় করানো ইত্যাদি।

ব্যক্তি-তন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ভাল, না সমাজ-তন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ভাল—এ নিয়ে জগতে ঝুড়ি ঝুড়ি লেখা হ'য়েছে এবং অনেক বক্তৃতাও দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু যাঁরা এ বিষয় নিয়ে চর্চ্চা ক'রেছেন, তাঁদের এ পর্য্যন্ত কল্পনার ওপরই নির্ভর করতে হ'য়েছিল। কারণ, জগতে এ পর্য্যন্ত সমাজ-তন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ছিল না। রুশিয়া সেই অভাব পূরণ ক'রেছে। রুশিয়ার চেষ্টার সফলতা বা বিফলতা জগতে ধনবিজ্ঞান-সেবীদের গবেষণার জন্যে যে প্রচুর বাস্তব তথ্য যোগাবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর দারিদ্র্য ও তাহার প্রতীকার

[ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশানের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সারমর্ম্ম নীচে দেওয়া গেল।]

প্রঃ—বাঙ্গালীর বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

উঃ—অবস্থা অতীব শোচনীয়। দিন কয়েক পূর্ব্বে আয়-করের হিসাব নিয়ে আমি নাড়াচাড়া ক'রেছিলুম। তার ফলে, দেখ্‌লুম যে, বাংলায় যারা আয়-কর দেয় তাদের মোট বার্ষিক আয় ৪৫ কোটি টাকা; এর মধ্যে বাঙ্গালীর ভাগ মাত্র ১০ কোটি টাকা *। দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা দেশে আয়-কর দেয়, এরূপ লোকদের মোট আয়ের এক-চতুর্থাংশের কম হচ্ছে বাঙ্গালীর অংশ, আর অ-বাঙ্গালীর মোট উপার্জ্জন বাঙ্গালীর মোট উপার্জ্জনের ৩॥০ গুণ বেশী। এখানে সমগ্র বাংলা দেশের কথা ধরা হয় নি—যে সব লোক আয়-কর দেয় না, অর্থাৎ যাদের আয় বার্ষিক ২ হাজার টাকার নীচে, তাদের কথা বাদ দেওয়া হ'য়েছে। সেই দিক্ থেকে দেখ্‌লে বলা চলে যে, আমার অঙ্কগুলাই এ সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। তা হ'লেও, এথেকেই বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থাটা অনেকটা বুঝা যাবে।

প্রঃ—বাঙ্গালীর দারিদ্র্য বুঝাবার জন্যে আর কোনও অঙ্ক বা তথ্য আপনার কাছে আছে কি ?

উঃ—হাঁ, আরও কিছু খবর আপনাকে দিচ্ছি। বাংলা

---

* ৩০ হাজার বাঙ্গালী এই টাকাটা রোজগার ক'রে থাকে ; বাকী ৩৫ কোটি টাকা মাত্র ১৮ হাজার লোকে রোজগার করে।

দেশের ভদ্রলোকদের (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি) সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। এদের মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার লোক আয়-কর দিয়ে থাকে। অর্থাৎ ভদ্রলোকদেরই অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, তাদের খুব একটি সামান্য ভাগেরই বার্ষিক রোজগার ২ হাজার টাকার ওপর। আবার এটিও লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় যে, ভদ্রলোকদের মধ্যে যারা আয়-কর দিয়ে থাকে, তাদের রোজগারের হারটা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের খুব বেশী হ'তে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগেরই ২ হাজার টাকার খুব বেশী ওপরে নয়। কারণ এদের গড়পড়্‌তা রোজগার হচ্ছে—মাত্র ৩ হাজার ৩ শ' ৩৩ টাকা।

প্রঃ—বাঙ্গালীর এই অবস্থার প্রতীকার কি ?

উঃ—একমাত্র প্রতীকার, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাণপণে নিযুক্ত হওয়া। এখন বাংলার বাণিজ্য-জগতে বাঙ্গালীর কোন স্থান নেই বল্‌লেই চলে। কল্‌কাতার বাণিজ্য-কেন্দ্র হচ্ছে ক্লাইভ ষ্ট্রীট আর বড়বাজার। এ দুই জায়গায় বাঙ্গালীর কোন উল্লেখযোগ্য স্থান আছে কি ?

প্রঃ—ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বাঙ্গালীর নজর না দেবার কারণ কি ?

উঃ—প্রথম কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশেই ইংরেজরাজ্যের গোড়া-পত্তন হয়। রাজ্য ও ব্যবসা চালাবার জন্যে ইংরেজরা ইংরেজী-জ্ঞানওয়ালা লোকের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী বোধ ক'রলে। ইংরেজী-জানা লোকের জন্যে তারা বেশী মাইনেও দিতে চাইলে। বাঙ্গালী দেখ্‌লে এ ত' বেশ সুযোগ, একটু ইংরেজীর জ্ঞান আয়ত্ত করলে নিয়মিত ভাবে বেশ চলনসই রোজগার করা যায়। এ বিষম প্রলোভন বাঙ্গালী সামলাতে পারলে না। তার ফলে, বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনের মূলোচ্ছেদের যোগাড় হ'ল। ইংরেজ-শাসনের

গোড়ায় বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় যে চাকুরী-প্রীতি ঢুকেছে, তা বাঙ্গালীকে এখনও মোহগ্রস্ত ক'রে রেখেছে। কিন্তু কেবল চাকুরীর সাহায্যে পাঁচ কোটি-লোকওয়ালা একটি জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্নসংস্থান সম্ভব কি ?

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে কিছুই ভাল করে নি, তা বল্‌ছি না ; কিন্তু এর মন্দ দিকটা ত' একেবারে ভুলে যেতে পারি না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি মাত্র কুফল হ'য়েছে এই যে, এর ফলে জমির দাম বেড়েছে, এই জন্যে জমি কেনা-বেচা ক'রেই বেশ আয় দাঁড় করানো যায়। বাঙ্গালীরা সেই জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা না খাটিয়ে জমিতেই খাটাচ্ছে। কলকাতার জমিজমার বিক্রী আর বন্ধকীতে বাঙ্গালী বছরে ২ কোটি টাকা খাটায়। কলকাতার বাইরে জমি বিক্রী আর বন্ধকীতে প্রতি বছর ১০।১২ কোটি টাকা খাটানো হয়। এই টাকার কিছু অংশও ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটালে কাজ হ'ত। কিন্তু বাঙ্গালী ব্যবসার গোলমালে পা দিতে একান্ত নারাজ।

প্রঃ—বাঙ্গালীকে ব্যবসাতে দীক্ষিত কর্‌বার জন্যে কি করা দরকার ব'লে আপনার মনে হয় ?

উঃ—ব্যবসা শেখাবার জন্যে স্কুল কলেজ স্থাপনের কথা আজকাল চারিদিকে শোনা যায়। কিন্তু স্কুল কলেজে পাশ করিয়ে ব্যবসা শেখানো যায়—এটা আমার মনে হয় না। কমার্শ্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে পাশ, বা কমার্শে বি এ, এম এ পাশ কর্‌লে বড় জোর ব্যবসা-বাণিজ্যের আফিসে বড় গোছের কেরাণী হওয়া যায়। কিন্তু বড় বড় ব্যবসা চালাবার শিক্ষা স্কুল কলেজ থেকে পাওয়া যায়—এ কথা আর যে কেউ বিশ্বাস করুন, আমি অন্ততঃ করি না। ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে হাতে-কলমে

শেখবার জিনিষ। ব্যবসার দিকে যদি ঝোঁক থাকে, যদি বুদ্ধি, সাধুতা ও খাটবার ক্ষমতা থাকে, তা হ'লে ব্যবসাতে উন্নতি না করবার ত কারণ দেখি না।

প্রঃ—ব্যবসা শেখবার জন্যে শিক্ষা দেবার দরকার নেই, এ কথাটা নির্ব্বিচারে মেনে নিতে একটু বাধ' বাধ' ঠেকছে।

উঃ—কিন্তু না মানবার ত' কোন কারণ নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে যে কলেজে পড়া বিদ্যের দরকার নেই, আমি তার ঝুড় ঝুড়ি উদাহরণ দিতে পারি। ধরুন স্যর বেসিল ব্লাকেট, লর্ড বার্কেনহেড প্রভৃতির কথা। এঁরা রাজস্ব-সচিব বা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন—ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে এঁদের কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল না। অথচ, এঁরা বার্ষিক ১০।১৫ হাজার পাউণ্ড মাইনেতে বড় বড় কোম্পানীতে এখন চাকুরী করছেন। তারপর ধরুন স্যার জর্জ্জ গড্‌ফ্রের কথা—ইনি আগে বি এন্ রেলওয়ের এজেণ্ট ছিলেন। এজেণ্টগিরির শেষ হ'লে বার্ড কোম্পানী এঁকে চাকুরী দিলে। বার্ড কোম্পানীর কারবার হচ্ছে কয়লা, পাট প্রভৃতি নিয়ে, সেগুলা সম্বন্ধে স্যর জর্জ্জের আগে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই ছিল না। অথচ, তাঁকেই ত' বার্ড কোম্পানী মোটা মাইনেতে পরে নিযুক্ত করলে? ভারতীয়দের মধ্যেও এমন উদাহরণের অভাব নেই। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি আগে একজন অ্যাটর্ণি ছিলেন। বিড়লা দেখলেন যে, ওঁকে নিজের ফার্ম্মে নিযুক্ত করলে সমূহ লাভ। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ৫ হাজার টাকা মাইনে দিয়ে খৈতানকে নিজের ফার্ম্মে ঢুকিয়ে নিলেন। এই সমস্ত উদাহরণ আলোচনা করলে সহজেই মনে হয় যে, ব্যবসার জন্যে প্রধান দরকার হচ্ছে বুদ্ধি। যার সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে, সে ব্যবসাতে উন্নতি করবেই। বাঙ্গালীর মধ্যে সূক্ষ্ম-মস্তিষ্কওয়ালা

লোকের যে অভাব আছে, তা স্বীকার করি না। সুতরাং, বাঙ্গালী ব্যবসাতে যে নিজ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে না, তা আমি ভাব্‌তেও পারি না।

প্রঃ—তা হ'লে, বাঙ্গালীকে ঐদিকে প্রবৃত্ত করাবার জন্যে কি করা দরকার ?

উঃ—আমার ত' মনে হয় মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি নানা কাগজের সাহায্যে একটা প্রবল অর্থনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে বাঙ্গালীকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, ব্যবসা-রাজ্য দখল না কর্‌তে পারলে বাঙ্গালীর আর কোন উপায় নেই। দিনরাত বার বার ব'লে বাঙ্গালীকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, শিল্প-বাণিজ্যে কৃতিত্ব দেখাবার চেষ্টা বাঙ্গালী যদি এখনও না করে, তা হ'লে তার ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময়। আপনারা "আর্থিক উন্নতি"র মারফতে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সার কথাগুলা সোজা বাংলায় যে প্রচার কর্‌ছেন, তার একটা খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে, আমি মনে করি। বাঙ্গালীর বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে যে, চাকুরী, ওকালতি, এঞ্জিনিয়ারী, ডাক্তারী—এ কয়টা কাজ ছাড়া টাকা রোজগারের আর পথ নেই। এই ভ্রান্ত ধারণা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দেবার ভার আমাদের নিতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ খুবই দুর্গম, তা স্বীকার করি, কিন্তু এই পথে যত টাকা রোজগার হ'তে পারে, আর কোন পেশায় কি তা সম্ভব ?

প্রঃ—বুদ্ধি আর ঝোঁক—এ দুটা গুণ থাক্‌লেই ব্যবসাতে সফল হওয়া যায় ?

উঃ—না, আরও একটা গুণ বিশেষ আবশ্যক। লোককে নিজের মতে আনবার শক্তি থাকা চাই, মিষ্ট কথায় লোককে তুষ্ট কর্‌বার

ক্ষমতা থাকা চাই। এইখানে চাকুরীর সঙ্গে ব্যবসার একটা মস্ত তফাৎ। চাকুরীতে শুধু ওপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট রাখলেই হ'ল। কিন্তু ব্যবসাতে, যে সব লোকের সম্পর্কে আস্তে হচ্ছে, তাদের প্রত্যেককে সন্তুষ্ট রাখ্তে হবে।

প্রঃ—বাঙ্গালীকে যদি ব্যবসাতে সফল হ'তে হয়, তার জন্মে টাকার দরকার। সুতরাং, ব্যাঙ্কের সাহায্যও দরকার। কল্কাতায় যে সব বড় বড় ব্যাঙ্ক রয়েছে, এদের কাছ থেকে বাঙ্গালী সাহায্যের আশা কর্তে পারে কি ?

উঃ—কল্কাতায় যে সব বড় বড় ব্যাঙ্ক রয়েছে, তারা বাঙ্গালীকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। শীঘ্র যে কর্বে তাও মনে হয় না। বাঙ্গালী ব্যবসাদারদের জন্মে পৃথক্ বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রঃ—বাঙ্গালীকে কলকারখানা, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি স্থাপনে সাহায্য কর্বার জন্মে পৃথক্ শিল্প-ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন কি ?

উঃ—খুব বেশী রকমই করি। বাণিজ্য-ব্যাঙ্কগুলা কম দিনের জন্মে টাকা ধার নেয়। সুতরাং তারা অল্প সময়ের জন্মেই টাকা ধার দিতে পারে। বাণিজ্য-ব্যাঙ্কগুলা যদি বেশী দিনের জন্মে টাকা ধার দেয়, পাওনাদারেরা টাকার জন্মে তাগাদা কর্তে পারে এবং তার ফলে ব্যাঙ্ক ফেল মারতেও পারে। অথচ বড় বড় কারখানা স্থাপনের জন্মে অনেক দিন ধ'রে টাকা আট্কে রাখা দরকার। এই কারণে, বাণিজ্য-ব্যাঙ্কগুলা কেবল বাণিজ্যকেই সাহায্য কর্তে পারে, শিল্পকে সাহায্য কর্তে পারে না। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার প্রধান কারণ এর ডিরেক্টারদের ব্যক্তিগত দোষ। কিন্তু এর একটা ছোট-খাট কারণ এই যে, বাণিজ্য-ব্যাঙ্ককে দিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দুয়েরই

সাহায্য কর্‌বার চেষ্টা করা হ'য়েছিল। এই পরস্পর-বিরোধী কাজ একই ব্যাঙ্ককে দিয়ে করাবার চেষ্টাই ব্যাঙ্কটিকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলেছিল।

প্রঃ—শিল্প-ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্যে বাঙ্গালীর বিশেষ চেষ্টা করা এখন উচিত নয় কি?

উঃ—উচিত ত' বটেই। কিন্তু এখন চেষ্টা কর্‌লে সাফল্যের কোন আশা আছে ব'লে ত' মনে হয় না। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ফেল হবার পর লোকে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক-কোম্পানী স্থাপনের জন্যে টাকা সহজে দেবে ব'লে মনে হয় না। তবে একটি উপায় আছে। বাঙ্গালীর শিল্প-ব্যাঙ্কের জন্যে যদি পৃথক্ আইন পাকা করানো যায় (যেমন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জন্যে পৃথক্ আইন আছে), আর সেই আইন অনুসারে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টাররা যদি বেশ কড়া শাসনে থাকে, তা হ'লে লোকের বিশ্বাস আবার জাগানো যেতে পারে।

প্রঃ—বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে মনে হয়?

উঃ—চারিদিকে একটা অর্থনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি কর্‌বার চেষ্টা যে সুরু হ'য়েছে তা দেখ্‌ছি। শিল্প-বাণিজ্যে লাগবার একটা আকাঙ্ক্ষা যে ক্রমেই জাগছে, তারও প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। এইসব দেখে মনে একটু আশার সঞ্চার হয়। তবে, ব্যবসাতে বাঙ্গালী অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। এই পেশায় গণ্যমান্য স্থান অধিকার কর্‌তে গেলে বাঙ্গালীর যতটা আগ্রহ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা উচিত, তার লক্ষণ ত' দেখতে পাচ্ছি না—বরং ব্যবসার সাহায্যে সোজা উপায়ে হঠাৎ বড় লোক হবার ইচ্ছারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যবসাতে বড় হবার দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিয়ে তোলা বিশেষ দরকার। এ দৃঢ় সঙ্কল্প যদি আমরা জাগিয়ে তুলতে পারি, তা হ'লে ব্যবসাতে বাঙ্গালী তার যোগ্য স্থান যে অধিকার করবেই, সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

অষ্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রকর্ত্তৃক মজুরি-নির্দ্ধারণ

শাসনযন্ত্রের সাহায্যে জাতির অর্থ-নৈতিক কাজকর্ম্ম চালানো সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাশিয়াতে সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট অর্থনৈতিক ও শিল্প-সংক্রান্ত কাজের যত বেশী ভার নিয়েছিল, জগতের আর কোনও গবর্ণমেণ্ট তা করে নি।

জাতির আর্থিক উন্নতির জন্যে যা কিছু করা দরকার, তা কর্‌তে অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট পশ্চাৎপদ নয়।

অষ্ট্রেলিয়ার শিল্প-পতি ও ব্যবসাদারেরা অনেক সময়ে মজুরদের খুব কম মাহিনা দিত। অষ্ট্রেলিয়ার সরকার দেখ্‌লেন যে, জাতির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মানুষের জীবনধারণের জন্যে যত উপার্জ্জন আবশ্যক, তা অপেক্ষা যদি কম উপার্জ্জন করে, তা হ'লে জাতির কর্ম্মপটুতাই ধ্বংস হয়; তা ছাড়া, মনিব-মজুরে বিবাদ ঘট্‌বার সম্ভাবনাও বেশী থাকে। এই কথা বুঝে অষ্ট্রেলিয়ার সরকার মজুরদের মজুরির হার স্থির ক'রে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ব'লে মনে কর্‌লেন।

"আধুনিক" জগতে প্রথম

অষ্ট্রেলিয়ার এই চেষ্টা আধুনিক জগতে প্রথম। জগতে পূর্ব্বে আর কখনও যে রাষ্ট্রকর্ত্তৃক মজুরির হার নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয় নি,

তা নয়। রোমান সাম্রাজ্যে এই রকম চেষ্টা কিছু কিছু হ'য়েছিল, তার প্রমাণ আছে। বিলাতে টিউডার ও ষ্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে মজুরির হার যে রাষ্ট্রকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হ'ত, ইতিহাসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং, অষ্ট্রেলিয়ার উদাহরণ জগতে প্রথম ব'ল্‌লে ভুল হবে।

কিন্তু বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবন এবং কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ও ফ্যাক্টরী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জগতে যে শিল্প-বিপ্লব উপস্থিত হ'য়েছে, এই শিল্প-বিপ্লবের পর জগতের উন্নত দেশগুলার আর্থিক গড়নের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এই জন্যেই, শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মজুরি-নির্দ্ধারণ ও তার পরবর্ত্তী যুগের মজুরি-নির্দ্ধারণে পার্থক্য অনেক। শিল্প-বিপ্লবের পরবর্ত্তী যুগে মজুরি-নির্দ্ধারণে প্রথম হস্তক্ষেপ ক'রেছে— অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্র। এইখানেই অষ্ট্রেলিয়ার বাহাদুরী।

অষ্ট্রেলিয়ার মজুর-আন্দোলন

১৮৫৫-৫৬ সনটা অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় সময়। ঐ সময়ে অষ্ট্রেলিয়া স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করে। আবার, ঠিক ঐ সময়েই স্বর্ণ-খনিগুলা আবিষ্কৃত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধতাও ঠিক ঐ তারিখ হ'তেই আরম্ভ হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার মজুররা তাদের অবস্থার উন্নতি কর্‌বার জন্যে প্রথম হ'তেই কোন কোন বিষয়ে সরকারী সাহায্য নিয়েছিল। ফ্যাক্টরী-গুলাকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল কর্‌বার জন্যে এবং অ-শ্বেত জাতিদের আমদানি বন্ধ কর্‌বার জন্যে তারা সরকারী সাহায্য নেয়।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তারা তাদের স্বাবলম্বন পূর্ণমাত্রায় বজায় রখেছিল। আট ঘণ্টার দিন প্রবর্ত্তন করা, মাহিয়ানা বাড়ানে

ইত্যাদি বিষয়ে তারা সরকারী সাহায্য আদৌ নেয় নি। মনিবদের সঙ্গে কখনও বোঝাপড়া ক'রে, কখনও বা ধর্ম্মঘটের সাহায্যে যুঝে তারা তাদের অবস্থার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিল।

১৮৯০ সনের ধর্ম্মঘট

১৮৯০ সন পর্য্যন্ত মজুর-আন্দোলনের ধারা ঠিক এই ভাবেই চ'লেছিল। কিন্তু ঐ সনে জাহাজের নাবিকদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্মঘট দেখা দিলে। ধর্ম্মঘটকারীরা শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের গোঁ বজায় রাখ্‌তে পারে নি। মনিবদের জয় হ'ল। বিবাদটা মিট্‌ল বটে, কিন্তু ধর্ম্মঘটের বিরাটত্ব দেখে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হ'ল। তার ফলে, এই রকম বিবাদের সত্বর নিবারণের পন্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা সুরু হ'ল। মনিব-পক্ষরা ব'ল্‌লেন, "মজুর-সঙ্ঘগুলাকে ধ্বংস কর, আমরা প্রত্যেক মজুরের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ চুক্তি করব। তা হ'লে ভবিষ্যতে আর গোলমাল হবে না।" দেশবাসী বাধ্যতামূল সালিশে মিটমাটের কথা তুলেছিল। কিন্তু মজুররা বল্‌লে, "যদি সালিশে মিটমাট কর্‌তে বাধ্য করা হয়, তা হ'লে আমরা সালিশ চাই না।

বাধ্যতামূলক সালিশের প্রবর্ত্তন—মজুরি-নির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ

সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রীদের অন্যতম শ্রীযুক্ত কিংসটন নিউ সাউথ ওয়েল্‌স কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দেবার সময়ে বল্‌লেন, "রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'য়েছে দেশের লোককে শান্তিতে থাক্‌তে

দেবার জন্যে; শান্তিতে থাক্‌বার জন্যেই লোকে রাষ্ট্রকে খাজনা দিয়ে থাকে। ধর্ম্মঘট, লক্-আউট (মনিব কর্ত্তৃক ফ্যাক্টরী বন্ধ করা) প্রভৃতি এই শান্তির ব্যাঘাত করে; সুতরাং, মজুর-মনিবের বিবাদ ধর্ম্মঘট, লক-আউট প্রভৃতির সাহায্যে মেটাবার চেষ্টা আদৌ সম্ভাব-জনক নয়; মজুর-মনিবের উচিত বিবাদ সালিশে মিটিয়ে নেওয়া; যদি তারা তা না করে, সাধারণের সার্থের জন্যে রাষ্ট্র তাদের এ বিষয়ে বাধ্য কর্‌তে পারে।" বাধ্যতামূলক সালিশের ব্যবস্থা যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা কিংসটনই প্রথম বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লেন। কিন্তু কিংসটনের কথা শীঘ্র কেউ শোনে নি। তিন বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা কর্‌বার পর সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে সাউথ অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রথম বাধ্যতামূলক সালিশের আইন পাকা করে। এর আরও ৭ বৎসর পরে নিউ সাউথ ওয়েলসের গবর্ণমেণ্ট সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার পদানুসরণ করে।

এই রকমে যেসব সালিশী আদালতের প্রতিষ্ঠা হ'ল সেগুলাকে মনিব-মজুরের বিবাদের সকল কারণই অনুসন্ধান কর্‌বার এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা দেবার ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু মজুরির হারই বিবাদের প্রধান কারণরূপে সাধারণতঃ দেখা দিত। এই জন্যে আদালতগুলা প্রথম হ'তেই মজুরির হার নির্দ্ধারণের দিকে বেশী ঝুঁকেছিল।

ভিক্টোরিয়ায় "বোর্ড" স্থাপন

ভিক্টোরিয়া কিন্তু আদালত স্থাপন-প্রণালী পছন্দ কর্‌ল না। সেখানে প্রত্যেক শিল্পের জন্যে এক একটা "বোর্ডের" সৃষ্টি করা হ'ল। "বোর্ডে" মজুর ও মনিব উভয় পক্ষেরই সমানসংখ্যক প্রতিনিধির স্থান দেওয়া হ'ল। কাপড়চোপড়, আসবাব, রুটি, মাংস প্রভৃতি

তৈরীতে নিযুক্ত নানা শিল্পের মজুরদের অত্যন্ত কম হারে মজুরি দিয়ে অনেকক্ষণ খাটানো হ'ত। স্থায়ী ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত ক'রে মজুরদের অবস্থার ওপর অনুক্ষণ চোখ রাখ্‌বার জন্যেই বোর্ডগুলা সৃষ্টি করা হ'য়েছিল।

মজুররা কিসের পক্ষপাতী

বাধ্যতামূলক সালিশী আদালত এবং বোর্ড—এই দুয়ের মধ্যে মজুররা বোর্ডেরই বেশী পক্ষপাতী ছিল। কারণ, বোর্ড শিল্পের ওপর সব সময়েই চোখ রাখ্‌বার ক্ষমতা পেয়েছিল। আদালতগুলা সব সময়েই শিল্পগুলার ওপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌বার ক্ষমতা পায় নি—বিশেষ বিশেষ বিবাদ মোকদ্দমার আকারে আদালতের সম্মুখে আনীত হ'লেই আদালত মজুরদের অবস্থা, মাহিনা প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান কর্‌বার অধিকার পেত।

কিন্তু পরে মজুররা আদালতের দিকেই ঝুঁক্‌লো। এর কারণ আদালতগুলা মজুর ও মনিবদের "সঙ্ঘবদ্ধতা" স্বীকার ক'রে নিত। বোর্ডগুলা মজুরদের "বিচ্ছিন্নভাবে" দেখ্‌ত, অর্থাৎ তারা প্রত্যেক মজুরের দুঃখ-দুর্দ্দশার পৃথক্ পৃথক্ অনুসন্ধান কর্‌ত—মজুর-সঙ্ঘগুলা যে একটা জীবন্ত প্রতিষ্ঠান, তা তারা স্বীকার কর্‌ত না। এই কারণে, আদালতগুলাই মজুরদের প্রিয় হ'য়ে উঠলো।

বর্ত্তমানের বন্দোবস্ত

অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ একই প্রণালী অনুসরণ করে নি। ভিক্টোরিয়া বোর্ড-প্রণালীই বজায় রেখেছে, ট্যাসম্যানিয়া তার অনুসরণ ক'রেছে। ওয়েষ্টার্ণ অষ্ট্রেলিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট

(মজুর বা মনিবদলের কার্য্যক্ষেত্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে গেলে, বিবাদ মেটাবার অধিকার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে আসে) আদালত স্থাপন ক'রেছে। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌ ও সাউথ অষ্ট্রেলিয়া প্রথমে আদালত স্থাপন ক'রেছিল। কিন্তু পরে এরা ও কুইন্সল্যাণ্ড, বোর্ড ও আদালত উভয় প্রণালীর মিশ্রণে একপ্রকার নতুন প্রতিষ্ঠান কায়েম ক'রেছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে বোর্ডের মত মজুর ও মনিব উভয়েরই স্থান আছে। কিন্তু বোর্ড হ'তে এদের পার্থক্য প্রধানতঃ দুই বিষয়েঃ— (১) সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি এইসব প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন; (২) সমগ্র প্রদেশের মজুরির হার (কেবল বিশেষ বিশেষ শিল্পের নয়) বেঁধে দেওয়া ও প্রতি বৎসর অবস্থানুযায়ী তার পরিবর্ত্তন করা এই প্রতিষ্ঠানগুলার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

নিম্নতম মজুরি নির্ণীত হয় কিরূপে

অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলা সব শ্রেণীর মজুরেরই মজুরির হার স্থির করেন। প্রথম একটা নিম্নতম মজুরির হার স্থির ক'রে নেওয়া হয়—কোন শিল্পের কোন মজুরকে এই নিম্নতম মাহিনা অপেক্ষা কম মাহিনা দেওয়া আইন-বিরুদ্ধ। নিম্নতম মজুরিটা নির্দ্ধারিত হ'লে পর তাকে ভিত্তি ক'রে বিভিন্ন শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মজুরদের মজুরির হার নির্দ্ধারিত করা হয়।

নিম্নতম মজুরির হারটা স্থির করা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। সেই জন্যে এখন জিজ্ঞাস্য এই,—কি নীতির সাহায্যে নিম্নতম মজুরির হারটা নির্দ্ধারিত হ'য়ে থাকে?

কোন্ নীতি প্রয়োগ ক'রে নিম্নতম মজুরি স্থির করা হবে, তা আইনে উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু আইনকারকরা তা করেন নি। প্রত্যেক মজুরকে রাষ্ট্র হ'তে নির্দ্দিষ্ট নিম্নতম মজুরিটা অন্ততঃ দিতেই হবে, এই পর্য্যন্ত ব'লেই তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন। নিম্নতম মজুরি কি প্রণালীতে স্থির করা হবে, তা তাঁরা বলেন নি।

হিগিন্‌সের নীতি—
চলনসই আরামের উপযুক্ত মাহিনা দাও

আইন প্রয়োগ করার ভার বিচারপতিদের ওপর। আইনে যখন কোন নীতির উল্লেখ নেই, তখন তাঁরা নিজেরাই একটা নীতি তৈরী ক'রে নিলেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সালিশ-আদালতের প্রধান বিচারপতি হিগিন্‌স্ নিম্নতম মজুরির এইরূপ অর্থ স্থির ক'রে দিলেন,—"(ক) সভ্য সমাজে বাস ক'র্‌তে হ'লে একজন (খ) সাধারণ মজুরের যে সব (গ) সাধারণ অভাব থাকে, সেইগুলা মেটাবার উপযুক্ত মাহিনাই নিম্নতম মজুরি"। ১৯০৭ সনে হিগিন্‌স্ যে নীতি স্থির ক'রে দিলেন, অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বত্রই তা অনুসৃত হ'তে লাগ্‌লো।

উক্ত নীতির দোষ

কিন্তু হিগিন্‌স্-কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নীতির দুটি দোষ ছিল—(১) সভ্য সমাজের মজুরের কিরূপ জিনিষ খাওয়া-পরা ও ভোগ করা উচিত তা আধুনিক জগতে স্থির করা নিতান্ত সোজা নয়; মধ্যযুগে

—যখন জীবনযাত্রার প্রণালী সরল ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণী-ভেদে তার বিশেষ পার্থক্য ছিল না, তখন এ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা শক্ত ছিল না ; (২) মজুরদের খাওয়া-পরা কি শ্রেণীর হওয়া উচিত, তা ঐ নীতি অনুসারে একবার স্থিরীকৃত হ'লে, তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীটা বরাবর সেই স্তরে বজায় রাখ্‌বার একটা প্রবণতা দেখা দেবে, অর্থাৎ তা উন্নত করবার কোনও চেষ্টাই লক্ষিত হবে না। হিগিন্‌সের নির্দ্ধারিত নীতির এও একটা বড় দোষ ছিল ; (৩) সব শিল্পের মাহিনা দেবার ক্ষমতা সমান নয় ; নিম্নতম মজুরি স্থির করবার সময় শিল্পগুলার অবস্থাও যে হিসাব করা উচিত, তা হিগিন্‌স্ একেবারেই লক্ষ্য করেন নি।

নীতিটির প্রয়োগ—নিম্নতম মজুরি দৈনিক ৭ শিলিং

নীতিটি হিগিন্‌স্ স্বয়ং কিরূপে প্রয়োগ ক'রেছিলেন, তা লক্ষ্য করবার বিষয়। মজুরদের সাংসারিক অভাবের মধ্যে কি কি জিনিষ ধরা হবে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ ঘট্‌তে পারে। কতটা কাপড়-চোপড়, বাড়ীঘর ইত্যাদি তারা পেতে অধিকারী? তামাক, খবরের কাগজ, মদ, জীবনবীমার খরচা, বায়স্কোপের খরচা ইত্যাদি তারা পেতে অধিকারী কি না? হিগিন্‌স্ এসব জটিলতার ভেতর যান নি। তিনি কয়েকটি পরিবারের সাংসারিক খরচের একটা হিসাব সংগ্রহ করলেন ; মেলবোর্ণে তখন মজুররা কি হারে মজুরি পাচ্ছিল, তার একটা সংখ্যা-তালিকা সংগ্রহ ক'রে দৈনিক ৭ শিলিংই (সাপ্তাহিক ২ পাউণ্ড ২ শিলিং) নিম্নতম মজুরি ব'লে ধরা হবে, এই স্থির

কর্‌লেন। খাবার ও বাড়ীভাড়ার খরচাটা তিনি হিসাব ক'রেছিলেন; ৭ শিলিং তা অপেক্ষা বেশী ছিল; ৭ শিলিং এবং খাওয়া ও বাড়ী-ভাড়ার খরচের পার্থক্যটা অন্যান্য খরচের জন্যে ব'লে ধরা হ'য়েছিল।

হিগিন্‌সের হিসাবে গলদ

ওপরের হিসাব হ'তে বেশ দেখা যাচ্ছে যে, (১) মজুরদের জীবনধারণের জন্যে নিম্নতম কত টাকা দরকার, তা তিনি খুঁটে বিচার করেন নি। বাড়ীভাড়া ও খাওয়ার খরচটি তিনি ধরেছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য কি কি খরচ ধরা উচিত, সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই স্থির করেন নি। সুতরাং, প্রকৃত জীবনধারণের খরচের হিসাবের ওপর হিগিন্‌সের নিম্নতম মজুরির হার প্রতিষ্ঠিত, এ কথা কিছুতেই বলা চলে না; (২) হিগিন্‌স্ অষ্ট্রেলিয়ার একটি বিশেষ স্থানের মজুরদের আয়-ব্যয়ের কথা বিবেচনা ক'রেছিলেন, সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার মজুরদের আয়-ব্যয় কিরূপ তা দেখেন নি। সুতরাং একটি বিশেষ স্থানের জীবন-যাত্রাপ্রণালী কর্ত্তৃক সমগ্র দেশের জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রভাবান্বিত কর্‌বার চেষ্টা করা হয়।

হিগিন্‌সের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া
"শিল্পগুলার অবস্থাও দেখ্‌তে হবে"

যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে অষ্ট্রেলিয়ার শিল্পগুলার অবস্থা ভাল ছিল না। সেই জন্যে হিগিন্‌সের নীতি মাঝে মাঝে লঙ্ঘিত হ'তে লাগ্‌লো। ১৯২০ সনে সাউথ অষ্ট্রেলিয়া আদালত এবং ১৯২১ সনে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের

আদালত বল্‌লেন যে, তাঁরা কেবল মজুরদের ভরণপোষণের খরচা দেখে নিম্নতম মজুরি স্থির করা উচিত মনে করেন না, শিল্পগুলার অবস্থার দিকটা দেখাও আবশ্যক মনে করেন।

১৯২৪ সনে কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড আদালতের বিচারপতি ম্যাক্‌কলি একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। নিম্নতম মজুরি নির্দ্ধারণে শিল্পগুলার মাহিনা দেবার ক্ষমতা কতদূর বিবেচনা করা উচিত, তা স্থির করাই কমিশনের কর্ত্তব্য ছিল। কমিশন বল্‌লেন যে, নিম্নতম মজুরি নির্দ্ধারণে শিল্পের মাহিনা দেবার ক্ষমতাটাই প্রথমে দেখা উচিত। তাঁরা ব'লে দিলেন যে, কোন বিশেষ বছরে কোন শিল্পের মাহিনা দেবার ক্ষমতা কিরূপ, তা নির্দ্ধারণের জন্তে সেই বছরে মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং পরবর্ত্তী বৎসরে মজুর-প্রতি কত উৎপাদন আশা করা যায়, তা হিসাব কর্‌তে হবে। শিল্পের মাহিনা দেবার ক্ষমতাটা আলোচনা কর্‌বার পর জীবন-ধারণের খরচটার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

কমিশনের রিপোর্ট বাহির হবার আগেই ম্যাক্‌কলি মারা গেলেন। তাঁর সহযোগী বিচারকরা পুরাণো প্রণালীটা পরিবর্ত্তন করার কোন আবশ্যকতা বোধ ক'র্‌লেন না।

মজুরদের প্রতিবাদ

উক্ত কমিশনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে মজুরদলগুলা এইরূপ আপত্তি তুলেছিল:—(১) শিল্পের লাভ বাড়্‌লে মজুররা তার ভাগ পায় না। সুতরাং শিল্পের অবস্থা খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাহিনা কমানো হ'লে অত্যন্ত অন্যায় হবে; (২) কমিশন যে প্রণালীর প্রস্তাব

ক'রেছিলেন, তাতে জিনিষপত্রের দরের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার বাড়াবার কমাবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না।

পিডিংটন কমিশন

মজুরের জীবনধারণের জন্যে অন্ততঃ কয়টা জিনিষ কত পরিমাণে দরকার, তা স্থির করা নিম্নতম মজুরি-নির্দ্ধারণের পক্ষে যে একান্ত আবশ্যক, তা আগে উল্লেখ করা হ'য়েছে। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে ১৯১৯ সনে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশন এই সিদ্ধান্ত কর্‌লেন যে, একজন মজুর তার স্ত্রী ও তিনটি সন্তানকে 'চলনসই আরামে' রাখ্‌তে হ'লে যে সব জিনিষের দরকার, তা যোগাবার জন্যে প্রতি হপ্তায় অন্ততঃ ৫ পাউণ্ড ১৬ শিলিং হারে মাহিনা দরকার। কিন্তু ঐ সময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় এত বেশী পরিমাণে মজুরি দেওয়া কোন শিল্পের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ঐ সনে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম মজুরি দেওয়া হ'ত নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে; তাও (৪টি প্রাণী-বিশিষ্ট পরিবারের জন্যে) ৪ পাউণ্ড ৫ শিলিংএর বেশী নয়। সুতরাং, ঐ হারে মজুরি দেওয়া শিল্পগুলার পক্ষে অসম্ভব বুঝে কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পিডিংটন রিপোর্টের শেষে একটি পৃথক্‌ মন্তব্য জুড়ে দিলেন।

"স্বামী ও স্ত্রীর অভাবটা দেখ এবং সন্তানের জন্য ভাতা দাও"

তাতে তিনি বল্‌লেন যে, নিম্নতম মজুরি স্থির কর্‌বার জন্যে মজুর, তার স্ত্রী ও তিনটি সন্তান অর্থাৎ, মোটের ওপর ৫টি প্রাণীর

অভাব আলোচনা কর্‌বার দরকার নেই (এ পর্য্যন্ত তাই করা হচ্ছিল) কারণ, মজুরদের সবাইই বিবাহিত নয়, এবং বিবাহিত মজুরদের সবারই সন্তানের সংখ্যাও সমান নয়। এই জন্যে শুধু মজুর ও তার স্ত্রীর সর্ব্বাপেক্ষা কম কত দরকার, তা প্রথমে স্থির করা উচিত। তার পর, যে পরিবারের যেমন সন্তান তদনুযায়ী সন্তান-প্রতি ৫ শিলিং হিসাবে সরকার হ'তে একটা ভাতা (অ্যালাওয়েন্স) দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, শিল্পপতিদের কাছ থেকে একটা কর আদায় ক'রে সেই সাহায্যে উক্ত ভাতা দেবার বন্দোবস্ত ক'র্‌লে ভাল হয়। এই প্রণালীর তিনি এই কয়টা সুবিধা দেখালেন,—(১) ৫টি প্রাণী-বিশিষ্ট পরিবারের জীবনধারণের নিম্নতম হার দেখ্‌লে প্রত্যেক মজুরকে ৫ পাউণ্ড ১৬ শিলিং হিসাবে দিতে হয়, এই প্রণালী অনুসরণ কর্‌লে তার চেয়ে অনেক কম দিতে হবে; (২) মজুরির হার পরিবারের সাইজের সঙ্গে বাড়ানো কমানো চল্‌বে।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের চাকর্‌য়েদের জন্যে সন্তান-ভাতা

পিডিংটন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট পিডিংটনের নির্দ্ধারিত প্রণালীটা সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে আংশিকভাবে প্রয়োগ কর্‌লেন। যেসব সরকারী কর্ম্মচারী বার্ষিক ৪০০ পাউণ্ডেরও কম মাহিনা পেত, তাদের শিশু-প্রতি ৫ শিলিং ক'রে ভাতা দেবার ব্যবস্থা হ'ল।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের পরামর্শদাতা—পিডিংটন

১৯২৬ সনে নিউ সাউথ ওয়েল্‌স গবর্ণমেণ্ট পিডিংটনকে নিযুক্ত কর্‌লেন। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে নিম্নতম মজুরি কত হওয়া উচিত, তা তাঁকে নির্দ্ধারিত কর্‌তে বলা হ'ল। তিনি এই ব্যবস্থা দিলেন —একটি মজুর, তার স্ত্রী ও একটি সন্তানের অভাব হিসাব কর্‌লে নিম্নতম মজুরি হওয়া উচিত ৪ পাউণ্ড ৪ শিলিং (সাপ্তাহিক)। কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের মজুরদের গড়ে ৩টি ক'রে সন্তান। অপর ২টি সন্তানের জন্যে নিম্নতম মজুরির হারটা না বাড়িয়ে তাদের জন্যে সরকার হ'তে ভাতার ব্যবস্থা কর্‌তে তিনি পরামর্শ দিলেন।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে সন্তান-ভাতা

পিডিংটনের পরামর্শ অনুযায়ী নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে যে আইনটি পাশ করা হয়, তার ব্যবস্থাগুলা এইরূপ :—(১) প্রত্যেক বৎসর একজন মজুর ও তার স্ত্রীর (পিডিংটন ১টি সন্তানের কথাও ধর্‌তে বলেছিলেন, কিন্তু আইনকারকরা তা ধরেন নি) অভাব বুঝে নিম্নতম মজুরি স্থির করা হবে ; (২) প্রত্যেক শিশুর জন্যে ৫ শিলিং ক'রে ভাতা দেওয়া হবে ; নিম্নতম মজুরি এবং শিশু-প্রতি ৪ শিলিং ভাতা ধর্‌লে মোট যা দাঁড়ায়, কোন মজুরের সেইরকম রোজগার হ'লে তাকে আর ভাতা দেওয়া হবে না ; উক্ত মোট হ'তে রোজগার যদি কম হয়, তা হ'লে কম্‌তিটা পূরাবার জন্যে ভাতা দেওয়া হবে। যেমন, ৪ পাউণ্ড যদি নিম্ন-

তম মজুরি হয়, এবং একটি সন্তানওয়ালা মজুরের যদি উপার্জ্জন হয় ৪ পাউণ্ড ৫ শিলিং, তা হ'লে সে কোন ভাতাই পাবে না। কিন্তু তার যদি তিনটি সন্তান থাকে, তা হ'লে সে ১০ শিলিং ভাতা পাবে।*

মিলিত চেষ্টার দরকার

সন্তান-ভাতার চেষ্টা অষ্ট্রেলিয়ায় এই প্রথম। কিন্তু এটা কেবল একটি প্রদেশে অবলম্বিত হ'য়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে এর প্রবর্ত্তন দরকার। সন্তান-ভাতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা কর্‌বার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যতটুকু সাধ্য, তা ক'রেছে—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের চাকর্‌য়েদের সম্বন্ধে সন্তান-ভাতা প্রবর্ত্তন করা হ'য়েছে। এখন প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিগণ যদি মিলিত হ'য়ে অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে এ বিষয় একই প্রণালী অবলম্বন সম্বন্ধে পরামর্শ করেন, তবেই এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বত্র একটা সুব্যবস্থা হ'তে পারে। †

* যে মন্ত্রীর দল নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে সন্তান-ভাতা আইনের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁরা সন্তান-ভাতার খরচ মেটাবার জন্যে শিল্পপতিদের মজুরি-খরচার ওপর শতকরা ৩ হারে কর আদায় কর্‌তে আরম্ভ করেন ; ১৯২৭ সনের শেষে অন্য এক মন্ত্রীর দল শাসন-যন্ত্রের অধিকার প্রাপ্ত হন ; এঁরা দেখ্‌লেন যে, উচ্চ হারে কর আদায় না কর্‌লেও মোট খরচটা মেটানো সম্ভব। সেই জন্যে মজুরি খরচার ওপর শতকরা ১ হ'তে ১¼ হারে মজুরি আদায় করবেন বলে এঁরা স্থির করেছেন।

† সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার জন্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কি ভাবে সন্তান-ভাতার প্রবর্ত্তন করা যেতে পারে, তা আলোচনা কর্‌বার জন্যে সংপ্রতি একটি রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হ'য়েছে ; সংপ্রতি এই কমিশনটি সাক্ষ্য নিচ্ছে। (মার্চ্চ, ১৯২৮)

মজুরি-নির্ণয়ের নানা সমস্যা

কি উপায়ে নিম্নতম মজুরির হারটা নির্দ্ধারিত হয়, এ পর্য্যন্ত তা বলা হ'ল। কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক মজুরি-শাসনে শুধু মজুরির হারটা নির্দ্ধারণ করাই গুরুতর ব্যাপার নয়। মজুরি-নির্দ্ধারণ ক'রতে পদে পদে সরকারকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে। এইবার সেগুলার পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে ঃ—

(১) আদালত সম্পর্কীয় সমস্যাগুলা—(ক) আদালতগুলার কাছে সিদ্ধান্ত পেতে প্রায়ই দেরী হয় (বোর্ড সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে), সেই জন্যে মজুরদের ধৈর্য্য ধারণ করা অনেক সময়ে শক্ত হ'য়ে ওঠে; (খ) আদালতগুলার মতামত পাওয়া সোজা ব্যাপার নয়। সালিশ-আদালতের উকীলরা মোটা মোটা ফী হাঁকেন। সেই জন্যে আদালতের মত পেতে গেলে যথেষ্ট খরচ করতে হয়; (গ) মনিব-মজুরের বিবাদের আদত ব্যাপারটি অনেক সময়ে আইনের খুটিনাটি তর্কে চাপা প'ড়ে যায় (যেমন 'ফ্যাক্টরী' কাহাকে বলে? 'ইউনিয়নের' মানে কি? এই সব সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়), এতে মজুরদের অনেক সময়ে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে (কিন্তু এইসব তর্ক অনিবার্য্য; কারণ, এই শ্রেণীর আইন এখনও নিতান্ত শিশু অবস্থায়, এ এখনও কোন বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয় নি)।

(২) যদি কোন মজুর-সঙ্ঘের কার্য্যক্ষেত্র কোন প্রদেশের সীমানার বাইরে বিস্তৃত হয়, তা হ'লে তা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আদালতে মোকদ্দমা করতে অধিকারী ব'লে গণ্য হয়; এই সুবিধা পাবার জন্যে অনেক সময় কোন্ কোন শ্রেণীর মজুররা অষ্ট্রেলিয়া-ব্যাপী সঙ্ঘ স্থাপন করে, তাতে অনেক গোলযোগ ঘটে; এখন দেখা গিয়েছে যে, একই কারখানাতে ফিটার মিস্ত্রীরা প্রাদেশিক

আদালত কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত মজুরি অনুসারে কাজ কর্‌ছে, কিন্তু ফিটার মিস্ত্রীদের মজুররা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মজুরি অনুসারে কাজ কর্‌ছে।

(৩) জিনিষপত্রের দরের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার বাড়াতে কমাতে বেগ পেতে হচ্ছে; ১৯০১ সন হ'তে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত বাজার-দর বরাবর বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাজার-দরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার বাড়ে নি, বরং ১৯১১ সন হ'তে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত মজুরি কমেই গিয়েছিল; তার পর, ১৯২০ সন হ'তে বাজার-দর কম্‌তে আরম্ভ করে। কিন্তু মজুরির হার তার সঙ্গে সঙ্গে কমে নি; সুতরাং, বাজার-দরের সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার ওঠানামা করে নি (এই গলদটা এড়ানো সহজ নয়; মজুরি স্থির কর্‌তে হ'লেই আগেকার একটা বিশেষ সময়ের বাজার-দরের দিকে লক্ষ্য রেখে তা কর্‌তে হবে, করার পরই যদি বাজার-দর হঠাৎ বেশী বাড়ে বা বেশী কমে, তা হ'লে বাজার-দরের সঙ্গে সঙ্গে মজুরির একটা পার্থক্যের সৃষ্টি হবেই; এই গলদ দমনের একটি উপায় হচ্ছে—মজুরির হার ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করা। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় আদালত বাজার-দরের সঙ্গে মজুরির হারের তুলনা তিন মাস অন্তর কর্‌বেন স্থির ক'রেছেন)।

(৪) অষ্ট্রেলিয়ার কৃষি-জাত দ্রব্যের শত করা ৯৫ ভাগ দেশের বাইরে বেচা হয়। সেই জন্যে মজুরির হার বেঁধে দেওয়াতে যেটুকু বেশী খরচ বেড়েছে, কৃষকরা তা বিদেশী খাদকের ঘাড়ে চাপাতে পারে নি (বিদেশে বিক্রীত মালকে জগতের অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর্‌তে হয়, সেই জন্যে বিদেশী ক্রেতাদের ওপর বেশী দর চাপানো কৃষকদের পক্ষে সম্ভব হয় না), উৎপাদন-প্রণালী

উন্নত ক'রেই সেই খরচ মিটিয়েছে ; কিন্তু কারখানাওয়ালাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, তাদের মালের শতকরা ৯৫ ভাগ দেশের ভেতরই কাটৃতি হয়, তার ওপর উচ্চ সংরক্ষণ-শুল্কের দেয়াল থাকাতে বাইরের প্রতিযোগিতা হ'তে ওরা সুরক্ষিত ; এই সব কারণে, মজুরি নির্দ্ধারণের ফলে, তাদের যে বেশী খরচ হচ্ছে, মালের দাম চড়িয়ে তা দেশের খাদকদের কাছ থেকেই তারা আদায় করছে।

(৫) আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের কার্য্যক্ষেত্র এক একটা প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয় ; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ হ'তেই এ কথা বোঝা চলে ; সেই জন্যে সমগ্রজাতির স্বার্থ দেখে কেবল কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃকই মজুরি নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক ; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার শাসন নীতি (কন্‌ষ্টিটিউশান্) অনুযায়ী এ ব্যাপার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার বাইরে ; এর একমাত্র উপায়—শাসননীতি পরিবর্ত্তিত করা ; এ জন্যে পূর্ব্বে ৪ বার চেষ্টা হ'য়েছিল—৪ বারই চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে ; স্বাধীনতা খর্ব্ব করতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলার দারুণ অনিচ্ছা জাতির আর্থিক উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ফলাফল

রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক মজুরি-নির্দ্ধারণের ফলাফল কি রকম দাঁড়িয়েছে ? কয়েকটা সুফলের উল্লেখ করা যাচ্ছে :—

(১) নিতান্ত অল্প মজুরিতে অনেকক্ষণ খাটানো—এই কদর্য্য প্রথা একেবারে উঠে গিয়েছে।

(২) যুদ্ধের ও যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে মজুরদের জীবনধারণের প্রণালী

যে স্তরে ছিল, তা তার বেশী নীচে নামে নি। এবং এখন তার চেয়ে অনেকটা অগ্রসর হ'য়েছে।

বিপক্ষে যেসব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হয়, তার কয়েকটা এইরকম :—

(১) মজুরদের জীবনধারণ-প্রণালী ইয়োরোপীয় শ্রমিকদের চেয়ে উন্নত হ'য়েছে বটে, কিন্তু নিম্নতম মজুরি প্রথা প্রবর্ত্তন করা সত্ত্বেও, তা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের জীবনধারণ-প্রণালীর চেয়ে এখনও অনেক নীচে।

(২) শিল্পগুলার মাহিনা দেবার ক্ষমতা এ পর্য্যন্ত বিবেচনা না করাতে, মজুরি-নির্দ্ধারণ শিল্পগুলার উন্নতির পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ;

(৩) বেকারের সংখ্যা কমে নি ;

(৪) মজুরদের পটুতার তারতম্য অনুযায়ী মজুরি নির্দ্ধারণ করা হয় নি ;

(৫) মজুরদের জীবনযাত্রা-প্রণালী একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠির সহায়তায় স্থিরীকৃত হওয়ায়, তার বাড়্‌বার অবকাশ কেড়ে নেওয়া হ'য়েছে ;

(৬) মনিব-মজুরের বিপদ কম্‌বে এই উদ্দেশ্যেই আদালতগুলাকে প্রথম স্থাপন করা হ'য়েছিল ; কিন্তু মনিব-মজুরের বিবাদ কমে নি. ১৯১৯ সন হইতে ১৯২৩ সনের মধ্যে ২৩৫৭টি ধর্ম্মঘট হ'য়েছিল, এতে ১ কোটি ১০ লক্ষ কাজের দিন নষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আপত্তির কথা শোনা গিয়েছে বটে, কিন্তু ওগুলা এখনও প্রমাণ করা হয় নি। কারণ—(ক) যত কাজের ঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে বলা হ'য়েছে, তা খুব বেশী নয়। বিচারপতি ম্যাক্‌কলি দেখিয়েছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক মজুর বছরে মাত্র ২ দিন ছুটী নিলে, ঠিক

অতগুলা কাজের দিন নষ্ট হবে; (খ) যে সময়ে আপোষ আদালত-গুলা কাজ কর্‌ছিল সে সময়ে জগতের সর্ব্বত্রই মজুরদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়াতেও ঠিক ঐ সময় যে মজুরদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেবে, তা বিচিত্র নয়। প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম—এই কয়টি যুক্তি যে একেবারে অমূলক নয়, তা বলা চল্‌তে পারে।

রাষ্ট্র কতগুলা মজুরের রক্ষাকর্ত্তা

দোষগুণের বিচার ছেড়ে দিয়ে এখন অষ্ট্রেলিয়ার মোট কৃতিত্বটুকুর কথা বলা যাক্। অষ্ট্রেলিয়ায় এখন যত শ্রমিক আছে, তার তিন-চতুর্থাংশের মজুরি রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, কেরাণী, কারিগর, অভিনেতা, সংবাদপত্র-চালক, গায়ক, ছুতারমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর শ্রমিক এই সুবিধা ভোগ ক'র্‌ছে। ১৯১৮ সনে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যেসব কর্ম্মচারী বার্ষিক ৯৮ হইতে ১০০০ পাউণ্ড মাহিনা পায়, তাদের মজুরিও আদালতের সাহায্যে স্থিরীকৃত কর্‌বার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছে। কুইন্সল্যাণ্ড, সাউথ অষ্ট্রেলিয়া, নিউসাউথ ওয়েল্‌স্ গবর্ণমেণ্টও স্ব স্ব কর্ম্মচারীদের এই সুযোগ দিয়েছে।

দুর্গম পথে যাত্রার সাহস

লোক-সংখ্যার দিক্ হ'তে দেখ্‌লে অষ্ট্রেলিয়া-বাসীরা অতি ক্ষুদ্র জাতি। অষ্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও মাত্র সেদিনের ব্যাপার। কিন্তু ক্ষুদ্র ও নবীন হ'লেও অষ্ট্রেলিয়া অর্থনৈতিক জগতের একটি দুর্গম ও অজানা পথে যাত্রা কর্‌বার যে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিয়েছে, তা হ'তে জগতের অনেক পুরাণো ও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিরও শেখ্‌বার অনেক কিছু জুট্‌বে।

ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা

আমরা প্রাচীন পন্থী নই

ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি কোন্ পথে চল্‌বে এ নিয়ে এখনও আমাদের দেশে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এখনও আমাদের দেশে একদল লোক আছেন, যাঁরা ভারতের প্রাচীন কুটীরশিল্প ও কৃষিকেই জাতির আর্থিক জীবনের ভিত্তি ক'রে আঁকড়ে থাকতে চান। আধুনিক আর্থিক প্রণালীর নানা কুফল এঁদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। আধুনিক আর্থিক প্রণালীর বৃদ্ধি হ'লে দেশের সর্ব্বনাশ হবে, আমাদের পারিবারিক প্রথার উচ্ছেদ হবে, পল্লীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'য়ে যাবে, ধনিকে শ্রমিকে বিবাদ বেঁধে দেশের শান্তির ব্যাঘাত কর্‌বে—এইরকম কত কি ধারণা এঁদের পেয়ে বসেছে।

ইয়োরামেরিকা আমাদের গুরু

আমরা কিন্তু আধুনিক আর্থিক প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু ভয়ের কারণ দেখি না। ইয়োরামেরিকার বর্ত্তমান আর্থিক জীবনের কুফল আছে, তা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই কুফলগুলার ভয়ে ওদের আর্থিক প্রণালীর সুবিধাগুলা ছাড়্‌তে আমরা মোটেই রাজী নই। আমরাও ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠ দেশগুলার মতই ভারতকে ধনী কর্‌তে চাই। দরিদ্র ভারত চিরকাল জগতের শোষণভূমি থাকবে—এটা আমরা চাই না। আধুনিক আর্থিক প্রণালীর কুফলগুলা দেখেও আমরা ভয়ে জড়সড় হই না। ইয়োরামেরিকা সেগুলা দূর কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

আমরাও তেমনি সেগুলার সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই করতে চাই। অতীতের একটা কল্পিত মোহময় ছবিতে আমরা আর ভুলে থাকতে চাই না। জগতের উন্নতিশীল জাতিগুলার সঙ্গে পা ফেলে চলবার জন্যে আজ আমরা নিতান্ত ব্যাকুল।

আধুনিক জগতের সঙ্গে যদি সমানভাবে চলতে হয়, তা হ'লে আধুনিক জগতের আর্থিক প্রকৃতিটা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা থাকা দরকার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি, বিলাত, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও রুশিয়া এই ৭টি সেরা দেশের আর্থিক জীবন কি প্রণালীতে চালিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমাদের গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। ঐ কয়টি দেশের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারলেই আমরা ভারতকে আর্থিক হিসাবে আধুনিক ক'রে তুলতে পারবো।

আর্থিক হিসাবে স্বাবলম্বী জনকেন্দ্রের লোপ

জগতে যখন জীবনযাত্রার প্রণালী অত্যন্ত নীচু ও সরল ছিল, তখন আর্থিক জীবন সম্বন্ধে বিদ্যার উন্নতিও হয় নি। এবং তখন এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তখন পল্লীগুলা স্ব স্ব অভাব মিটিয়ে নিত, বাহির হ'তে খুব কমই জিনিষ কেনার দরকার হ'ত। সহরগুলা কাছাকাছি পল্লীগুলা থেকেই যা দরকার কিনে নিত। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য তখন সামান্যই ছিল। দেশের সীমানার মধ্যেই বাণিজ্য প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। তাও দেশব্যাপী ছিল না। এক এক স্থানের উৎপন্ন জিনিষ দেশের সর্ব্বত্রই যে বিক্রী হ'ত তা নয়, উৎপাদন-কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থানেই বিক্রী হ'ত।

আধুনিক আর্থিক জগতের স্বরূপ

বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার, রেল ও ষ্টীমারের উদ্ভাবন, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার প্রচলন এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের বিস্তার, এই অবস্থা একেবারে বদ্‌লে দিয়েছে। এইসব উদ্ভাবনের ফলে যে প্রচণ্ড শিল্প-বিপ্লব জগতে দেখা দিয়েছে, তার ফলে জগতের আর্থিক জীবন প্রধানতঃ দুদিক্ থেকে ব'দলে গেছে।

প্রথমতঃ, মানুষের আর্থিক কার্য্যক্ষেত্র এখন আর পল্লী, সহর, জেলা বা দেশের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। বিশাল দুনিয়া এখন মানুষের আর্থিক কার্য্য-কলাপের কর্ম্ম-ভূমি। জগতের এক কোণে যেসব জিনিষ উৎপন্ন হচ্ছে, সেগুলা আজ নানা দেশে প্রেরিত হচ্ছে। বড় বড় ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী প্রভৃতি জগতের নানা কেন্দ্রে নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র খুলেছে। নিতান্ত পশ্চাৎপদ্ জায়গাগুলা ছেড়ে দিলে, সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি অংশ এখন আর্থিক হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। জগতের অবস্থা এখন এমন যে, একস্থানের আর্থিক পরিবর্ত্তন ঘট্‌লে তার প্রভাব জগতের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়্‌তে বেশী সময় লাগে না।

দ্বিতীয়তঃ, আগেকার প্রণালীমত সামান্য পুঁজি, সামান্য যন্ত্রপাতি ও কয়েকটি লোকজন নিয়ে এখন ধনোৎপাদন চলে না। এখন উৎপাদনে লাগতে গেলে চাই অসংখ্য দফা—মজুর, প্রচুর টাকা, নানা কলকারখানা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী বাড়ী, কাঁচা মাল আনবার ও তৈরী মাল পাঠাবার জন্যে বৃহৎ বৃহৎ রেলষ্টিমার প্রভৃতি। তা ছাড়া টাকার সাহায্যের জন্যে চাই, বড় বড় ব্যাঙ্ক, লোকসান বাঁচাবার জন্যে চাই বীমা কোম্পানী, কলকব্জা তৈরীর জন্যে চাই ফ্যাক্টরী ও ইস্পাত তৈরীর কারখানা, রেল ও জাহাজ তৈরীর জন্যে চাই

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী ও ডক্, ইস্পাত তৈরীর জন্যে চাই লোহা, কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজের খনি চালানো। গাছ থেকে তূলা এনে, সূতো কেটে, কাপড় বুনে, নিজে হাটে গিয়ে কাপড় বেচে এলুম; কাঁচা চামড়া ট্যান ক'রে, তা থেকে জুতা তৈরী ক'রে বেচলুম—এ সব প্রণালী আধুনিক জগৎ থেকে একেবারে উঠে গেছে বল্‌লেই হয়। আধুনিক আর্থিক জগতের গড়ন বল্‌তে বুঝ্‌তে হবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধনসৃষ্টির প্রতিষ্ঠান—আর এদের প্রত্যেকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্বন্ধ। ছোট-খাট প্রতিষ্ঠান যে একেবারে নেই, তা বল্‌ছি না; কিন্তু সেগুলা বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলার আওতায় প্রধানতঃ তাদেরই প্রয়োজনসিদ্ধি করবার জন্যে টি‍ঁকে আছে।

আধুনিক আর্থিক জগতের প্রকৃতির দুটা বিশেষত্ব দেখানো গেল। এ থেকেই বোঝা যাবে যে, আধুনিক আর্থিক জীবন বেশ জটিল হ'য়ে উঠেছে এবং একে বোঝ্‌বার ও বিশ্লেষণ কর্‌বার জন্যে একটি পৃথক্ বিদ্যারও বেশ প্রয়োজন আছে। ধনবিজ্ঞান নামক বিদ্যা সেই অভাব পূরণ ক'রেছে। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক আর্থিক জীবনের বৃদ্ধি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ধনবিজ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটেছে। সেই জন্যে আর্থিক হিসাবে জগতের শ্রেষ্ঠ দেশগুলাকে বুঝ্‌তে হ'লে ধনবিজ্ঞানের সাহায্য না নিলে চল্‌বেই না।

আর্থিক জীবনের সেনাপতি—ধনবিজ্ঞান-সেবী

বর্ত্তমান জগতের উন্নত জাতিগুলার জীবনে ধনবিজ্ঞানসেবীর স্থান অতি উচ্চে। আধুনিক জগতে কোন জাতির জীবন-ধারণই অসম্ভব, যদি না সেই জাতিতে শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানসেবী থাকেন। একটি জাতির মধ্যে ধনোৎপাদন ও ধন-বিতরণের জন্যে নানা শ্রেণীর লোক ও

প্রতিষ্ঠান থাকে। ফ্যাক্টরীপতি, মজুর, ব্যবসাদার, দালাল, দোকানদার, ব্যাঙ্ক-পরিচালক, বীমা কোম্পানীর কর্তা, কেরাণী, মিস্ত্রী, চাষী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক তাদের চেষ্টায় আধুনিক সমাজের অভাবগুলা মেটাচ্ছে। কিন্তু এদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোকই নিজ নিজ ব্যবসা বা পেশার জন্যে যা জানা দরকার, তার বেশী খবর রাখে না। যারা প্রকৃত আর্থিক কাজকর্ম্মে লিপ্ত—তাদের পক্ষে জাতির আর্থিক জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। জাতির আর্থিক জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখাবার ও চালাবার দায়িত্ব নিয়েছেন ধনবিজ্ঞানসেবী। আধুনিক সেনাপতি যেমন সৈন্যদের কিরূপে পরিচালিত করতে হবে, তা যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে দূরে অবস্থিত শিবিরে থেকে নির্দ্দেশ ক'রে দেন, অথচ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন না, তেমনি ধন-বিজ্ঞানসেবী আর্থিক জীবনের কর্ম্মীবৃন্দের সঙ্গে প্রকৃত ধনোৎপাদনে নামেন না; কিন্তু দূর হ'তে তাদের কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন।

সুতরাং, আধুনিক জগতের আর্থিক অভিজ্ঞতাগুলা হজম করা ও সেগুলা ভারতীয় জীবনে খাটানোর ভার কেবল ধনবিজ্ঞানসেবীরই লওয়া সম্ভব। যদি আমরা সামান্য খেয়ে, সামান্য প'রে, সামান্য বাড়ীতে থেকে জীবন কাটিয়ে দিতে চাইতুম, তা হ'লে ধনবিজ্ঞানসেবীর সাহায্য নেবার দরকার হ'ত না। কিন্তু আগেই ব'লেছি, জাতিহিসাবে আমরা মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকৃতে রাজী নই, অথবা আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী আরও উন্নত করতে চাই। ইয়োরামেরিকার উন্নত দেশগুলা তাদের জনসাধারণের বেশীর ভাগকে যেমন ঐশ্বর্য্য ও আরামে রাখছে, আমরাও আমাদের দেশবাসীকে তেমনই ঐশ্বর্য্য ও আরামের মধ্যে রেখে এদের মনুষ্য-জীবন সার্থক ক'রে তুলতে চাই। সেই জন্যে, আধুনিক আর্থিক

জীবনের সকল রহস্য আমাদের আয়ত্ত কর্‌তেই হবে, এবং তা কর্‌তে হ'লে ধনবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান-সেবীর সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের লক্ষ্য—দারিদ্র্যের চির-নির্ব্বাসন

কেবল ভারতের লোকদেরই ধনী ক'রে তোলা আমাদের আদর্শ নয়। আমরা চাই না যে ভারতের সমৃদ্ধি বাড়ুক, আর জগতের অন্য দেশগুলার সর্ব্বনাশ হোক্। জগতের কোন দেশের অন্যায়ভাবে ক্ষতি ক'রে আমরা আমাদের সমৃদ্ধি চাই না। প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তি মানুষের মত থাক্‌বার সুযোগ পাক, ধনৈশ্বর্য্যের লোভে জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে সকল হিংসাদ্বেষের অবসান হোক্, এটাই আমাদের একান্ত ঈপ্সিত লক্ষ্য।

এই জন্যেই আমরা জগৎ থেকে দারিদ্র্য একেবারে নির্ব্বাসিত কর্‌তে চাই। জগতের অনেক জায়গাতেই এখনও দারিদ্র্যের পূর্ণ রাজত্ব, এই রাজত্ব লোপ পাওয়ানো-ই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। জগতে এমন অবস্থা আমরা সৃষ্টি কর্‌তে চাই—যে কোন মানুষ—পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু—সাধারণ খাওয়া পরার অভাব যেন আদবেই বোধ না করে।

টাকাই একমাত্র কাম্য নয়

টাকাকড়ি, সাংসারিক সুখ মানুষের একমাত্র কাম্য নয়, তা আমরা জানি। কেবল খাওয়া-পরা ও ভোগ করাই মানুষের জীবনের সমস্তটা নয়, এটা আমরা গভীরভাবেই উপলব্ধি করি। মানুষ সাহিত্য বা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করুক, ছবি আঁকুক, গান গাক। পরস্পরের সঙ্গে মনের আনন্দে মিশে সে নিজের ও পরের জীবন মধুময় করুক। চিন্তার বোঝা দূরে

ফেলে দিয়ে প্রকৃতির কোলে ছোট শিশুর মতই প্রাণ খুলে খেলা করুক, মানুষের জীবনে যার চেয়ে বড় কিছু হ'তে পারে না—সেই ঈশ্বরের আরাধনায় নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে ফেলুক, তবেই ত' সে তার জীবনের সার্থকতা বোধ করবে।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় জগতের কটা লোক নিজের জীবন এমনভাবে সার্থক ক'রে তুলতে পারে? কটা লোক বলতে পারে যে, সে যে কাজে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করতে চায় অথবা নিজের প্রতিভা ফুটিয়ে তুলতে চায়, সেই কাজেই হাত দিতে পেরেছে? জগতের অধিকাংশ লোক, তাদের চেষ্টা ও সময় খাওয়া-পরার অভাবটা মেটাবার চেষ্টাতেই কাটাচ্ছে। অনেকে প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রে তাও করতে পারছে না। অনেকে আবার পার্থিব অভাবগুলা মেটাবার আর কোন উপায় না দেখে চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতেও লিপ্ত হ'য়ে পরের ও নিজের সর্ব্বনাশ করছে।

মানুষের জীবনকে উন্নত করবার ও তাকে উপযুক্ত গৌরবে মণ্ডিত করবার পথে প্রচণ্ড বাধা হচ্ছে এই দারিদ্র্য। দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান না হ'লে মানুষের প্রকৃত সভ্য হবার সম্ভাবনা নেই। বর্ত্তমানে মানুষের জীবনকে সার্থক করবার নানা চেষ্টার মধ্যে দারিদ্র্য দূর করবার চেষ্টার মত বড় আর কিছু নেই।

দারিদ্র্যের ঔষধ কোথায়?

কিন্তু বর্ত্তমান জগতে কি প্রণালীতে ধনের সৃষ্টি ও বিতরণ হয়, সে সম্বন্ধে যদি আমাদের গভীর জ্ঞান না থাকে, তা হ'লে এই দারিদ্র্যের দাওয়াই আমাদের পক্ষে বাৎলানো কি সম্ভব? একথা খুব জোরের

সঙ্গেই বলা চলে যে, জগতের বর্ত্তমান আর্থিক গড়নের প্রকৃত স্বরূপটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না কর্‌তে পারলে—ভারতেরই কি বা অন্য দেশেরই কি—কোন দেশেরই আর্থিক উন্নতির প্রকৃত পথের সন্ধান দেওয়া আমাদের সম্ভব হবে না।

মস্তিষ্ক-চালনায় আনন্দ

দেশের বা জগতের আর্থিক উন্নতির জন্যে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা কর্‌তে পারি। পরোপকারের স্পৃহা নিয়ে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার একটা বড় আবিশ্যকতা আছেই। আর এই পরোপকারের ইচ্ছা নিয়ে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা কর্‌লে জীবনে যে একটা বড় সার্থকতা বোধ করা যায়, তা বোধ হয়, বিশেষ ক'রে বোঝাবার দরকার নেই। কিন্তু পরোপকার কথাটা ছেড়ে দিলেও নিছক বিদ্যা হিসাবেও ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার একটা বিরাট সার্থকতা আছে—তা কেউ অস্বীকার কর্‌তে পারবে না। মানুষ জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসে। মস্তিষ্ককে যতই খাটানো হয়, ততই বেশ একটা আনন্দ পাওয়া যায়। যাদের মস্তিষ্কের শক্তি কম, তাদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু যাদের মাথায় ঘী আছে, তারা জটিল শাস্ত্র বা বিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে বেশ একটা নিবিড় আনন্দ পায়। এদিক্ থেকে দেখ্‌লেও ধনবিজ্ঞানের একটা বিশেষ দাম আছে। নানা জটিল ও দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্রের মধ্যে ধনবিজ্ঞান যে একটা মর্য্যাদা-জনক স্থান অধিকার করতে পারে, যাঁরা ধনবিজ্ঞানে কিছু প্রবেশও ক'রেছেন, তাঁরা বোধ হয় এ কথাটি বিনা আপত্তিতে স্বীকার ক'রে নেবেন। সুতরাং, ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে যে মাথা খাটাবার অফুরন্ত আনন্দ পাবার সুযোগের অভাব হবে না, তা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা চলে।

বাঙ্গালী হবে সবার সেরা

বিদ্যার কোন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জগতের পশ্চাতে কেন প'ড়ে থাকবে, তার কোন মানে নেই। কয়েকটা বিদ্যায় জন-কয়েক বাঙ্গালী যে জগদ্বিখ্যাত হ'য়েছেন, তা শ্লাঘার কারণ বটে। কিন্তু, ধনবিজ্ঞানের মত জাতির দিক্ থেকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিদ্যায়, কয়জন বাঙ্গালী জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে সমানভাবে মেশবার ক্ষমতা অর্জ্জন ক'রেছেন? ২।৩ জন মাত্র। ৫ কোটি বাঙ্গালীর পক্ষে এটা কি লজ্জার কারণ নয়? বিশ্ববিদ্যালয়ে ত' ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা অনেক দিন ধ'রেই চলছে। তবু কেন বাঙ্গালী এক্ষেত্রে নিজ কৃতিত্ব এমনভাবে দেখাতে পারছে না, যাতে জগতের দৃষ্টি বাঙ্গালীর দিকে হাঁ ক'রে ফিরে থাকে? আমাদের মনে হয় যে, এর একমাত্র কারণ—আমাদের আন্তরিক চেষ্টার অভাব। কোন রকমে ভাসা ভাসা একটু বিদ্যা অর্জ্জন ক'রেই আমরা অহঙ্কারে ফুলে থাকি। জগতের প্রধান পণ্ডিতগুলার তুলনায় আমরা কত ছোট, তা ভাবিই না। চেষ্টা করলে তাদেরও যে ছাড়িয়ে যেতে পারি, সে চিন্তাও আমাদের মনের একটু কোণেও স্থান পায় না। আমাদের এই নিশ্চেষ্টতা, জড়তা, অসার গর্ব্ব ও শ্রমবিমুখতা কি কোন কালেই ধ্বংস হবে না? ধনবিজ্ঞানে বাঙ্গালী তার দক্ষতা দেখিয়ে জগতের পণ্ডিত-মহলকে চমকিত ও লজ্জিত ক'রে তুলবে, এমন দিন কি আসবে না? জগতের অন্য দেশগুলা নানা বিদ্যার সৃষ্টি করবে, আবার সেগুলা দিনের পর দিন উন্নতও করবে, আর আমরা চিরকাল ধ'রে তাদের চিন্তারাশি কেবল মুখস্থই করতে থাকবো! এমন দিন কি আসবে না যে, ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্যে ভারতীয় পণ্ডিতদের সংস্পর্শও ও শিক্ষা চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু ব'লে মনে করবেন?

আশার আলো

সেদিন যে আস্‌লেও আসতে পারে, তার চিহ্ন আজ কিছু কিছু বাঙ্গালাদেশে দেখা যাচ্ছে। ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় উৎসাহ-বোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে ধনবিজ্ঞানবিদ্যা ক্রমেই প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ছে। আগে ছাত্রেরা ধনবিজ্ঞানকে কঠিন বিষয় ভেবে যতটা পারতো দূরে রাখতো। কিন্তু এখন ছাত্রেরা দলে দলে ধনবিজ্ঞানের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হচ্ছে। ৮।১০ বছর আগে যত ছাত্র ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা কর্‌ত, এখন তার অন্ততঃ ৩।৪ গুণ বেশী ছাত্র ধনবিজ্ঞানের পড়াশুনা কর্‌ছে। ছাত্রীদের মধ্যেও ধনবিজ্ঞান যে প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ছে, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সাধারণেও আজকাল ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চায় বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছে; নানাশ্রেণীর সংবাদপত্রে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা-বৃদ্ধিই ইহার প্রমাণ। মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-গুলার অর্থনৈতিক প্রবন্ধ-বৃদ্ধি পাওয়া থেকেও এটাও বোঝা চলে যে, ধনবিজ্ঞানের লেখকের সংখ্যাও বাড়্‌ছে। কয়েকজন বাঙ্গালী অধ্যাপক ইংরেজীতে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটা প্রথম শ্রেণীর কেতাবও রচনা ক'রেছেন।

বেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশান

আরও আশার কারণ এই যে, বাঙ্গালী ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্যে দুটি প্রতিষ্ঠান কায়েম ক'রেছে—(১) বেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশান; (২) বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ।

প্রথমটি স্থাপিত হয় ১৯২৪ সনে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে, বাঙ্গালীর অর্থনীতি আলোচনার ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ডকৃটর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এটি স্থাপিত হয়। যেসব অধ্যাপক ধনবিজ্ঞান-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, তাঁদের প্রায় সকলেই এটির সহিত সংশ্লিষ্ট। উক্ত অ্যাসোসিয়েশান ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আলোচনা ক'রে থাকেন। এ পর্য্যন্ত এঁরা নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আনিয়ে অনেকগুলা বক্তৃতার বন্দোবস্ত ক'রেছেন। কয়েকটার উল্লেখ করা যাচ্ছে:—(১) "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালীন রাজস্ব" সম্বন্ধে ডকৃটর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা; (২) "ভারতীয় রাজস্ব" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গারের বক্তৃতা; (৩) "সমবায়" সম্বন্ধে সার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের বক্তৃতা ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতার সাহায্যে ছাত্রগণ ও জনসাধারণের মধ্যে ধনবিজ্ঞানের জ্ঞানবিস্তার ও ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার উৎসাহ-বর্দ্ধনই এই অ্যাসোসিয়েশানের প্রধান কার্য্য-প্রণালী ব'লে মনে হয়।

বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় এটির স্থাপনা হয়। "টাকার কথা" রচয়িতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়ের উৎসাহেই অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এই পরিষৎ স্থাপনে উদ্যোগী হন।

বাংলা ভাষায় (ক) ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা, আর (খ) দুনিয়ার নানা দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় এবং কর্ম্মকৌশল সম্বন্ধে আলোচনাই এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই পরিষদের কর্ম্মপ্রণালীর কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যাচ্ছে:—

(১) বই পড়া বিদ্যার ওপরই এই পরিষৎ নির্ভর করেন না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের বিদ্যাটা আয়ত্ত করা দরকার, তা স্বীকার কর্লেও, এই পরিষৎ "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা" ও "মোলাকাতের" সহায়তায় মৌলিক গবেষণা চালাবার পক্ষপাতী।

(২) ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, আর্থিক জীবনকে বোঝবার ও তাকে উন্নত কর্বার জন্যে দুনিয়ার নানা দেশের বর্ত্তমান আর্থিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া এই পরিষৎ বিশেষ আবশ্যক ব'লে মনে করেন।

(৩) বিদ্যা-চর্চ্চা বিষয়ে দুনিয়ার নানাদেশের সঙ্গে নিবিড় আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপনের জন্যে পরিষৎ কেবল ইংরেজী ভাষার ওপর নির্ভর না ক'রে, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষার সাহায্য নেওয়াও যে বিশেষ আবশ্যক, তা স্বীকার করেন।

(৪) এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন আর স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে আর্থিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা করা এই পরিষদের দস্তুর।

(৫) পরিষৎ বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের আলোচনা চালিয়ে থাকেন এবং বাংলাভাষাকে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ে সমৃদ্ধ কর্তে সচেষ্ট আছেন।

(৬) স্থায়ী গবেষক ও লেখকের সাহায্যে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা চালানো এই পরিষদের আর একটি বিশেষত্ব।

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি এ, এফ আর ই এস্ ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম এ, বি এল এবং বর্ত্তমান গ্রন্থকার পরিষদের অবৈতনিক গবেষকরূপে নিযুক্ত হ'য়েছেন।

পরিষদের কার্য্যাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল :—

১। পরিষদের গবেষকগণ এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বিষয়ে গবেষণা ক'রেছেন :—(১) ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা; (২) খিদিরপুরের কিং জর্জ্জেস ডক; (৩) কয়লার খনির মজুরদের অবস্থা।

২। এ পর্য্যন্ত পরিষদের নয়টি অধিবেশন হ'য়েছে এবং এই সব অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলা আলোচিত হ'য়েছে :—(১) ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিষ্যৎ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; (২) সার্ব্ব-জনীন স্বাস্থ্যের অর্থকতা—ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল; (৩) বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙালী—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত; (৪) কয়লার খনির মজুর—বর্ত্তমান গ্রন্থকার; (৫) বাংলার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী; (৬) কিং জর্জ্জ ডক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; (৭) ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে; (৮) কৃষির বর্ত্তমান সমস্যা—অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর মল্লিক; (৯) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়। প্রত্যেক বিষয়ের পাশে প্রধান আলোচকের নাম দেওয়া হ'য়েছে।

৩। "আর্থিক উন্নতি" নামক ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক একটি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রকে পরিষদের মুখপত্র হিসাবে চালানো হচ্ছে। এই মাসিক পত্রটির সাহায্যে ইতিমধ্যেই বাংলাভাষায় ধনবিজ্ঞানের আলোচনার যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হ'য়েছে, তা বলা চলে। "আর্থিক উন্নতি"র মারফত বাংলাভাষাভিজ্ঞ নরনারীকে বি এ, এম এ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান পড়ানো পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য।

৪। ধনবিজ্ঞানের দুইখানি শ্রেষ্ঠ কেতাব, রিকার্ডোর অর্থনৈতিক রচনাবলী ও হেনির অর্থনৈতিক মতবাদের ইতিহাস—পরিষদের দু'জন

গবেষক (শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক ধারাবাহিকভাবে অনূদিত হচ্ছে।

৫। পরিষৎ "ধনবিজ্ঞান গ্রন্থমালা" এই নামে পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের বন্দোবস্ত ক'রেছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়ের "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা" এই গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তিকা ও বর্ত্তমান প্রবন্ধ ইহার দ্বিতীয় পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

৬। পরিষদের গবেষকগণ নানা বিষয়ের গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় ভারতীয় রাজস্ব সম্বন্ধে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে রিকার্ডোর আর্থিক মতাবলী সম্বন্ধে পড়াশুনা ও গ্রন্থ রচনা করছেন। বর্ত্তমান লেখক "ভারতে কারখানা শিল্পের প্রবর্ত্তন" "সম্বন্ধে গবেষণা করছেন এবং বি এ শ্রেণীর পাঠ্য হবার যোগ্য "ধনবিজ্ঞানে হাতে খড়ি" নামে গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত আছেন।

৭। পরিষদের গবেষকগণ ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা শিখ্‌তে সুরু ক'রেছেন।

বিজয়—অভিযানের সূচনা

বাংলায় ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা যে রীতিমত সুরু হ'য়েছে, তা দেখানো গেল। কিন্তু জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ফরাসী, ইংরেজ এই কটা জাতি যতটা আন্তরিকতার সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করে এবং ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে যে ভাবে তারা সমৃদ্ধ ক'রেছে, আমরা তার তুলনায় এখন অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি। তবে বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষদের ভিতরে ও বাইরে যেসব চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, তাতেই মনে হয় যে, বাঙ্গালী ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার আবশ্যকতা অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও বুঝেছে এবং ধনবিজ্ঞানে তার শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্যে সে ক্রমশঃ দৃঢ়তা দেখাচ্ছে। জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ইংরেজ বা ফরাসী পণ্ডিত ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বাঙ্গালী পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার কর্‌বেন, সে সময় আস্‌তে হয়ত এখনো অনেক দেরী, কিন্তু সে সময় যে আস্‌বেই তার সূচনা এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে।

নয়া বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি ও অর্থশাস্ত্র

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের সহিত গ্রন্থকারের আলোচনা]

প্রঃ—মফঃস্বলের কাগজগুলা প'ড়ে দেখ্‌লাম। তার বেশীর ভাগই বাজে মাল নয় কি?

উঃ—কিন্তু এই কাগজগুলাকেই "আর্থিক উন্নতি"র "বাংলার সম্পদ্‌" বিভাগের ল্যাবরেটারী বলা চলে। কল্‌কাতায় ব'সে কল্‌কাতার কাগজপত্র প'ড়ে কল্‌কাতার বাইরে বাংলার আথিক জীবন কোন্‌ ভাবে চলেছে, তা ধারণা করা শক্ত। এই কাগজগুলার ভেতর দিয়েই বাংলার আথিক অবস্থা অনেকটা বোঝা যায়।

প্রঃ—তা সত্যি. প্রকৃত বাঙ্গালা দেশ যে কি অবস্থায় আছে, তার সম্বন্ধে ধারণা এই ধরণের কাগজের সাহায্যেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আথিক খবর তেমন বেশী পরিমাণে এই সমস্ত কাগজে পাওয়া যায় না; রাজনীতির চর্চ্চাই প্রধান স্থান পায়; তাই নয় কি?

উঃ—হাঁ তা সত্যি, রাজনীতির চর্চ্চাও আবার উঁচু ধরণের হয় না; নিতান্ত তরল আলোচনারই আধিক্য দেখা যায়। তবে, আর্থিক দিক্‌ থেকে এদের কাছে যতটুকু সাহায্য পাই, তার দাম কম নয়। বাংলার প্রত্যেক স্থলে লোকজনের অবস্থা কেমন উঠ্‌ছে, নাম্‌ছে, কোথায় নূতন ফ্যাক্টরী বা সহর গ'ড়ে উঠ্‌ছে, এই সব খবর সংগ্রহ ক'রে বাঙ্গালীর সাম্‌নে আমি টাট্‌কা টাট্‌কা ধর্‌তে চাই। এই কাগজগুলা ছাড়া এই ধরণের খবর যোগাড় কর্‌বার আপাততঃ আর কোনও উপায় নেই। জায়গায়

জায়গায় লোক পাঠিয়ে বা নিজে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করাও অবশ্য সম্ভব, কিন্তু তাতে পয়সা লাগে, কাজেই তত সহজ নয়।

প্রঃ—কেন গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টগুলা থেকে ত' অনেকটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

উঃ—পাওয়া যেতে পারে বটে; কিন্তু রিপোর্টগুলাতে সাধারণতঃ টাট্‌কা খবর পাওয়া যায় না। এগুলা হ'তে যা কিছু জানা যায়, তা সাধারণতঃ রিপোর্ট বেরোবার অন্ততঃ বছর দু' এক আগে ঘটে থাকে। আর ওগুলা এক একটা বিষয়ের দিক্ থেকে সমগ্র ভারতের বা সমগ্র বাংলার কথা আলোচনা করে। কিন্তু তাতে বিশেষ বিশেষ স্থানের বা বিশেষ বিশেষ জাতের ও সম্প্রদায়ের কেমন ওঠা-নামা চল্‌ছে, তার গভীরত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। সেই জন্যে বাংলা দেশের সর্ব্বত্র যদি ধনবিজ্ঞান-বিদ্যায় পারদর্শী লোকদের সংবাদদাতারূপে পাওয়া যেতে পার্‌তো, তা হ'লে তাদের নিয়মিতরূপে-পাঠানো রিপোর্টের সংগ্রহ থেকে বাংলার আর্থিক জীবনের ধারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, তা নিখুঁতভাবে ও বিনা বিলম্বে ধরা যেতে পার্‌তো।

প্রঃ—তা হ'লে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালীটাই দেখ্‌ছি আপনার হাতে একদম্ বদ্‌লে যাচ্ছে?

উঃ—আমি চাই লালদীঘির জল গোলদীঘিতে এনে ঢাল্‌তে। কৃষি শিল্প-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতাগুলা লিখিয়ে পড়িয়ে লোকের মগজে প্রবেশ করানো আমার এক বড় ধান্ধা। ব্যবসা পাড়ার ধরণধারণটা ইস্কুল-পাড়ার ভেতর আন্‌তে পারলেই আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তাপ্রণালী আর আর্থিক জীবন আগাগোড়া ব'দলে যেতে পারবে। সেই দিকেই আমার এখন বেশী লক্ষ্য। আমার প্রণালী হচ্ছে, এক সঙ্গে বহুসংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের

আর্থিক ঘটনা আলোচনা করা, মানুষের আর্থিক জীবনের নানা দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া। "আর্থিক উন্নতি"র প্রথম তিনটি ভাগে ধনবিজ্ঞানের "তত্ত্ব" (থিওরি) একটুও স্থান দিই না। এগুলা শুধু নিছক "ঘটনা" আর "অঙ্কে" ভরা। এদের সাহায্যে মানুষের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে নিরেট পরিচয় হওয়া সম্ভব হয়।

প্রঃ—ধনবিজ্ঞানের নামজাদা পণ্ডিতদের বই পড়া সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?

উঃ—ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় ওস্তাদ হ'তে গেলে শুধু বই পড়্‌লে চল্‌বে না ; ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি—যেমন ব্যাঙ্কিং, ইন্‌শিওরেন্স, বহির্বাণিজ্য, যন্ত্রপাতি, মজুর-সমস্যা প্রভৃতি—এদের সঙ্গে সাক্ষাৎটা বস্তুনিষ্ঠ হওয়া চাই। আর তার জন্যে দরকার প্রথম, ভ্রমণ, পর্য্যবেক্ষণ দেখা-শুনা, আর দ্বিতীয়, নানারকম লোকের সঙ্গে আলোচনা। প্রত্যেক কারবারের বা চিন্তাপ্রণালীর সকল প্রকার প্রতিনিধির সঙ্গে মোলাকাৎ, আর কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না ক'রলে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব।

প্রঃ—একেই কি আপনি বিজ্ঞানসম্মত উপায় বলেন ?

উঃ—নিশ্চয়ই। এছাড়া আর কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীই নেই। এই ধর না যে কৃষিকমিশনের রিপোর্ট সম্প্রতি বেরিয়েছে, সেই কৃষি-কমিশনও ত' ঐ পথই অবলম্বন ক'রেছে। দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রেছে ও নানা রকমের গণ্ডা গণ্ডা লোকের মত সংগ্রহ ক'রেছে। তারপর সেই সমস্ত মত নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রেছে ও কয়েকটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেছে, পরে সেইগুলাকে নানা যুক্তি দিয়ে খাড়া ক'রেছে। এতেই এ কটা বিশেষ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রিপোর্ট লেখা হ'য়ে গেল। ধন বিজ্ঞানের চর্চ্চায় আমি এই ধরণের কমিশনপ্রণালীই অবলম্বন কর্‌তে চাই।

প্রঃ—আমাদের দেশে ধনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বেশী বেরুচ্ছে না কেন ?

উঃ—এ কথাটা ভেবে দেখা দরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত আজ ৭০ বৎসর স্থাপিত হ'য়েছে; কিন্তু তবুও বাঙ্গালীদের মধ্যে উঁচু দরের ধনবিজ্ঞানবিদ্ বেরুচ্চে না। এর কারণ কি ? এর প্রধান কারণ এই যে, আমরা বিদেশীর মাথা থেকে বেরুনো থিওরি, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত-গুলাই মুখস্থ ক'রে থাকি; কিন্তু এই থিওরিগুলা জীবনের সাধারণ ঘটনা-গুলা চর্চ্চা করা থেকেই যে বেরিয়েছে—সে কথা আদবে ভাবি না। ভারতের প্রথম উল্লেখযোগ্য ধনবিজ্ঞানবিদ্ হচ্ছেন দুজন—মারাঠা রাণাড়ে আর আমাদের রমেশ দত্ত। তাঁদের পর অনেকদিন ধ'রে এই বিদ্যার ক্ষেত্রে লোকজনের মতিগতিই দেখা যায় নি। বিগত আট দশ বৎসরের মধ্যে দু'একজন ক'রে লেখক এই ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন। তবুও আজ বাংলা দেশে নিয়মিত ধনবিজ্ঞান লেখকের সংখ্যা খুবই কম।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন কৃষি-কমিশনের সিদ্ধান্তগুলা সবই গ্রহণীয় ?

উঃ—অনেক গুলাই গ্রহণীয় বটে। এ সম্বন্ধে শুধু একটা কথা বল্‌তে চাই। লিন্‌লিথ্‌গো তাঁর রিপোর্টে একটা কথা ব'লেছেন, বৈদেশিক,—বিশেষতঃ ইউরোপীয়—অভিজ্ঞতা না থাকলে ভারতীয় কৃষির উন্নতিসাধন অসম্ভব। উনি অবশ্য এই কথা ব'লেছেন অনেকটা নিজেদের স্বার্থের দিক্ থেকে; কারণ এই অজুহাতে কতকগুলা ইংরেজকে মোটা মাইনের চাকরি দেওয়া সম্ভব হবে; কিন্তু তা হ'লেও কথাটার দাম আছে। ও কথার মূল তত্ত্বটা আমরা নিজেদের কাজে লাগাতে পারি। আমরা আমাদের দেশকে আর্থিক হিসাবে বড় কর্‌তে চাই; কিন্তু তা কর্‌তে হ'লে আমাদের দেশটা আর্থিক জীবনের কোন্ ধাপে আছে,

তা জানা চাই ত? তার পর কোন্ পথে আমাদের চল্‌তে হবে, তাও জানা চাই ত?

প্রঃ—এ জন্যে তা হলে আপনি যুবক বাঙ্গালাকে কি পরামর্শ দিতে চান?

উঃ—আমরা যদি ইয়োরামেরিকাকে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রের বাইরে রাখি, তা হ'লে ঐ দুটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। ইয়োরামেরিকাকে ভাল ভাবে বুঝলে, তাদের বর্ত্তমান পার্থিব জীবন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হ'লে, তবে আমরা বুঝ্‌তে পারবো আমরা পিছিয়ে আছি, না এগিয়ে আছি, যদি পিছিয়ে থাকি ত কতখানি পিছিয়ে আছি, আর কোন্ পথে আমাদের এগোতে হবে। সুতরাং, ইয়োরামেরিকার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হওয়া ভারতীয় আথিক উন্নতির পক্ষে মস্ত সহায়। ভারতীয় স্বদেশসেবকের পক্ষে ইয়োরামেরিকার জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাকিয়া ওটা যারপর নাই জরুরি। এ জন্যেই আমি বলে থাকি, "হ'তে চাস্ স্বদেশী আগে হ' বিদেশী"। মানুষের আর্থিক উন্নতি কতদূর সম্ভব, সেটা ধারণা হবে ইয়োরামেরিকাকে জান্‌লে, ইয়োরামেরিকার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হ'লে; আর যখন এই ধরণের জ্ঞান আয়ত্ত হবে, তখন যে কোন দেশে গিয়ে—তা সে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজই হোক, জাপানই হোক্ বা বাংলাই হোক্—তার আর্থিক জীবন সম্বন্ধে চর্চ্চা কর্‌বার, আথিক পরিবর্ত্তনগুলা পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বার, আর্থিক প্রচেষ্টাগুলাকে ঠিক পথে চালিত কর্‌বার ক্ষমতা জন্মাবে। কেবল ঐ ধরণের লোকেরই যাকে "ইকনমিক্ আই" (অর্থনৈতিক দৃষ্টি) বলা যেতে পারে, তাই জন্মেছে। এই ধরণের লোকই কেবল বাঙ্গালার বা ভারতের আর্থিক জীবন আলোচনা কর্‌বার ও তার সম্বন্ধে মত প্রকাশ কর্‌বার যোগ্য অধিকারী বিবেচিত হ'তে পারে। নয় ত যারা আর্থিক জীবনের এ পর্য্যন্ত যে উন্নত

অবস্থা জগতে লব্ধ হ'য়েছে, তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে পারে নি, তারা বাংলার বা ভারতের আর্থিক অবস্থা বুঝতেও পারবে না, পার্থিব পরিবর্ত্তনগুলার তাৎপর্য্যও ঠিক্ ধর্‌তে পারবেনা, আর্থিক উন্নতির উপায়ও ঠিক নির্ণয় করতে পারবে না।

প্রঃ—আর্থিক উন্নতিতে "দুনিয়ার ধনদৌলত" বিভাগটা "বাংলার সম্পদ্‌" আর "আর্থিক ভারত" এই দুই বিভাগের ঠিক পরে দেবার মানে কি? অবস্থার পার্থক্যটা বোঝাবার জন্যে কি?

উঃ—হাঁ, আমাদের অবস্থার আর ইয়োরামেরিকার অবস্থার মধ্যে কতটা পার্থক্য, তা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্যে। প্রথম দুই বিভাগ থেকে আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, সে সম্বন্ধে যেমনি নিরেট বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান পাওয়া যায়; তৃতীয় বিভাগ থেকে ইয়োরামেরিকার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তেমনই নিরেট বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান জন্মাবে; তার পর আপনা থেকেই মনে প্রশ্ন জাগবে ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব আমরা কি ক'রে লাভ করতে পারি?

প্রঃ—তা হ'লে কি বল্‌তে চান এখন ওরাই আমাদের আদর্শ?

উঃ—আপাততঃ তাই, কারণ ওরা এখন ৫০।৬০।৭০ বছর এগিয়ে আছে। যখন ওদের আমরা নাগাল ধর্‌তে পারবো, তখনই ওদের চেয়ে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে; আর তখনই কেবল আর্থিক জীবনের বিকাশে ভারতীয় প্রতিভার যদি কিছু দেবার থাকে তাই দেবার সময় আসবে।

প্রঃ—আর্থিক কর্ম্মকাণ্ডে নিছক অনুকরণবৃত্তিই আমাদের তা হ'লে অবলম্বন করতে হবে?

উঃ—অনেকটা বটে, কিন্তু একেবারে নয়। কারণ, ইয়োরোপকে আমেরিকাকে আমাদের দেখ্‌তে, বুঝতে, জানতে হবে—কিন্তু তা ওদের

চোখ দিয়ে নয়, কেবল ওদের বইয়ের ভেতর দিয়ে নয়—আমাদের নিজেদের ওদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে। কাজেই আমাদের বুদ্ধি বা প্রতিভা প্রয়োগ কর্‌বার বিশেষ দরকার হবে। তারপর আমাদের বৈদেশিক অভিজ্ঞতা যখন ভারতীয় বা বঙ্গীয় অবস্থায় প্রয়োগ কর্‌তে হবে, তখনও বুদ্ধি খেলাবার বিশেষ প্রয়োজন হবে, নিছক অনুকরণবৃত্তি তখন কাজে লাগ্‌বেনা।

প্রঃ—তা হ'লে আপনি আর্থিক জীবনের "বস্তুনিষ্ঠ" আর "দুনিয়ানিষ্ঠ" জ্ঞানের ওপর জোর দিতে চান। অর্থাৎ নিজেদের জীবনের গণ্ডীর মধ্যে না থেকে বাইরের জগৎটাকেও দেখতে হবে, আর তা দেখতে হবে "তত্ত্বের" ভেতর দিয়ে নয়, আর্থিক জীবনের বিভিন্ন দিকে যেমন যেমন বিকাশ হ'য়েছে,—দুনিয়াতে আথিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে সব ঘটনা নিত্য ঘট্‌ছে, সেগুলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ক'রে?

উঃ—হাঁ, ঠিক তাই; তবে 'থিওরির' দিক্‌টাও আমি একেবারে বাদ দিতে চাই না; সেই জন্যে "আর্থিক উন্নতি"তে "পত্রিকা-জগৎ" আর "সমালোচনা" এই দুটি বিভাগও রেখেছি। প্রথমটির সাহায্যে নানা প্রকার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক আর্থিক পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় হবে, তাদের ভেতর কি ধরণের মাল-মশলা থাকে, তাও জানা যাবে; দ্বিতীয়টির সাহায্যে ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালী, রুশিয়া, আমেরিকা, জাপান; ইংলণ্ডে যে সব ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বই বেরুচ্চে তাদের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় হবে। আর এ দুটি বিভাগের সাহায্যেই ধনবিজ্ঞানের "তত্ত্ব" আর ধনবিজ্ঞানের "ভাষা" (যা অনেক পরিমাণে আমাদের গ'ড়ে নিতে হচ্ছে ও হবে) তাও কিছু কিছু হ'য়ে আস্‌বে।

প্রঃ—'পত্রিকাজগৎ'এ অনেক সময় বিভিন্ন পত্রিকায় কি কি প্রবন্ধ

আছে, কেবল তার তালিকা দেখ্‌তে পাই। এ রকম শুধু প্রবন্ধের তালিকায় কি শেখবার কিছু পাওয়া যায়?

উঃ—সব প্রবন্ধেরই সারমর্ম্ম দেওয়া এই পত্রিকায় সম্ভব নয়; তা ছাড়া, বিভিন্ন পত্রিকার নাম আর প্রবন্ধের তালিকা দিয়ে আমি বাংলা দেশের লোককে দেখাতে চাই, ধনবিজ্ঞানবিদ্যার বিস্তার কতদূর। এটিও লক্ষ্য ক'রে থাকবে যে, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান পত্রিকা-সমূহের প্রবন্ধের সারমর্ম্ম প্রায়ই দেওয়া হয়, কারণ এগুলি পড়্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লেও সাধারণের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে।

প্রঃ—ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা সম্বন্ধে আমাদের লোকের উৎসাহ কেমন দেখ্‌ছেন?

উঃ—এখনও খুব বেশী নয়; কারণ এ বিষয়ের চর্চ্চা আমাদের দেশে এক প্রকার ছিলই না। জীবনের আর্থিক দিক্‌টাকে আমরা, বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা, বরাবরই অল্প-বিস্তর অবহেলা করে এসেছি। সেই জন্যে আর্থিক আলোচনা দেশের পক্ষে কতটা মঙ্গলজনক, সে সম্বন্ধে এখন কিছু ধারণা হ'লেও, খুব গভীর ধারণা জন্মায় নি। এ বিষয়ে দেশের লোকের নিশ্চেষ্টতা আমি একেবারে ভাঙ্গতে চাই। আমি তাদেরকে এই সামান্য কথাটা বোঝাতে চাই যে, আর্থিক উন্নতি হচ্ছে, শারীরিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির, এমন কি আধ্যাত্মিক উন্নতিরও প্রকাণ্ড খুঁটা।

প্রঃ—একমাত্র লেখালেখির জোরে অথবা বক্তৃতার সাহায্যে বাঙ্গালীর মতিগতি ফেরানো সম্ভব কি?

উঃ—আমার কাজ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথমতঃ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল প্রকার লোককেই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের কাজে নানা উপায়ে উৎসাহিত করা, আর কিছু কিছু হদিস্‌ যোগানো। এদিকে বাঙ্গালীর মেজাজ আজকাল বেশ একটু খেল্‌ছেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের

উচ্চতম ডিগ্রীধারী অনেক যুবা বহির্ব্বাণিজ্যে, ফ্যাক্টরীর কাজে, বীমা এজেন্সীতে, চাষ-আবাদে, ব্যাঙ্কের ব্যবসায় ঝুঁকেছে। বাঙ্গালীর এ এক বিশেষ সুলক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সম্বন্ধে, আর তার অন্তর্গত অর্থশাস্ত্র বা ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করা আর লেখক গ'ড়ে তোলা হচ্ছে আর এক কাজ। এ কাজের ফলাফল অবশ্য রাতারাতি দেখা যাবে না। তবে সুবাতাস ব'য়েছে। লেখালেখির কাজে পয়সা রোজগারের সম্ভাবনা এক প্রকার নেই; তাই লোক জোটা কঠিন। কিন্তু তা হ'লেও, উৎসাহী যুবকের অভাব বোধ করছি না।

প্রঃ—এই দুই দিকে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কেমন মনে হচ্ছে?

উঃ—ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ। বাঙ্গালীরা এত দিনে এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে মাথা খেলায় নি। এই জন্যেই আমাদের আজ এই দুর্ব্বলতা। কিন্তু আমরা আমাদের দুর্ব্বলতাটা যেন বুঝতে পেরেছি, আর এই দুর্ব্বলতা শোধরাবার জন্যেও বাঙ্গালী সমাজের ছোট, বড়, মাঝারি, সব মহলে সমানে চেষ্টা সুরু হ'য়েছে। আমার বিশ্বাস আগামী বিশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাঙ্গালী ব্যাপারী, বাঙ্গালী ব্যবসাদার, বাঙ্গালী ব্যাঙ্কার, বাঙ্গালী ফ্যাক্টরী-পরিচালক আর বাঙ্গালী অর্থশাস্ত্রী খুব উঁচু ইজ্জৎ পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে। তা' ছাড়া বাংলা দেশে অ-বাঙ্গালী ব্যাপারীদের প্রভুত্ব লোপ পেয়ে যাবে।

ডায়োসেশান কলেজের ধনবিজ্ঞান-সমিতি

তৃতীয় অধিবেশন

গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯২৯ সন) তারিখে ডায়োসেশান কলেজের ধনবিজ্ঞান-সমিতির তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সমিতির পরিচালক বর্ত্তমান গ্রন্থকার দুটি বিষয়ের আলোচনা করেন।

ইয়োরোপের যুক্তরাষ্ট্র

প্রথমে তিনি প্রস্তাবিত ইয়োরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান সমৃদ্ধির প্রধান কারণ তিনটি—(১) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলার একটা হ'তে আর একটাতে মাল পাঠাতে হ'লে কোন শুল্ক দিতে হয় না; (২) প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরীতে প্রচুর পরিমাণে মাল উৎপাদন করা হয়; (৩) কিস্তিবন্দি প্রণালীতে মাল বিক্রী করা হয়। ইয়োরোপে এই তিন বিষয়েরই অভাব। এই জন্যে ইয়োরোপ আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাতে পড়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভাব পূরণের জন্যে চেষ্টা চলছে এবং প্রথম অভাবটি পূরণের চেষ্টা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হ'য়েছে। ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলার একটা হ'তে অপর একটায় মাল পাঠাতে হ'লে যাতে শুল্ক না দিতে হয়, এই জন্যে একটা ইয়োরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের কথা গত বছরের লীগ অব্ নেশানের সভায় উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রটি কিরূপ হবে, সে সম্বন্ধে আগামী বছরের মধ্যে একটি খসড়া তৈরী হ'য়ে যাবে। ১৯৩১ সনের মধ্যে খসড়া অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হবে, আশা করা যায়।

ইয়োরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের ফল কিরূপ হবে আশা করা যায়? ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির অর্থ, উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের বৃদ্ধি—এ ছাড়া আর কিছু নয়। ইয়োরোপের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলার সীমানায় সীমানায় যে উচ্চ শুল্ক-দেয়ালসমূহ খাড়া করা হ'য়েছে, সেগুলা ভেঙ্গে ফেল্‌লে ইয়োরোপের মধ্যেই এখন যত পরিমাণ মাল উৎপন্ন ও কেনাবেচা হয়, তার অন্ততঃ ৩ গুণ উৎপন্ন ও কেনাবেচা হ'তে পারে। এর ফলে, ইয়োরোপ মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উচ্চ শুল্ক-দেওয়াল তুলে ইয়োরোপীয় মালের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি ক'রেছে। ইয়োরোপ একতাবদ্ধ হ'লে তবে এর পালটা জবাব দিতে পারবে।

আর্থিক হিসাবে উন্নত হ'তে হ'লে কাঁচামাল ও লোকবল থাকার দরকার। তা ইয়োরোপের উপযুক্ত পরিমাণে আছে কি? সে বিষয় ইয়োরোপের কোন ভাবনা হবার কারণ নেই, কারণ কয়লা, লোহা, পেট্রল ও কাঠ এই কয়টি প্রধান মাল ইয়োরোপে এখনও প্রচুর পরিমাণে আছে; তা ছাড়া, ইয়োরোপের লোকবল যথেষ্ট। রুশিয়াকে বাদ দিলে ইয়োরোপের লোক-সংখ্যা ৩৫ কোটি, রুশিয়াকে ধ'রলে ৫০ কোটি। তা ছাড়া, ইয়োরোপের লোকগুলা শক্তির দিক্ হ'তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকগুলার চেয়ে কোন অংশে হীন নয়।

বিলাত বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র-স্থানীয় হ'য়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যকেই একটি বিরাট আর্থিক জোটে পরিণত করতে সচেষ্ট। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেমন ইয়োরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী, বৃটিশ সাম্রাজ্যও তেমন। বিলাত তা হ'লে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত হ'য়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপ দুয়েরই সঙ্গে আর্থিক প্রতিযোগিতা চালাবে কি? হাঁ, বিলাতের পক্ষে তাই করা সম্ভব ব'লেই মনে হয়।

বিজ্ঞাপনের আর্থিক সার্থকতা

এর পর অধ্যাপক দত্ত বিজ্ঞাপনের আর্থিক সার্থকতা কতটুকু, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গত আগষ্ট মাসে বার্লিন সহরে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় একটা আন্তর্জ্জাতিক সভা আহূত হয়। সেই সভায় নিউ ইয়র্কের গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোম্পানীর সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস্ এইচ সিসন্ "আধুনিক ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের স্থান" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার সারাংশটিকে ভিত্তি ক'রে আলোচনা চালান হয়। সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, বিজ্ঞাপন জিনিষটা খরিদ্দার সংগ্রহের জন্যে এবং প্রতিযোগী-দের সঙ্গে লড়বার জন্যে বিশেষ বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবশ্যক হ'তে পারে, কিন্তু সমাজের দিক্ হ'তে এর কোন সার্থকতা নেই, কারণ একজনের খরিদ্দার আর একজন সংগ্রহ করলে সমাজের মঙ্গল সমানই থাকে, এর কোন বৃদ্ধি ঘটে না। এই ধারণা একেবারে খাঁটি সত্য নয়। সমাজের দিক্ হ'তেও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে। জিনিষপত্র বেশী পরিমাণ বেচতে হ'লে প্রথমতঃ দেশের কর্ম্মীদের উচ্চহারে মজুরি দিয়ে তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। (১) কিন্তু ক্রয় ক্ষমতা বাড়ালেই যে লোকে মাল কিনবে তা নয়, মাল কেনবার ইচ্ছাটি অনেক সময়ে লোকের মনে খুবই ক্ষীণভাবে থাকে, ইচ্ছাটাকে তীব্র ক'রে তুলতে বিজ্ঞাপন বিশেষ সাহায্য করে। (২) অনেক সময়ে কি মাল কিনবে সে সম্বন্ধে খাদকরা শীঘ্র কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। একটা দোটানার মধ্যে প'ড়ে যায়; খরিদ্দারের এই শ্রেণীর দ্বিধা কাটাবার পক্ষেও বিজ্ঞাপন পরম সহায়। (৩) তার পর, বিজ্ঞাপনের সাহায্য না নিলে প্রচুর পরিমাণে মাল উৎপাদন অসম্ভব। কারণ, প্রচুর পরিমাণে মাল উৎপাদন করলে তা নিয়মিতভাবে বিক্রয় করা দরকার এবং নিয়মিতভাবে বিক্রয় চালাতে হ'লে খরিদ্দার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা দরকার। বিজ্ঞাপন

খরিদ্দার সংগ্রহ ক'রে খরিদ্দার সম্বন্ধে ব্যবসাদারদের নিশ্চিন্ত থাকতে সাহায্য করে। (৪) উৎপাদকে উৎপাদকে সকল সময়েই সঙ্ঘর্ষ চলছে; এই সঙ্ঘর্ষের ফলে শ্রেষ্ঠ উৎপাদকরা স্ব স্ব উৎকর্ষ জাহির করতে পারে; এই সঙ্ঘর্ষ চালাবার পক্ষে বিজ্ঞাপন পরম সহায়; সুতরাং, বিজ্ঞাপন শ্রেষ্ঠ উৎপাদকদের বেছে দিতে সাহায্য করে। (৫) বিজ্ঞাপনের ফলে ব্যবসাদারদের সুবিধা বাড়ে; বাজে মাল মিথ্যা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে কয়েকদিন বিক্রয় করা যেতে পারে; কিন্তু বাজারে তা কখন স্থায়ী মর্য্যাদা লাভ করবে না; বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটু আধটু অত্যুক্তি থাকা আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু তা একেবারে মিথ্যা কথা হ'লে তাতে ব্যবসাদারদেরই ক্ষতি বেশী; একথা আধুনিক ব্যবসাদার ভাল ক'রেই জানে। (৬) বাজারে কত রকমের, কোথায় প্রস্তুত এবং কি কি মাল পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে খরিদ্দারদের শিক্ষা দিতে বিজ্ঞাপন সাহায্য করে ইত্যাদি।

কারখানা-শিল্প বনাম কুটীর-শিল্প

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য প্রচুর পরিমাণে থাকলেও, মস্তিষ্কশালী নেতা এবং বুদ্ধিমান্ ও কষ্টসহিষ্ণু মজুরের অভাব না থাকলেও ভারত আজ জগতের দরিদ্রতম দেশগুলার অন্যতম। গুটিকয়েক সহর বাদ দিলে, এই দেশ এখনও লক্ষ লক্ষ সেকেলে ও প্রাণহীন গ্রামের সমষ্টিমাত্র। ভারতের শতকরা ৭২ জন কৃষিজীবী, শতকরা মাত্র ১১ জন শিল্পজীবী। কৃষির জন্যে যত লোক দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী লোক নিযুক্ত থাকার দরুণ তারা ভাল ক'রে খেতে পায় না। ভারতীয়ের গড়ে জীবনের আশা হচ্ছে মাত্র ২২।২৩ বছর। অন্য দেশে বেশীর ভাগ লোক মরে বার্দ্ধক্যে, এখানে বেশীর ভাগ মরে শৈশবে না হয় পরিণত বয়সে—বার্দ্ধক্য অবধি কম লোকই পৌঁছায়। শতকরা ৭০ হ'তে ৮৪ ভাগ লোক যে সমস্ত কারণে মরে, তা নিবারণ করা সম্ভব, অথচ টাকা নেই ব'লে নিবারণ করা সম্ভব হয় না। শতকরা ৮৫ ভাগ ভারতীয়ের জীবনী শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। আমাদের দেশের সকলেই প্রায় একমত যে শিল্পোন্নতির সাহায্যে ধনবৃদ্ধি না হ'লে এই দুরবস্থার প্রতীকার হবে না। কিন্তু শিল্পোন্নতির মানে কি কুটীর-শিল্পের উন্নতি, না, কারখানা-শিল্পের উন্নতি? আমাদের মতে কুটীর-শিল্পের যতই উন্নতি করা হোক্ না কেন, কারখানা-শিল্পকে প্রাণের সঙ্গে সাদরে বরণ ক'রে না নিলে আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতীকারের জন্যে যে আর্থিক উন্নতির দরকার, তা কখনও সম্ভব হবে না। অনেকেই কিন্তু কুটীর-শিল্পকেই বেশী পছন্দ করেন। তাঁদের পক্ষের যুক্তি আলোচনা ক'রে কারখানা-শিল্পের সাহায্যে ভারত কতদূর উন্নত হ'তে পারে তাই দেখাবো।

কুটীর-শিল্পের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি

যাঁরা কুটীর-শিল্পের পক্ষপাতী, তাঁদের যুক্তিগুলা প্রধানতঃ এইরূপ :—

(১) ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতের সভ্যতা প্রধানতঃ গ্রাম্য সভ্যতা, ভারতের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খেতে পারে, এমন ধরণের শিল্পই এদেশে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ভারতের ইতিহাস ও আবহাওয়া কৃষি আর কুটীর-শিল্পের সম্মিলনে যে আর্থিক প্রণালী গ'ড়েছে সেই আর্থিক প্রণালীকে ধ্বংস করতে দেওয়া উচিত নয়, তা'হলে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হবে। এই যুক্তির উত্তরে এই কথা বলা চলে যে, কুটীর-শিল্প ভারতীয় সভ্যতারই একচেটে আবিষ্কার নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লব হওয়ার পূর্ব্বে ভারতীয় ধরণের কুটীর-শিল্প জগতের সর্ব্বত্রই ছিল। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও তখন ভারতের মতই চরকায় সূতা কাট্‌তো, হাতের তাঁতে কাপড় বুন্‌তো, সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে জুতা তৈরী করতো, ছোট ছোট ঘরে কামাররা লোহা পিটে সাধারণ ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র গড়তো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ বিলাতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অক্লান্ত চেষ্টা আর উদ্যমের ফলে ক্রমে ক্রমে নানারকম যন্ত্রের উদ্ভাবন হ'লো, প্রাকৃতিক শক্তিকে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কাজে লাগিয়ে বিপুল পরিমাণে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হ'লো,—নানাকারণে ভারত ঘুমিয়ে ছিল ব'লেই ভারতবর্ষে ঐ সমস্তের উদ্ভব হ'লো না। তারপর ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, আমেরিকা, এমন কি প্রাচ্যের ভাত-খেকো জাপানও ঐ শিল্প-বিপ্লবকে বরণ ক'রে নিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কাজেই কেবল ভারতীয় মাথা থেকে কারখানা-শিল্প বেরোয়নি ব'লেই কুটীর-শিল্প ভারতীয় সভ্যতারই জিনিষ আর কারখানা-শিল্প পাশ্চাত্য সভ্যতারই যোগ্য, এই কথা ব'ল্‌লে ঐতিহাসিক অযোগ্যতারই পরিচয় দেওয়া হবে। কুটীর-শিল্পই হোক্ আর কারখানা-শিল্পই হোক্, শিল্প সকল সময়ই একটা

ধনোৎপাদনের প্রণালী মাত্র, কোন শিল্পের উপরই প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য ব'লে বিশেষ কোন ছাপ মারা নেই। ভারতীয় সভ্যতার যদিই বা কোন বৈশিষ্ট্য থাকে, উৎপাদনের প্রণালী বদ্লালে, প্রাচীন প্রণালী ত্যাগ ক'রে অধিকতর উন্নত প্রাণালী অবলম্বন কর্লেই যে সে সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে, একথা মনে কর্বারও কোন কারণ নেই।

(২) পাশ্চাত্ত্য আর্থিক প্রণালী এরূপ কদর্য্য যে, সেখানকার জনকয়েক লোক অত্যন্ত ধনী হ'য়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক নিতান্ত দরিদ্র ব'লে ধনীদের ক্রীতদাসের মত খাট্‌ছে। কিন্তু ভারতের প্রাচীন আর্থিক প্রণালীতে জনকয়েক লোকের ধনী হবার সম্ভাবনা ছিল না। যাতে আর্থিক সাম্য বজায় থাকে, তার ব্যবস্থা কেবল ভারতীয় আর্থিক প্রণালীতে আছে।

এই ধরণের যুক্তি আমাদের মুখে সাজে না। ধনবিষয়ে বিষম অসাম্য পাশ্চাত্ত্য দেশে থাক্‌তে পারে, কিন্তু ভারতের মত দরিদ্রও ত তথায় নেই, ভারতের মত এত অধিকসংখ্যক লোক না খেতে পেয়ে বা একবেলা খেতে পেয়ে ত সেখানে কাটায় না, দুর্ভিক্ষ ত কোন পাশ্চাত্ত্য দেশে হয় ব'লে শোনাই যায় না, না খেতে পেয়ে এত অধিকসংখ্যক লোক হাজারে হাজারে লাখে লাখে মর্‌ছে, এ কথা কোন পাশ্চাত্ত্য দেশ সম্বন্ধে ত শুন্‌তে পাওয়া যায় না। যতই কেন আমরা পাশ্চাত্ত্য আর্থিক প্রণালীর নিন্দা করি না, তাদের দরিদ্রতমেরাও আমাদের দরিদ্রদের চেয়ে অনেক ভাল খেতে-পর্‌তে পেয়ে থাকে। এই ব্যাপার কি ক'রে সম্ভব হ'ল সেই কথাটাই বেশী ক'রে ভাবা দরকার। আর্থিক সাম্য কথাটা শুন্‌তে ভাল বটে, কিন্তু আমাদের দেশে তেমন বিপুল ধনৈশ্বর্য্যই বা কোথায় যে "আর্থিক সাম্য" "আর্থিক সাম্য" ক'রে পাগল হ'তে হবে। পাশ্চাত্ত্যেরা তাদের দেশে ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য দেখে তার উপায়ের জন্য মাথা

ঘামাচ্ছে, আমরাও যখন ঐ অবস্থায় আস্‌বো তখন ঐ বিষয়ে চিন্তা কর্‌বো। তখন আমরা ভেবে দেখ্‌তে পারবো, ভারতীয় আর্থিক প্রণালীতে আর্থিক সাম্য বজায় রাখ্‌বার জন্যে কোন ব্যবস্থা ছিল কি না, আর তা আধুনিক কলকারখানার যুগে কোন কাজে লাগতে পারে কি না। এখন আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত—কি ক'রে ধনী আর দরিদ্রের পার্থক্য দূর করা যায় তা নয়, কিন্তু কি ক'রে জাতীয় ধনের পরিমাণ বাড়ানো যায়। ভারতের অবস্থা এখন এত শোচনীয় যে, যদি জনকতক লোক ধনীই হয়, তাতে কিছুই আসে যায় না, যদি তার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি কর্‌তে পারা যায়।

(৩) কারখানা-শিল্পে মজুরদের সাধারণতঃ কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, কারখানা-শাসনের ব্যাপারে তাদের কোন হাতই নেই, তারা কেবল স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কাজ কলের মত ক'রে যেতেই অভ্যস্ত। কিন্তু কুটীর-শিল্পী সাধারণতঃ স্বাধীন. সে নিজেই মালমশলা কেনে, নিজেই একা বা পরিবারবর্গ ও সহকারীদের সাহায্য নিয়ে তার ছোট খাটো যন্ত্রপাতি দিয়ে জিনিষ তৈরী করে, তারপর নিজেই জিনিষ বাজারে পাঠায় বা মহাজনের কাছে বিক্রী করে; লাভলোকসানের সমস্ত ঝুঁকি তারই ঘাড়ে; সে একাই কারখানাপরিচালক ও মজুর দুয়েরই দায়িত্ব বহন করে।

কারখানার মজুরের তুলনায় কুটীর-শিল্পী অনেকটা স্বাধীন বটে, কিন্তু কুটীর-শিল্পীর স্বাধীনতা-সম্বন্ধীয় এই যুক্তিটার ওপর খুব বেশী জোর দেওয়া চলে না। আজকাল ইয়োরামেরিকার মজুররা কারখানার ওপর নিজেদের কর্ত্তৃত্ব জাহির কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে এবং অনেক জায়গায় কৃতকার্য্যও হ'য়েছে।

অপর দিকে, আমাদের দেশে স্বাধীন কুটীর-শিল্পীরা অনেক জায়গায় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না দেখে মধ্যবিত্তদের দ্বারা ছোটি ছোট

ফ্যাক্টরী খুলে কুটীর-শিল্পীগুলাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার কথাও হ'য়েছে (ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল কমিশনের রিপোর্ট—পৃষ্ঠা ১৬৪)। ছোট ছোট ফ্যাক্টরী যদি করা হয়, তা হ'লে বড় ফ্যাক্টরীর মজুরদের সঙ্গে ছোট ফ্যাক্টরীর মজুরদের কোন বিশেষ পার্থক্য থাকবে না। স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা ছোট ফ্যাক্টরীর পরিচালকদেরই থাকবে, তাদের অধীন মজুরদের থাকবে না। ছোট ফ্যাক্টরীর মজুরদের মনিবের সংস্পর্শে আসা অপেক্ষাকৃত সহজ—এইটুকু মাত্র সুবিধা থাকতে পারে।

(৪) কুটীর-শিল্পের পক্ষে একথাও বলা হ'য়ে থাকে যে, কুটীর-শিল্পীরা হাতের কাজে নিজেদের সৌন্দর্য্যবোধকে ফুটিয়ে তোল্‌বার সুযোগ পায়। ফলে একই সঙ্গে যে সব জিনিষ তৈরী হয়, সেগুলার পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে একটুও পার্থক্য থাকে না, মজুররা নিজেদের সৌন্দর্য্যবোধ নিজেদের কাজে ফুটিয়ে তোল্‌বার বা প্রয়োগ করবার সুযোগও পায় না। কিন্তু হাতে তৈরী জিনিষগুলার প্রত্যেকটাকে অন্যগুলা হ'তে পৃথক্ ধরণে সৃষ্টি করা ও নিজ কল্পনা অনুযায়ী বৈচিত্র্যে পূর্ণ করা সম্ভব। সুতরাং, শিল্পকলার দিক্ হ'তে কুটীর-শিল্পের স্থান অতি উচ্চে।

এ কথার প্রতিবাদ করাই চলে না। এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, শিল্পীরা যত বেশী যন্ত্রপাতি আর প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নেবে (আজকাল বাঁচবার জন্যে কুটীর-শিল্পীরা তা করতে বাধ্যও হচ্ছে) অর্থাৎ হাতের কাজের অবকাশ যত ক'মে আসবে, ততই কারুকার্য্যের বৈচিত্র্য দেখাবার সুযোগ ক'মে যাবে। আর একটা কথাও এই সঙ্গে বলা চলে যে, নিছক সৌন্দর্য্যবোধের তৃপ্তির জন্যে জিনিষপত্র ক্রয় করে, এরূপ লোকের সংখ্যা সকল দেশেই অতি অল্প। সাধারণতঃ, সকল দেশেই, বিশেষ ক'রে আমাদের মত দরিদ্রের দেশে, লোকে সস্তায় টেঁকসই জিনিষই খুঁজে থাকে। মানুষের সৌন্দর্য্যের পিপাসা তৃপ্ত ক'রতে

পারে ব'লে কুটীর-শিল্পীর বেঁচে থাকা অসম্ভব না হ'তে পারে, কিন্তু যে সব জিনিষ সৌন্দর্য্য বোধকেই পরিতৃপ্ত করে, তাদের চাহিদা যত বেশীই হোক না কেন, কেবল ঐ ধরণের জিনিষ তৈরী করার জন্যে কুটীর-শিল্পের সাহায্যে দেশব্যাপী আর্থিক উন্নতি সাধন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। শিল্পকলার খাতিরে কুটীর-শিল্প বাঁচবার, এমন কি জাতির যথেষ্ট যত্ন পাবারও অধিকার পেতে পারে, কিন্তু ওর খাতিরে দেশের শিল্পোন্নতির সকল প্রকার প্রচেষ্টা কুটীর-শিল্পের দিকেই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হবে, এমন অধিকার কিছুতেই দাবী কর্‌তে পারে না।

(৫) আধুনিক আর্থিক পরিবর্ত্তনগুলা অনেকদিন থেকেই ভারতে আরম্ভ হ'লেও, ভারতের কতকগুলা কুটীর-শিল্প একেবারে ধ্বংস হ'লেও, এবং কতকগুলার অবস্থা প্রায় ধ্বংস হবার মত হ'লেও, অনেকগুলা এখনও বেঁচে আছে। হাতে-বোনা কাপড় ভারতের কাপড়ের বাজারে এখনও বেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে—সমস্ত ভারতে যত কাপড়ের দরকার হয়, তার ৩ ভাগের ১ ভাগ দেশী তাঁতেই বোনা হয়। দর্জ্জী, মুচি, কামার, কুমোর, পিতলের বাসন প্রস্তুতকারী, রেশমশিল্পী, স্যাকরা প্রভৃতি অসংখ্য কুটীরশিল্পী ভারতে এখনও আছে। চাষের পর এত অধিকসংখ্যক লোক আর কোন কাজে লিপ্ত নেই। কারখানার মজুরদের (১৫ লক্ষ) চেয়ে কুটীর-শিল্পীদের সংখ্যা (দেড় কোটী) এখনও অনেক বেশী। ছোট ও মাঝারি সহরগুলার বেশীর ভাগ লোকই এখনও কোন না কোন কুটীর-শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন ক'রে থাকে। এইসকল কথা ভেবে অনেকে ব'লে থাকেন যে, কুটীর-শিল্পের যোঝবার শক্তি ত বড় সামান্য নয়, মিলফ্যাক্টরীর এত আক্রমণেও ত' এরা বিধ্বস্ত হয় নি, বরং কোন কোন জায়গায়

আধুনিক যন্ত্রপাতি বা নতুন ধরণের কারখানায় প্রস্তুত মালমশলার সাহায্য নিয়ে ত' বেশ উন্নতি কর্‌ছে। কুটীরশিল্পের জীবনীশক্তি যখন এত বেশী, তখন তাঁদের মতে এই অমর-প্রাণ কুটীর-শিল্পকেই জাতির এই দুর্দ্দিনে আমাদের প্রধান অবলম্বন ব'লে গ্রহণ করা উচিত।

এই যুক্তির উত্তর অতি সোজা। কুটীর-শিল্পীর সংখ্যার আধিক্য দেখেই ভাবা উচিত নয় যে, কুটীরশিল্পের জীবনী-শক্তি অত্যন্ত বেশী। কারখানাশিল্প ভারতের গুটিকয়েক সহরেই কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, কিন্তু এখনও দেশ ছেয়ে ফেল্‌তে পারে নি। সেই জন্যে, কুটীরশিল্পীর প্রয়োজনীয়তাও ভারতের কৃষিপ্রধান আর্থিক প্রণালীতে এখন খুব বেশী রয়েছে ব'লেই, তারা বেঁচে আছে। কারখানা-শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ কুটীরশিল্পী অন্য দেশে যেমন কারখানার মজুরে পরিণত হ'য়েছে, এখানেও যে তাই হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; সুতরাং আর এই সংখ্যার আধিক্য থাকবে না। এই সঙ্গে এটিও লক্ষ্য করা দরকার যে, তাদের সংখ্যার বিপুলতা মানে এই নয় যে, তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই উন্নত। তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক সমৃদ্ধিসম্পন্ন হ'তে পারে, কিন্তু এদের বেশীর ভাগেরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ফিস্‌ক্যাল কমিশন তাঁদের রিপোর্টের ১৮ পৃষ্ঠায় ব'লেছেন যে, "এদের জীবন আর্থিক জীবনের নিম্নতম ধাপে," এদের মধ্যে অনেকেই মহাজনদের কাছে ঋণে আবদ্ধ, এদের বাড়ীর মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজে অবহেলা ক'রেও উপার্জ্জন বাড়াবার জন্যে পুরুষদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়, এদের ছেলেদেরও অল্প বয়স থেকে পৈতৃক ব্যবসাতে ঢুক্‌তে বাধ্য করা হয়, তাদের কোনরকম শিক্ষার বন্দোবস্ত হয় না। কাজেই কুটীর-শিল্পীর সংখ্যা দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। বিলাতী কাপড় আর দেশী মিলের কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গেও যে তাঁতের কাপড় এত বেশী ব্যবহৃত

হয়, কুটীরশিল্পের জীবনীশক্তিই তার একমাত্র কারণ নয়, তার অন্য অনেক কারণও আছে ঃ—(ক) ভারতের কাপড় এত অধিক পরিমাণে দরকার যে. মিলগুলা অত কাপড় যোগাতে পারে না (আরও, বেশী কাপড়ের মিল হ'লে হাতে-বোনা কাপড়ের পরিমাণ কমবার সম্ভাবনা) ; (খ) ভারতের নানা সামাজিক আচারের জন্যে নানা ধরণের কাপড়ের আবশ্যক হয়, প্রত্যেকটির চাহিদা এত অল্প যে, কারখানার সাহায্যে তা উৎপাদন করলে লাভ থাকে না ; (গ) তাঁতীরা তাদের জাতব্যবসা সহজে ছাড়তে নারাজ ; (ঘ) ফ্যাক্টরীতে বেশী রোজগারের লোভ থাকলেও বাড়ী ছেড়ে দূরে যেতে চায়না ব'লেই তাঁতীরা এখনও নিজেদের ব্যবসা নিয়ে প'ড়ে আছে। এই কটা কথা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশনের রিপোর্টের ১০ পৃষ্ঠায় এবং ওয়াদিয়া ও যোশী গ্রন্থকারদ্বয়ের "ওয়েলথ্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থের ৪১০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

(৬) কুটীর-শিল্পের পক্ষপাতীরা দেখিয়ে থাকেন যে, ইয়োরোপে ত অত কলকারখানা, কিন্তু সেখানে ত কুটীর-শিল্প একেবারে মরে নি, বরং বেশ মোটা সংখ্যার লোকই ইয়োরোপের আধুনিক দেশগুলাতেও কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে।

ইয়োরোপের নানা দেশের কুটীর-শিল্পের সংখ্যার কোন তুলনা না করলে উহা বেশী মনে হ'তে পারে, কিন্তু ইয়োরোপের দক্ষিণ ও পূবের পশ্চাৎপদ দেশগুলার কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে যে, কারখানার মজুরদের সংখ্যার তুলনায় কুটীর-শিল্পর সংখ্যা খুবই কম (জার্মাণীতে ১৯২৫ সনে ২৮ লক্ষ কুটীর-শিল্প ছিল—সমস্ত মজুরের সংখ্যার শতকরা ২২ ভাগ মাত্র)। তা ছাড়া পরিমাণ-হিসাবে কুটীর-শিল্পীদের দ্বারা ধনোৎপাদন কারখানার মজুরদের তুলনায় ঢের কম, একথাও ভুললে চলবে না। ইয়োরোপের মত কারখানা-বহুল দেশেও যে কুটীর-শিল্প

এখনও একটা স্থান অধিকার ক'রে আছে, তার কয়েকটি বিশেষ কারণও আছে :—(ক) কলকারখানার সাহায্যে একই মাপের ও একই ধরণের জিনিষ প্রস্তুত হ'তে পারে, কিন্তু অনেক সময় খাদকদের ইচ্ছানুযায়ী সেগুলাকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত কর্‌বার প্রয়োজন হয় ; সুতরাং খাদকদের সখ বা প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিষগুলাকে পরিবর্ত্তিত কর্‌বার জন্যে এক শ্রেণীর কারিগরেরও (ফিনিশার ফিটার প্রভৃতি) আবশ্যক হয় ।

(খ) বড় বড় কলকারখানা যেখানেই আছে, সেখানেই তার আশে পাশে মেরামতি কাজের জন্যে বা বড় বড় কারখানার নিত্য আবশ্যক ছোট খাট জিনিষ-বিশেষ তৈরী কর্‌বার জন্যে ছোট খাটো ফ্যাক্টরীও গ'ড়ে উঠে

(গ) সৌন্দর্য্য বোধের পরিতৃপ্তির জন্যে সূক্ষ্মকার্য্য-করা কাপড়-চোপড়ও অন্যান্য জিনিষেরও একটা সীমাবদ্ধ চাহিদা সকল দেশের মত ইয়োরোপেও আছে । সুতরাং, এই বড় বড় কলকারখানার যুগেও কুটীর-শিল্প যে ইয়োরোপের আধুনিকতম দেশগুলা হ'তে লুপ্ত হয় নি, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, এবং তারা একেবারে যে কখনও লোপ পাবে, তার সম্ভাবনাও নেই ।

কুটীর-শিল্পের উন্নতির নতুন উপায়

কলকারখানার যুগ জগতে প্রথম যখন আরম্ভ হয়, তখন ধনবিজ্ঞান-বিদ্‌রা ভেবেছিলেন যে, কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা জগতে একেবারেই ফুরিয়ে গেল । কিন্তু পরে দেখা গেল এবং এখনও দেখা যাচ্ছে যে, কারখানা-শিল্পের একাধিপত্য স্থাপন হ'য়ে উঠলো না । বরং কারখানা-

শিল্পের যুগ আরম্ভ হবার পর, এমন কতকগুলি উপায়ের আবির্ভাব হ'য়েছে, যাদের সাহায্যে কুটীর-শিল্পের বেঁচে থাক্‌বার সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। সেগুলা হচ্ছে ঃ—(১) বড় বড় কলকারখানা থেকে এমন কতকগুলি ছোট্ট ছোট কল তৈরী হচ্ছে (যেমন শেলাইয়ের কল. বোন্‌বার কল, আখমাড়া কল প্রভৃতি) যাদের সাহায্যে অল্প আয়াসে অধিক উপার্জ্জন করা যেতে পাবে; যদি বড় বড় কলকারখানা হ'তে এরা উৎপন্ন না হ'ত, তা হ'লে এই কলগুলা এত অল্প খরচে ও এত নিখুঁত ভাবে তৈরী করা সম্ভব হ'ত না; এইখানে কারখানা-শিল্পই কুটীর-শিল্পকে নতুন ভাবে বাড়্‌তে সাহায্য করছে। (২) কলকারখানা প্রথম চালানো হয়,—বাষ্পের সাহায্যে; বাষ্পকে অনেক দূরে দূরে অবস্থিত ছোট ছোট কেন্দ্রে ছড়িয়ে দিতে খরচ বড় বেশী পড়ে; একই স্থানে কল-কারখানা যত কেন্দ্রীভূত করা হয়, খরচ তত কম পড়ে; সুতরাং, বাষ্পের যুগে বড় বড় কলকারখানাই গ'ড়ে উঠলো। কিন্তু এখন কুটীর-শিল্পীদের যে ছোট ছোট ফ্যাক্টরীগুলা অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে থাকে—তাদেরও প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নেবার সুযোগের সৃষ্টি হ'য়েছে। একটা সহরে যদি গ্যাসওয়ার্কস্ থাকে, তা হ'লে সহরের যেখানে ইচ্ছা গ্যাসের সাহায্যে ছোট ছোট কল চালান যেতে পারে। ইণ্টার্ণ্যাল কম্বাশ্‌চান্ ইঞ্জিনের সাহায্যেও ছোট ছোট কল চালানো যেতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তিকেও এখন বহু দূরে দূরে অবস্থিত ছোট ছোট ফ্যাক্টরীগুলাতে পাঠান যেতে পারে, তাতে খরচও বেশী পড়ে না। সুতরাং, কারখানা-শিল্প যেমন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কাজে লাগাচ্ছে, তেমনি কুটীর-শিল্পীরাও যাতে নিজেদের কাজে প্রাকৃতিক শক্তিকে লাগাতে পারে, এমন উপায়েরও সৃষ্টি হ'য়েছে। (৩) বড় বড় কারবারেই বড় বড় কল-কারখানা চালানো সম্ভব; কারবার বড় হ'লেই

মালমশলা সুবিধা দরে কিন্‌তে পাওয়া যায়, তৈরী জিনিষ বিক্রির সময়ও অনেকটা ইচ্ছামত দর হাঁক্‌তে পারা যায়, দূর দেশে যেখানে যেমন চাহিদা, সেখানে মাল পাঠানোরও সুবিধা আছে; কারণ দেশের আর বিদেশের সকল বাজার সম্বন্ধেই খবর রাখবার জন্যে খরচ কর্‌বার টাকাও তাদের আছে। কিন্তু কুটীর-শিল্পীরা অনেক ব্যবসাদারের হাত দিয়ে আসা মালমশলা আনে ব'লে দামের সঙ্গে ফড়িয়াদের লাভের পয়সাও যোগাতে বাধ্য হয়। তারা প্রকৃত ক্রেতাদের সংস্পর্শে আস্‌তে পারে না ব'লে এবং মহাজনদের কাছে ঋণী থাকার জন্যে তাদেরই কাছে জিনিষ বেচ্‌তে বাধ্য হয় ব'লে, অল্প দর নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়। সমবায় প্রণালীর উদ্ভব হবার পর থেকে এই সকল অসুবিধা দূর হ'য়েছে। সমবেতভাবে মালমশলা কিন্‌বার জন্যে আর জিনিষ বেচবার জন্যে সমবায় সমিতি স্থাপিত হ'লে, কেনা বিষয়ে কুটীর-শিল্পীরা এখন একটা বড় কারবারের অনেক সুবিধাই ভোগ কর্‌তে পারে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে কুটীর-শিল্প একেবারে বিলুপ্ত হবে,এমন কোন সম্ভাবনা নেই। বরং কয়েকটা নতুন সুবিধার সৃষ্টি হওয়াতে তারা যে নতুন মূর্ত্তিতে তাদের কার্য্যক্ষেত্র পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসারিত ক'রতে পারবে তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঐ সকল সুধিবার সুযোগ নিয়ে এবং শিক্ষার প্রচলন ক'রে আমাদের দেশের কুটীরশিল্পীদের যে অনেকটা উন্নত ক'রতে পারা যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুটীরশিল্পীদের অবস্থা উন্নত হ'লে ভারতে অধিকতর পরিমাণে ধনসৃষ্টি হবে, জাতীয় ধনের পরিমাণ যে আরও বাড়বে তা সত্য; কিন্তু উন্নততম অবস্থাতেও কুটীর-শিল্পের ধনোৎপাদন-ক্ষমতা কারখানা-শিল্পের চেয়ে অনেক কম ব'লেই প্রধানতঃ সকল চেষ্টা কুটীর-শিল্পের দিকে প্রয়োগ কর্‌লে দারুণ ভুল করা হবে।

কারখানা-শিল্প বিস্তারের ফল সর্ব্বতোমুখী উন্নতি

এ পর্য্যন্ত কুটীর-শিল্প থেকে ভারতের লাভলোকসান সুবিধা-অসুবিধার কথা, আধুনিক আর্থিক জীবনে কুটীর-শিল্পের স্থানের কথা আলোচনা করা হ'য়েছে। এখন আমরা বিচার ক'রে দেখবো, কারখানা-শিল্প থেকে কি কি সুবিধা লাভ করতে পারা যায়, কি কি অসুবিধা অথবা কুফলই বা ভোগ করবার সম্ভাবনা আছে।

ফিস্‌ক্যাল কমিশন এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে কারখানাশিল্পের উপকার সম্বন্ধে যে কয়টা কথা ব'লেছিলেন, তার সারমর্ম্ম দেওয়া গেল—

(১) দেশে কারখানা-শিল্পের প্রসার হ'লে, লোক গয়না কিনে বা জমিয়ে রেখে যে টাকা কোন কাজে লাগায় না, সেই টাকা লাভের লোভে ক্রমে বাজারে বেরিয়ে আস্‌বে। নানা শিল্প কারবারে লাভ পাবার আশা থাক্‌লে লোকে তাদের লুকানো টাকার পুঁজি যে বার ক'রে থাকে, তার নানা দৃষ্টান্ত এখন চারিদিকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই যে টাকা অলস হ'য়ে থাকার দরুণ জাতির কোন কাজেই লাগ্‌ছিল না, সেই টাকা জাতির আর্থিক উন্নতিতে নিযুক্ত হবার সুযোগ পাবে। বলা যেতে পারে যে, কুটীর-শিল্পেও ত লোকে টাকা খাটাতে প্রলুব্ধ হ'তে পারে; কিন্তু কারখানা-শিল্পে লোক টাকা খাটাতে যত প্রলুব্ধ হবে, কুটীর-শিল্পে টাকা খাটাতে তত প্রলুব্ধ হবে না; কারণ কারখানা-শিল্পে লাভের আশা বেশী; তার ওপর কারখানা-শিল্পে খাটালে টাকা যখন ইচ্ছা শেয়ার বেচে তুলে নিয়ে অন্য দিকে খাটানো যেতে পারে, কিন্তু কুটীর-শিল্পে খাটানো টাকা চট ক'রে তুলে নেবার উপায় নেই। অধিকন্তু কারখানা-শিল্পের লাভ থেকে যে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হবে, সেটা শিল্পোন্নতির জন্যে আবার প্রয়োগ করা হবে এ সম্ভাবনাও আছে, সুতরাং কারখানা-শিল্প কেবল

জমান মূলধনকেই আকর্ষণ করবে তা নয়, নতুন মূলধনের সৃষ্টিও করবে। কারখানা-শিল্পের বহুল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মূলধনও এনে দেশের আর্থিক উন্নতি আরও দ্রুত করা সম্ভব হবে, কিন্তু কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্যে বৈদেশিক মূলধন আবশ্যক হবে কি না সন্দেহ, আর আবশ্যক হ'লেও বিদেশ থেকে ঐ জন্যে মূলধন পাওয়া যাবে কি না, তাও সন্দেহের বিষয়।

(২) এ দেশে কৃষি-ক্ষেত্রে যত লোক দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী লোক নিযুক্ত আছে। ২১ কোটী চাষার অধিকাংশই কৃষি কার্য্যের জন্য বিশেষ কোন কাজে লাগে না। একটা কাজে যত লোকের দরকার, তার চেয়ে বেশী লোক থাকা মানেই শ্রমশক্তির অপচয়। শ্রমশক্তির এই যে বিপুল অপচয় দেশে চল্‌ছে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কারখানা-শিল্প। এত লোকের কাজ কি কুটীর-শিল্পের দেওয়া সম্ভব? কুটীর-শিল্পকে যতই উন্নত করা যাক্ না কেন, যারা এখনও কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে, বড় জোর তাদের অবস্থা ভাল করা যেতে পারে, কিন্তু কৃষিতে অনাবশ্যক শ্রমিকদলের সকলকেই কুটীরশিল্পে লাগানো সম্ভব নয়। কারখানার সাহায্যে আজকাল অসংখ্য প্রকারের জিনিষ তৈরী হয়। অসংখ্য প্রকারের জিনিষ তৈরীর জন্য অসংখ্য কারখানা খাড়া হলেই কেবল এই বিপুল শ্রমিকদলের কাজ যোগান সম্ভব হ'তে পারে। অবশ্য শ্রমিকদের কারখানায় নিযুক্ত হবার দুটি বড় বাধা আছে :—প্রথম—শিল্পকেন্দ্রগুলাতে উপযুক্ত বাড়ীঘরের অভাব, দ্বিতীয়—চাষী মজুরের স্ব স্ব গৃহের ওপর একান্ত মায়া। শিক্ষাবিস্তার ও মজুরদের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বাধাটি ক্রমে ক্রমে অপসারিত হবে। আধুনিক আর্থিক জীবনের স্রোত ভারতের অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বাধাটি ক্রমে নগণ্য হ'য়ে দাঁড়াবে।

(৩) মজুররা সাধারণতঃ কৃষক ও কুটীর-শিল্পীর চেয়ে অধিক উপার্জ্জন ক'রে থাকে। কারখানা-শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে ধনোৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে মজুরদের মজুরির হার আরও বাড়বে। মজুর ছাড়া কারখানা-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলেরও আয় বাড়বে। সুতরাং দেশের একটা মোটা ভাগ লোক এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ধনী হ'য়ে পড়বে। কারখানার মজুরেরা বেশী রোজগার করলে পল্লীগ্রামগুলা তার ভাগ কিছু কিছু পাবে, কারণ এ দেশের যে সব লোক সহরে কাজ করতে আসে, তারা অনেক সময়েই তাদের পরিবারের সকলকে বা অনেককে গ্রামের বাড়ীতেই রেখে আসে এবং রোজগারের একটা ভাগ তাদের পাঠিয়েও থাকে। কারখানার মজুরদের মাইনে বাড়লে চাষের কাজ হ'তে অনেকে কারখানায় মজুরিগিরি ক'রতে আসবে, চাষের কাজে মজুরের সংখ্যা কমলে তাদের মজুরির হার বাড়বে। এই রকম দুদিক্ থেকে পল্লীগ্রাম উপকৃত হবে।

(৪) ১৮৮০ সনের দুর্ভিক্ষ কমিশন ব'লেছিলেন যে, ভারতে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয় এর নিবারণ করবার একটি উপায় হচ্ছে কাজের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি ক'রে কৃষিতে যে অতিরিক্তসংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে, তাদের নানা নতুন কাজে লাগান। কারখানা-শিল্প যত বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের সৃষ্টি করবে, তা করা কুটীর-শিল্পের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া কারখানার মজুরদের আয় কিছু কিছু পল্লীগ্রামে যাওয়ার জন্যে, আর কল-কারখানার মজুরদের মজুরির হার বাড়ার ফলে চাষী মজুরদেরও মজুরির হার বাড়ার জন্যে, পল্লীগ্রামের লোকেরা দুর্ভিক্ষের সঙ্গে বোঝবার নিমিত্ত আরও শক্তি সঞ্চয় ক'রতে পারবে। এ দু'দিক্ দিয়ে কারখানা-শিল্প দুর্ভিক্ষ সমস্যার অনেকটা সমাধান করতে সাহায্য ক'রবে। তবে ঠিক দুর্ভিক্ষের সময় কারখানা শিল্প বিশেষ কাজে লাগবে না।

ভুভিক্ষের সময় লোকে অন্য সব জিনিষ পত্রের চেয়ে খাদ্যের দিকেই তাদের ক্রয়-শক্তি বেশী প্রয়োগ করবে, জিনিষপত্রের চাহিদা কমার জন্যে কারখানাগুলার কাজও ক'মে যাবে; অপরদিকে কারখানার কাজ কম থাকার জন্যে আর কারখানার কাজে দক্ষতা না থাকার জন্যে, ভুভিক্ষের জন্যে যারা কাজ হারাবে, তাদের তখনি কারখানায় কাজ দেওয়া সম্ভব হবে না; কুটীর-শিল্পগুলাও ভুভিক্ষের সময় প্রায় অচল হয় ব'লে কোন কাজে লাগবে না। কাজেই ঠিক ভুভিক্ষের সময় কুটীর-শিল্প বা কারখানা-শিল্প কোনটাই বিশেষ কাজে লাগবে না বটে, কিন্তু ভুভিক্ষ নিবারণে কারখানা-শিল্প কুটীর-শিল্পের চেয়ে বেশী কাজে লাগবে।

(৫) ভারতের পরিধি, লোক-সংখ্যা ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের তুলনায় ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলার ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের আয়ের কাছে নিতান্তই অল্প। অথচ দেশে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্যে অজস্র অর্থব্যয় এখন দরকার। কেবল কারখানা-শিল্পের সাহায্যেই দেশকে ধনী করা— যা একান্ত দরকার—সম্ভব; কুটীর-শিল্পের দ্বারা তা সম্ভব নয়। একই পরিমাণ টাকা কুটীর-শিল্পে খাটালে যত লাভ হবে, কারখানা-শিল্পে খাটালে সাধারণতঃ তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী লাভ হবে। কারণ মানুষ যত কলকারখানার সাহায্য নেয়, ততই ধনোৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। যে যুক্তি দিয়ে কুটীর-শিল্পকে উন্নততর কলকব্জা ব্যবহার করতে বলা হয়, সেই যুক্তিই খুব বড় বড় কলকারখানার সাহায্য নেবার পক্ষেও প্রয়োগ করা যেতে পারে—ধনোৎপাদন বাড়বে ব'লে যদি ছোট কলের সাহায্য নিতে হয়, তা হ'লে ধনোৎপাদন খুব বেশী বাড়াবার জন্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের সাহায্যই বা নেব না কেন? কয়েকটা কুটীর-শিল্পে বেশী

আয় হ'তে পারে, কিন্তু এইসকল কুটীর-শিল্পে যে সমস্ত মূল্যবান্ জিনিষ প্রস্তুত হয়, তার চাহিদা অত্যন্ত কম ব'লেই এইসকল কুটীর-শিল্পে বেশী টাকা খাটানো চলে না।

(৬) দেশের লোক কেবল কৃষি ও কুটীর-শিল্পে লেগে থাক্‌লে যত রকমে মাথা খাটাবে, কৃষি ও কুটীর-শিল্পের সঙ্গে কারখানা-শিল্পের বহুল বিস্তার হ'লে তার চেয়ে অনেক বেশী দিকে মাথা খেলাবার সুযোগের সৃষ্টি হবে। এতে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে একঘেয়েমি এসেছে, তার লোপ হবে, জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হওয়ার জন্যে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হবে, উচ্চ শিক্ষার ধরণ বদলাবার দরকার হবে এবং শিক্ষিতেরা অধিকতর "বস্তুনিষ্ঠ" ও "কাজের লোক" হ'য়ে উঠবে।

উপরোক্ত কথাগুলা ফিস্‌ক্যাল কমিশনের রিপোর্টে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত সুবিধার কথাও বিবেচনার যোগ্য। এটি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁর নানা গ্রন্থ ও বক্তৃতার একাধিক স্থানে উল্লেখ ক'রেছেন ঃ—

(৭) পাশ্চাত্ত্য দেশে শিল্প-বিপ্লব হবার পর কারখানা-শিল্পের হর্ত্তা কর্ত্তা হিসাবে যে ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেখা দিল, তারাই প্রধানতঃ ইয়োরোপের অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের মেরুদণ্ড হ'য়েছিল। আধুনিক গণতন্ত্রের আন্দোলন বড় বড় কল-কারখানা ও বড় বড় সহর সৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। পাশ্চাত্ত্য দেশের ইতিহাস দেখ্‌লে মনে হয় যে, সহুরে সভ্যতা ও কারখানা-সভ্যতা না থাক্‌লে আধুনিক স্বরাজ আন্দোলনের সৃষ্টি ও সাফল্য অসম্ভব; কলকারখানার মজুররা যত শীঘ্র নতুন নতুন চিন্তা ও আদর্শ গ্রহণ কর্‌তে পারে, চাষীরা তা পারে না, কারখানার

মজুররা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কথাগুলা লেখাপড়া না জান্‌লেও যত শীঘ্র বোঝে, চাষীরা সেরূপ বোঝে না। এই সব কারণে স্বরাজ সাধনার দিক্ থেকেও কারখানা-শিল্পের একটা বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

কারখানা-শিল্পের বিরুদ্ধে কয়েকটা আপত্তি

কারখানা-শিল্পের বিস্তার হ'তে অনেকে যে সব কুফলের আশঙ্কা ক'রে থাকেন, তার আলোচনা এইবার করা যাক্।

(১) এমন আশঙ্কা করা হ'য়ে থাকে যে, বেশী লোক কারখানায় যোগ দিলে চাষার সংখ্যা ক'মে যাবে, তাতে ধন-বৃদ্ধির জন্যে এক দিকে খাদ্যের চাহিদা বাড়বে অথচ অপর দিকে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ কম্‌বে; কিন্তু এমন কোন আশঙ্কা নেই। কারণ, দেশের লোক-সংখ্যার শতকরা ১ ভাগেরও কম এখন কারখানা-শিল্পে লিপ্ত; কারখানা-শিল্পের খুব দ্রুত বিস্তার হ'লেও লোক-সংখ্যার খুব একটা মোটা ভাগ কারখানা-শিল্পে নিযুক্ত হ'তে অনেক দেরী। আর, কারখানা-শিল্পে দেশের অধিকাংশ লোক লিপ্ত হ'লেই যে খাদ্যের পরিমাণ ক'মে যাবে, তা বলা যায় না; কারণ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ কর্‌লে অল্প লোকেই বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন কর্‌তে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কারখানা-শিল্প ও কৃষি দু'য়েতেই সমান কৃতিত্ব দেখানো যদি সম্ভব হয়, ভারতের পক্ষেও তা অসম্ভব না হ'তে পারে। (২) বড় বড় সহর গ'ড়ে উঠলে সেই সব সহরের শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির জন্যে এবং পল্লীগ্রামের শান্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে যত খরচ পড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ পড়্‌বে, এই আপত্তিও করা হ'য়ে থাকে—কিন্তু বেশী খরচ কর্‌বার উপযুক্ত ধনসম্পদ্‌ও

কারখানা-শিল্প হ'তেই পাওয়া যাবে। (৩) পাশ্চাত্ত্য বেকার-সমস্যা এদেশে দেখা দেবে, এই ভয়ও করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও ত' বেকারের দল আছে, আর তাদের সংখ্যা বিলাতের ১০।১১ লক্ষ বা আমেরিকার ৫০।৫৫ লক্ষের চেয়ে বেশী হবে ব'লেই মনে হয়। বেকারের সংখ্যা নেওয়া হয় না ব'লেই আমাদের দেশেও বেকার-সমস্যা যে কতদূর প্রবল, তা বুঝ্‌তে পারা যায় না। সঙ্ঘবদ্ধ কারখানার মজুরেরা বেকার হ'লে দেশের শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা বেশী, কৃষিপ্রধান দেশের বিচ্ছিন্ন-শক্তি বেকাররা কারুর মনে কোন ভীতির সঞ্চার করে না; সুতরাং বেশী কলকারখানা স্থাপিত হ'লে বেকার-সমস্যা যদি নতুন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তাতে বেকার-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আসবে, আর দেশ ধনী হ'লে বেকার-সমস্যা সমাধান কর্‌বার জন্যে আবশ্যক মত টাকারও অভাব হবে না। (৪) আর একটি আপত্তি উঠেছে এই যে, কারখানা-শিল্পের বেশী বিস্তার হ'লে ইয়োরামেরিকার ধনিকদের মত ভারতও জগতের সর্ব্বত্র বাজার খুঁজতে বেরুবে; দেশের ধনিকরা দেশে বেশী দরে মাল বেচে, বিদেশে উৎপাদনের খরচার চেয়েও কম দরে মাল বেচতে পারে, এ ভয়ও করা হয়। এই দুটি কথার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপের ব্যবসায়ীদের মত এদেশের শিল্পপতিদের বাজারের জন্যে দেশে দেশে ঘুরতে হবে না (যদিও কারখানা-শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমদানি ও রপ্তানির বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী)। ভারতেই মস্ত বড় বাজার আছে, কাজেই বাজারের জন্যে অন্য জাতির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হবার বা সমস্ত মাল কাটাবার জন্যে সস্তায় বিদেশে মাল বেচ্‌বার সম্ভাবনা কম। (৫) বড় বড় কারখানা খোলা ও চালানো সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যেরা ওস্তাদ, আমাদের তেমন টাকা বা শিক্ষা বা মাথা

কোথায় যে, আমরা তাদের সঙ্গে রেষারেষি কর্‌তে পারবো ?—এই ধরণের কথা নিতান্ত কাপুরুষের মুখে শোভা পায়। ভারতে কারখানা-শিল্প স্থাপনের সকল প্রকারের স্থবিধা আছে। যদি কারখানা-শিল্প হ'তেই জাতির মঙ্গল হবে বুঝি, তা হ'লে যে কটি সাময়িক বাধা বা অস্থবিধা আছে (যেমন উপযুক্ত শিল্প-নেতার অভাব) সেগুলাকে নিজেদের প্রাণান্ত চেষ্টায় সরাতে হবে। (৬) অনেকে বলেন, কারখানা-শিল্পের সাহায্যে পুঁজিপতি বা মজুরদের উন্নতি হ'তে পারে, কিন্তু চাষাদের উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই, বরং কুটীর-শিল্প থেকে চাষাদের লাভ বেশী, কারণ তারা বৎসরের যে সময়টা বেকার অবস্থায় কাটায় সে সময়টা কুটীর-শিল্পের চর্চ্চা ক'রে বেশী রোজগার কর্‌তে পারে। এর উত্তরে আমরা ব'লবো যে, কারখানা-শিল্পের বিস্তার হ'লেও চাষারা নানাদিকে উপকৃত হবেই—তা আগেই দেখানো হ'য়েছে। আর চাষে এখন আয় অল্প ব'লেই আলস্যের সময় কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ চল্‌তে থাক্‌লে এবং কৃষিকার্য্য হ'তেই চাষাদের যথেষ্ট আয় হ'লে, কুটীর-শিল্পের এই ধরণের প্রয়োজনীয়তা অনেকটা ক'মতে বাধ্য।

বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ

কারখানা-শিল্পের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি তোলা হ'য়ে থাকে, সেগুলা যে বিশেষ যুক্তিসঙ্গত নয়, তা আমরা দেখ্‌লুম। এ সব আপত্তি আমাদের মনে এত বড় হ'য়ে দেখা দেবার কারণ, আমাদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধেই বিশ্বাসের একান্ত অভাব। কারখানা-শিল্প ভারতকে

জগতের একটা শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত কর্তে পারবে কিনা, এর যোগ্যতা-বিষয়ে এই সন্দেহ আমাদের মনে অত্যন্ত বদ্ধমূল ব'লেই আমরা আমাদের অযোগ্যতা কতকগুলা অসার আপত্তি দিয়ে ঢেকে রাখ্‌তে চাই। যদি বুঝি এই দিকে চেষ্টা না কর্‌লে দেশের মঙ্গল অসম্ভব, অথচ এই দিকেই আমাদের যোগ্যতার একান্ত অভাব, তা হ'লে প্রাণপণে এই যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌তে সচেষ্ট হ'তে হবে। যে সকল দেশ আজ কারখানা-শিল্পে জগতের মধ্যে প্রধান, তারাও ত একসময়ে আমাদের মতই কৃষি আর কুটীর-শিল্পেই লেগেছিল, আর সেই সময় কৃষি আর কুটীর-শিল্পে ভারত সকল দেশের চেয়ে এগিয়েই ছিল। এখন জগতে কারখানা-শিল্প ব'লে একটা নতুন জিনিষের আবির্ভাব হ'য়েছে, যার সাহায্যে অন্য দেশগুলা অতি ক্ষুদ্র হ'লেও প্রধানতঃ টাকার জোরে সমগ্র জগতের ওপর আধিপত্য কর্‌ছে। এখনও এই কারখানা-শিল্পকে বিনা দ্বিধায় অবলম্বন না কর্‌লে কৃষি আর কুটীর-শিল্পের যত উন্নতিই আমরা করি না কেন, আমরা কখনই জগতের অত্যন্ত ধনী দেশগুলার সমকক্ষ হ'তে পারবো না। অবশ্য এ পথে অনেক বাধা আছে। কিন্তু প্রধান বাধা যেটা ছিল—আমাদের শাসকদের এ বিষয়ে দারুণ অনিচ্ছা—সেটা অনেকটা সরে গেছে। আমাদের শাসকরাও বুঝেছেন যে, ভারত কারখানা-শিল্পে প্রধান না হ'লে সামরিক হিসাবে অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে থাকবে, যুদ্ধের সময় বিলাত হ'তে ভারতের সংস্রব ছিন্ন হ'লে আবশ্যকীয় সামরিক দ্রব্যগুলা—যা বড় বড় এঞ্জিনিয়ারীং ও রাসায়নিক কারখানা না হ'লে তৈরী করা অসম্ভব—তা ভারত যোগাতে পারবে না। ভারত ক্রমাগত দরিদ্র হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে তাঁদের জিনিষ ভারতে আর তেমন বিকাচ্ছে না, সুতরাং তাঁদের স্বার্থের জন্যেই কারখানা-

শিল্পের সাহায্যে ভারতকে অধিকতর ধনী করা আবশ্যক, তাও তাঁরা বুঝেছেন। তা ছাড়া, ভারতে কারখানা-শিল্প না থাকলে বিলাতের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভারতের বাজার দখল করতে পারে (যেমন জার্মাণি ও অষ্ট্রিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে ক'রেছিল)—এটাও ইংরেজের স্বার্থের অনুকূল নয়। এই সব কারণে ইংরেজ ভারতকে কারখানা-শিল্পে প্রবল করতে ইচ্ছুক হ'য়েছে এবং এদিকে কিছু কিছু চেষ্টাও করছে। বলা যেতে পারে যে, ভারতে কারখানা-শিল্প প্রবল হ'লে ইংরেজেরই ত স্বার্থহানির সম্ভাবনা, কারণ, ভারত তখন বিলাতী জিনিষ আরও কম কিনবে। সুতরাং এ বিষয়ে ইংরেজের চেষ্টা কখনই আন্তরিক হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু কারখানা-শিল্পে ভারত উন্নত হ'তে চেষ্টা করলে বিলাতের আর ভারতের স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত নাও হ'তে পারে—একথাও আমাদের শাসকগণ ভেবে দেখেছেন। বড় বড় মিল কারখানার যন্ত্রপাতি কারখানা-শিল্পের বিস্তারের প্রথম অবস্থাতেই এ দেশে তৈরী করা সম্ভব হবে না, কাজেই যন্ত্রপাতি ভারতের বার থেকেই আনতে হবে। এই সমস্তের অর্ডার যোগাড় করতে পারলে যন্ত্রপাতি তৈরীর কারবারগুলা চলবে ভাল, এ কথা ইংরেজ বেশ ভাল বোঝে। তা ছাড়া কারখানা-শিল্পে বিলাত আর ভারতের মধ্যে একটা শ্রমবিভাগ দাঁড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়—খুব সম্ভব বিলাত জটীল জিনিষগুলা তৈরী করবে, আর ভারত অপেক্ষাকৃত সোজা জিনিষগুলাই তৈরী করবে। কাজেই পরাধীন ব'লে শাসকদের কাছে আমরা বিশেষ বাধা পাবো, তা নয়। কিন্তু বেশী বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা আমাদের দেশেরই লোকের কাছ থেকে; কারণ তাঁরা এখনও প্রধানতঃ কুটীর-শিল্পকেই একটা মিথ্যা মোহে আঁকড়ে থাকতে চান। আর যা সব বাধা আছে, তা এই বাধার কাছে তুচ্ছ। কুটীর-

শিল্পেরও উন্নতি হোক্ তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই, বরং সমূহ লাভই আছে। কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা এখনও যেন কারখানা-শিল্পের গভীর ও ব্যাপক বিস্তারে, আর কুটীর-শিল্পের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণের ধ্বংসেই প্রযুক্ত হয়। এ বিষয়ে এখনও যদি আমাদের চেষ্টার শৈথিল্য হয়, তবে ভারতের আর্থিক গগন যে এখনও অনেক দিন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাক্‌বে, একথা খুব জোরেই বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশের রাস্তা-সমস্যা

মফঃস্বলের কাগজপত্রগুলা যখন নিয়মিতভাবে দিনের পর দিন পড়্‌তে হ'ত, তখন বাংলাদেশের মফঃস্বলের রাস্তার দুর্দ্দশার কথা প্রায়ই জান্‌তে পারতুম ! কিন্তু এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল না। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার প্রধান কেন্দ্র আরামবাগ সহরে কাজ কর্‌বার আবশ্যক হওয়াতে, এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাই। আরামবাগ পৌঁছুতে হ'লে সাধারণতঃ মার্টিন কোম্পানীর রেলে চাঁপাডাঙ্গা গিয়ে সেখান হ'তে পাল্কী বা গরুর গাড়ীতে ১৫ মাইল পথ অতিক্রম কর্‌তে হয়। এই পথটি কিরূপ, তা গরুর গাড়ীতে যাবার প্রয়োজন হওয়ায় যথেষ্ট জানবার সুযোগ হ'য়েছিল। ১৩৩৭ সালে একবার বাইকে ক'রে এই পথটা অতিক্রম কর্‌তে হয়। তাতে এ পথটির জ্ঞান আরও সুস্পষ্ট ক'রে তোলবার সুযোগ পাই। প্রত্যেক রাস্তার দুধারে সীমার একটা রেখা থাকে, যা থেকে বোঝা যায় যে, রাস্তার বিস্তার কোন খান থেকে আরম্ভ হ'য়েছে আর কোন খানে শেষ হ'য়েছে। কিন্তু চাঁপাডাঙ্গা-আরামবাগ রাস্তার এসব কোন বালাই নেই। রাস্তাটি কোন্ খানে মাঠ থেকে আরম্ভ হ'য়েছে আর কোন্ খানে মাঠে গিয়া আবার মিশেছে, তা স্থির করা অনেক সময়ে শক্ত হ'য়ে ওঠে। তা ছাড়া যেখান দিয়ে রাস্তাটি গিয়েছে, সেটা রাস্তারই অংশ, না মাঠেরই অংশ, তাও অনেক সময়ে ঠিক করা যায় না ; কারণ রাস্তার মধ্যেই গাড়ীর চাকার দাগও আছে, আর গাড়ীর চাকার দাগের মাঝে মাঝে ঘাসও দিব্যি গজিয়েছে। রাস্তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, সেটা সমতল হবে যার ওপর দিয়ে গাড়ীর চাকা অক্লেশে

গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই ধারণা চাঁপাডাঙ্গা-আরামবাগ রাস্তা সম্বন্ধে খাটে না। কারণ, এই রাস্তাটি এইরূপই বন্ধুর যে, এই রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ী ক'রে বেড়ালে বমনের প্রবৃত্তি হয় না, এমন লোক বাংলাদেশে খুবই কম আছে। এই রাস্তার দুধারে ক্ষেত ও মাঠ যতটা সমতল, আদত রাস্তটিও তত সমতল নয়। রাস্তাটি সমতল ত নয়ই, তার ওপর আবার এর অধিকাংশ স্থানই এত বেশী ধুলায় আচ্ছন্ন যে, এক গরুর গাড়ী ছাড়া (এ দেশে দেখ্‌ছি যে, গরুর গাড়ীর চল্‌বার জন্যে কোন রাস্তা দরকারই হয় না—কোন রাস্তা না থাকলেও চলে) অন্য কোন যানের অগ্রসর হওয়া একরকম অসম্ভব। বিশেষতঃ এই রকম রাস্তায় বাইসিক্‌ল্ চড়্‌তে হ'লে প্যাডল্ কর্‌তে পাদুটাকে ক্লান্ত কর্‌তে ত' হয়ই, তা ছাড়া বেশীর ভাগ স্থানে বাইক্ চালানো অসম্ভব ব'লে বারবার বাইক থেকে নেমে বাইক ঠেলে নিয়ে যাবার দরকার হয়।

এই রাস্তা দিয়ে চাঁপাডাঙ্গা থেকে আরামবাগ পৌঁছুতে গরুর গাড়ীতে লাগে ৮ ঘণ্টা পাল্কীতে লাগে ৫ ঘণ্টা, আর বাইসিক্‌লে লাগে ঘণ্টা দুই বা আড়াই। গরুর গাড়ীতে ভাড়া ৸৹ আনা থেকে ৪৲ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। পাল্কীর ভাড়া ৪৲ টাকা থেকে ৭৲ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে।

বর্ষাকালে এই রাস্তার সবটাই জলে ডুবে থাকে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামগুলাই কেবল দ্বীপের মত জেগে থাকে। জলে ডোববার প্রধান কারণ এই যে, এই পথে তিনটি বড় নদী—দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী ও সোদপুরের নদী আছে—এই কটিই বর্ষার সময়ে দুকূল ছাপিয়ে ভ'রে ওঠে। সেই জন্যেই এই রাস্তা ডুবে যায়। তারপর শীতকালে বর্ষার জল শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও জেগে ওঠে। যখন প্রথম রাস্তা দেখা দেয় তখন তা সুগম থাকে না—এই রাস্তা অতিক্রম কর্‌বার সময় তখন

অনেক খাল বিল ডোবা পেরুতে হয়। সেই জন্যে সেই সময়ে গরুর গাড়ী বা পাল্কীর ভাড়া খুবই বেশী থাকে। তারপর যত রাস্তা সুগম হ'তে থাকে তত ভাড়াও কম্‌তে থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে এই রাস্তার প্রায় সবটাই শুক্‌না হ'য়ে ওঠে। কেবল নদী কটাই খুবই শীর্ণ হ'য়ে বইতে থাকে। তখন ভাড়াও খুব ক'মে যায়।

গরুর গাড়ীর ভাড়া কমে আরও একটা কারণে। শীতকালে ধান কাটা, ঝাড়া ও মরাই-জাত হ'য়ে গেলে চাষীদের আর কিছু কাজ থাকে না। এই সময়ে চাষীদের অনেকেই গরুর গাড়ী চালাতে আরম্ভ করে। গরুর গাড়ীর সংখ্যা বাড়াতে ভাড়াও ক'মে যায়।

যাদের বেশী পয়সা আছে—যেমন জমিদার বা গবর্ণমেণ্টের মোটা মাইনের চাকর—তাঁরাই কেবল পাল্কী ব্যবহার ক'রতে পারেন। তা' না হ'লে সাধারণ ভদ্রলোকেরা চলাচলের জন্যে গরুর গাড়ীই ব্যবহার করেন। আরামবাগে যা কিছু মাল আমদানি-রপ্তানি হয়, তাও গরুর গাড়ীর সাহায্যে। গরুর পিঠে চাপিয়েও অনেক সময় মাল যাওয়া আসা করে।

বাংলাদেশের এক অংশের পথঘাট ও যানবাহনের যে পরিচয় দেওয়া গেল, সমগ্র বাংলা দেশের অনেক অংশ সম্বন্ধেই একথা কম-বেশী বলা চলে। অল্প সময়ে কম খরচে বাংলা দেশের কোন জায়গা থেকে অন্য যে কোন জায়গায় যাবার আয়োজন এখনও করা হয় নি। অনেক সময়ে বাংলা দেশের একস্থান হ'তে অন্য স্থানে যেতে যে সময় ও যে খরচ লাগে, সেই সময় ও সেই খরচে বাংলা প্রদেশের বাইরে অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে যাওয়া চলে। বাংলার রাস্তাঘাটের দুরবস্থা ও যানবাহনের দুরবস্থা বাংলার আর্থিক দুর্দ্দশারই পরিচায়ক। বাঙালীর টাকা রোজগারের ক্ষমতা নেই, বাঙালী বিষম দরিদ্র, সেই জন্যেই বাঙালীর পল্লীগ্রামগুলা রাস্তাঘাট ও যান-বাহন বিষয়ে এত পশ্চাতে।

রাস্তাঘাট ও যানবাহনের উন্নতি কর্‌বার উপায় কি? এর উপায় হচ্ছে—প্রথমতঃ, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি। দ্বিতীয়তঃ, ভাল খাওয়া পরার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক লোকের মধ্যে জাগানো। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের যত উন্নতি হবে, ততই ভাল ভাল মাল, দামী মাল ও অধিকতর পরিমাণের মাল রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করবার দরকার হবে। তাতে ভাল রাস্তার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি হবে, আর ভাল রাস্তা কর্‌বার জন্যে টাকার জোগাড় হবারও সম্ভাবনা হবে। আর, চাই ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়ানো। বাঙালীর অধিকাংশই এখন চাষী। এদের মধ্যে ভাল খাবার পরবার আকাঙ্ক্ষা বাড়্‌ছে। তার প্রমাণ এই যে, ভদ্রলোকের মত কাপড় চোপড়, জামা জুতা, ছাতি ব্যবহারের রেওয়াজ এদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এদের ভোগের আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়া দরকার। ভাল খাবো, ভাল প'রবো, ভাল রাস্তা দিয়ে ভাল গাড়ী চ'ড়ে যাওয়া আসা করবো—এই আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে জাগিয়ে তোলা দরকার। যারা বর্ত্তমান নিয়েই সন্তুষ্ট, তারা কখনও ভবিষ্যতে উন্নতি কর্‌তে পারে না। গরুর গাড়ীই চলাফেরার পক্ষে যথেষ্ট—এই ধারণা নিয়ে যারা ব'সে আছে, তাবা চিরকাল গরুর গাড়ীই চ'ড়বে, মোটরে চড়্‌বার তাদের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। এই জন্যেই বাঙালীর ভোগের আকাঙ্ক্ষা না বাড়ালে বাংলাদেশের সর্ব্বত্র ভাল রাস্তা কিংবা উন্নত শ্রেণীর যান দেখা দেবে না।

সভ্যতা মাপবার নানা মাপকাঠি আছে। তার মধ্যে রাস্তাঘাট ও যানবাহন একটি। বাঙালী সভ্যতার কোন্ স্তরে অবস্থিত? কল্‌কাতা দেখ্‌লে মনে হবে, বাঙালী বুঝি বা ইয়োরামেরিকার সমানই সভ্য। কারণ কল্‌কাতার রাস্তাঘাট ও যানবাহন ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠ সহরকে প্রায় নাগাল ধরে। কিন্তু কল্‌কাতাই সমগ্র বাংলা দেশ নয়। ৫ কোটি

বাঙালীর একটা খুব সামান্য অংশই কল্‌কাতায় বা কল্‌কাতার সমশ্রেণী সহরে বাস করে। অধিকাংশ বাঙালীই বাস করে পল্লীগ্রামে। দিনগুজরাণ করে মাঠের কাজ ক'রে, আর যাতায়াত করে গরুর গাড়ীতে বা দেশী নৌকায় চ'ড়ে। অবশ্য রেল ষ্টীমার ও বাসের আধিপত্য ক্রমেই বাড়্‌ছে। কিন্তু তা হ'লেও ইয়োরামেরিকার রাস্তাঘাট ও যানবাহনের মাপকাঠি দিয়ে বাংলাকে মাপতে গেলে মনে হবে যে, বাংলা এখনও আদিম যুগের দেশ, সভ্যতার আলো এদেশে সবে মাত্র ঢুক্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, কিন্তু সমগ্র দেশটার অন্ধকার এখনও দূর কর্‌তে পারে নি।

বিলাতের বেকার-সমস্যা

বিলাতে বেকার-সমস্যা আজকাল খুবই প্রবল। বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্যে নানা দিক্ থেকে নানাভাবে চেষ্টা চল্‌ছে। বিলাতের দু'জন প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিদ্ ঐ সম্বন্ধে কি ভাবে চিন্তা কর্‌ছেন, তা আমরা এই প্রবন্ধে জানাতে চাই।

গত বৎসর অধ্যাপক হেনরি ক্লে (ইনি কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন) একখানা বই লিখেছিলেন। তার নাম হচ্ছে "দি পোষ্ট ওয়ার আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট ইন গ্রেট বৃটেন।" বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছে এই বছরের * মার্চ্চ মাসের "ইকনমিক্ জার্ণ্যালে"। সমালোচক—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এড্‌উইন ক্যানান। সমালোচনাটি বেশ দীর্ঘ। তা থেকেই বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্যানান ও অধ্যাপক ক্লের মতামত বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝ্‌তে পারা যায়।

অধ্যাপক ক্যানান প্রথমেই বল্‌ছেন, অল্পকালব্যাপী আর দীর্ঘকালব্যাপী এই দুই শ্রেণীর বেকার আছে। এই দুই শ্রেণীতে বেকারদের ভাগ করা দরকার। তার কারণ "অল্পকালের জন্যে" বেকার হওয়া "দীর্ঘকালের জন্যে" বেকার হওয়ার মত সাঙ্ঘাতিক নয়। মজুরদের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দীর্ঘকালের জন্যে যদি বেকার থাকে, সেটা যতটা ভীষণ, তাদের অধিকাংশই যদি কয়েকদিনের জন্যে বেকার থাকে, সেটা মোটেই ততটা ভীষণ নয়। এই কারণে বেকার-সমস্যার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে কতকগুলা লোক কত বছর, দিন বা মাস বেকার হ'য়ে আছে, তা জানা বিশেষ দরকার। তা ছাড়া অল্প কালের জন্যে যে বেকার-সমস্যা, তার

---

* ১৯৩০ সন।

কারণ দীর্ঘকালস্থায়ী বেকারের কারণগুলা হ'তে সাধারণতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্। এই দুই প্রকারের লোকের দাওয়াই ঐ কারণে এক না হ'য়ে পৃথক্। এই জন্যেও এদের আলোচনা পৃথক্ হওয়া দরকার।

এই সব কথা ব'লে অধ্যাপক ক্যানান কালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বেকার ভাগ করার আবশ্যকতা বুঝিয়ে বল্‌ছেন যে, অধ্যাপক ক্লে তাঁর গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আদবেই ভাল ক'রে আলোচনা করেন নি। বিলাতে বেকারদের বেকার-সমস্যা কত দিন যাবৎ চল্‌ছে তার একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অধ্যাপক ক্লের গ্রন্থে স্থান পায় নি।

অল্পকালস্থায়ী বেকার অবস্থা সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্যানানের বক্তব্য এই—যে সব শিল্পের বেশ শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে এবং যেগুলার বেকার বীমার বন্দোবস্ত সব চেয়ে ভাল, সেই গুলায়ই অল্পকালস্থায়ী বেকারের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যাচ্ছে। সেই জন্যে ক্যানান বলেন যে, এই শ্রেণীর বেকার অবস্থার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, বেকার বীমার প্রবর্ত্তন। যখন কারখানাওয়ালারা দেখে তাদের লাভ তেমন হচ্ছে না, তখন তাদের ইচ্ছা হয় যে, কয়েক জন লোক ছাড়িয়ে দিয়ে ব্যয়-সঙ্ক্ষেপ করি। যদি বেকার বীমা না থাকতো, তা হ'লে লোক ছাড়াতে কারখানাওয়ালাদের ইতস্ততঃ করতে হ'ত। কারণ তা হ'লে মজুরদের সঙ্গে তাঁদের ঝগড়া বাধবার সম্ভাবনা। কিন্তু বেকার বীমা আছে ব'লেই কারখানাওয়ালারা জানে যে, লোক ছাড়াইলেই তারা বেকার বীমার ফাণ্ড থেকে সাহায্য পাবে। কাজেই লোকদের ক্ষেপবার সম্ভাবনা কম। এই কারণেই কারখানাওয়ালারা একটু দুঃসময়ে প'ড়লেই লোক ছাড়াতে দ্বিধা করে না।

বেকার বীমা বেকার-সমস্যা বাড়িয়েছে আর এক রকমে। যদি বেকারেরা জানে যে, বেকার অবস্থায় তারা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে

সাহায্য পাবে, তা হ'লে তারা যে কোন কাজ পেলেই তাতে যোগ দিতে চায় না, আরও একটু ভাল কাজের জন্যে অপেক্ষা কর্‌বার শক্তি পায়। অবশ্য বিলাতে লেবার এক্সচেঞ্জ আছে; আর লেবার এক্সচেঞ্জ বেকারদের যোগ্য কাজ জুটিয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু লেবার এক্সচেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, বেকার বীমা থাকার জন্যে বেকাররা যে আরও ভাল কাজ পাবার জন্যে একটু অপেক্ষা কর্‌তে সাহসী হয় এবং তাতে বেকার অবস্থা আরও দীর্ঘ ক'রে তোলে, তাতে সন্দেহ নেই।

অল্পকালস্থায়ী বেকার অবস্থার দাওয়াই হিসাবে অধ্যাপক ক্যানান প্রস্তাব করেন যে, অন্ততঃ যে সময়টুকু বেকার থাক্‌লে বেকার বীমার ফাণ্ড থেকে টাকা পাবার দাবী করা যায়, সেই সময়টুকুকে আরও দীর্ঘ ক'রে দেওয়া উচিত।

তার পর হচ্ছে দীর্ঘকালস্থায়ী বেকার-সমস্যার কথা। এ রকম বেকার অবস্থার কারণ কি ?

দীর্ঘকালস্থায়ী বেকার অবস্থা দেখা যায় বিলাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি শিল্পগুলাতে। কয়লা, বস্ত্র ও এঞ্জিনিয়ারিং—এই কটা শিল্পেই বেকার-সমস্যা প্রবল। এই সব শিল্পে বেকার-সমস্যার কারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্লে ও অধ্যাপক ক্যানান দু'জনেই একমত। দু'জনেই বলেন যে, এই সব শিল্পে উৎপন্ন মাল যে দরে বিদেশের বাজারে বেচলে এদের উৎপাদনের খরচা কুলায়, সে দরে এরা বেচতে পারছে না, তার চেয়ে কম দরে বেচতে বাধ্য হচ্ছে। সেই জন্যেই এই সব শিল্পের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, আর তার জন্যেই এই সব শিল্পে বেকার-সমস্যা প্রবল।

দীর্ঘকালস্থায়ী বেকার অবস্থার কারণ সম্বন্ধে একমত হ'লেও তার দাওয়াই সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্লে ও অধ্যাপক ক্যানানের মধ্যে যথেষ্ট

মতভেদ আছে। অধ্যাপক ক্লে বল্লেন যে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত রপ্তানিশিল্প-গুলাকে জীয়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে শিল্পগুলাতে যুক্তিযোগ প্রয়োগ করা, অর্থাৎ শিল্পগুলা উন্নততর শাসন প্রণালী ও কলকব্জার সাহায্যে চালানো, ছোট ছোট শিল্পগুলাকে বড় কারবারে পরিণত করা ইত্যাদি।

অধ্যাপক ক্যানান বল্লেন যে, যুক্তিযোগ প্রয়োগ কর্‌লে কিছু উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই। যুক্তিযোগ প্রয়োগ কর্‌লে মজুরপ্রতি উৎপাদন বাড়্‌বে, তার ফলে কম মজুরে আগের সমান উৎপাদন চল্‌বে। এর ফলে বেকারদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। তবে উৎপাদন-খরচা কমার জন্যে, ও কম দামে বেচার ফলে, যদি চাহিদার পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়, তা হ'লে যুক্তিপ্রয়োগের আগে যত লোক কাজ পেতো, যুক্তিপ্রয়োগের পরে তার চেয়ে বেশী লোক কাজ পেতে পারে। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিপ্রয়োগের ফলে বেকার কম্‌তে পারে কেবলমাত্র এক অবস্থায়—যখন চাহিদার পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়। বিলাতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলার মধ্যে কয়লা ও কাপড়ের শিল্পই প্রধান। এই দুই শিল্পেরই চাহিদা এরূপ শ্রেণীর নয় যে, দাম কম্‌লে চাহিদার পরিমাণ খুব বেশী বাড়বে। কাজেই যুক্তিপ্রয়োগ কর্‌লে বিলাতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্প-গুলার অবস্থা ফেরবার কোন সম্ভাবনা নেই।

বেকার-সমস্যা সমাধানের আর একটা উপায় আছে—সেটা হচ্ছে, যারা বেকার নয় তাদের মাইনে কমিয়ে দিয়ে যে মাইনেটা বাঁচবে, তা দিয়ে বেকারদের মধ্য থেকে লোক নিযুক্ত করা। অধ্যাপক ক্যানান ও ক্লে দু'জনেই এ পন্থা অবলম্বনের বিরোধী। অধ্যাপক ক্লে এর বিরোধী এই কারণে যে, এ পথ অবলম্বন করা একেবারে

অসম্ভব, মজুররা কম মাইনে নিতে রাজীই হবে না। অধ্যাপক ক্যানান কিন্তু বলেন যে, এ পন্থা অবলম্বন শুধু অসম্ভব নয়, ও উপায়ে হাত দেওয়া আদবেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার কারণ এই—মাইনে কমিয়ে দিয়ে শিল্পগুলা যদি বেশী লোক পুষ্‌তে আরম্ভ করে, তার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে, উৎপাদন বাড়লেই দাম ক'মবে। অধ্যাপক ক্যানান বলেন যে, বিলাতের বিক্রী বেশীর ভাগ বিদেশের বাজারে, বিদেশীদের কাছে কম দাম নেওয়া কখনই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

বেকারের সংখ্যা কমাবার একটা তৃতীয় উপায় আছে। সেটা হচ্ছে—নতুন লোক দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলাতে যাতে না ঢোকে, আর সেই শিল্পগুলা হ'তে মজুরদের সরিয়ে উন্নতিশীল শিল্পগুলাতে যাতে ঢোকে, তার ব্যবস্থা করা।

অধ্যাপক ক্লে এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পর থেকে মাত্র চার লাখ লোক এই রকমে আপনা হ'তে দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলাতে কাজ করা ছেড়েছে। গবর্ণমেণ্ট এই কাজ দ্রুত কর্‌বার জন্যে যে বোর্ড স্থাপন করেছিলেন, সেই বোর্ড ৮ মাসে মাত্র ২৮ হাজার লোককে সরাতে পেরেছে। সুতরাং এই প্রণালীতে কাজ ক'রে এ পর্য্যন্ত বিশেষ ফল পাওয়া যায় নি। তা ছাড়া উন্নতিশীল শিল্পগুলা যতই উন্নতিশীল হোক্ না কেন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলাতে যত বেকার আছে, তাদের স্থান দেওয়া উন্নতিশীল শিল্পগুলার পক্ষে অসম্ভব।

অধ্যাপক ক্যানানের মত ঠিক উল্টা। ইনি বলেন, বিলাতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলা ম'রেই গেছে, তাদের আর জীয়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের অভাব নিবারণের জিনিষ অসংখ্য। সেই জন্যে শিল্পের সংখ্যাও

অগণিত। কতকগুলা রপ্তানি-শিল্প অধঃপাতে গেছে ব'লে বিলাতের চিন্তিত হবার কারণ নেই। বিলাত অন্য জিনিষ রপ্তানি ক'রতে থাকুক—যে সব জিনিষের চাহিদা বিদেশের বাজারে এখনও আছে। যেমন, আফ্রিকার বাজার—এটা একটা প্রকাণ্ড বাজার। আফ্রিকার জন্যে নানা জিনিষ বিলাত তৈরী ক'রতে পারে। তা ছাড়া, দেশের লোকের চাহিদা মেটাবার জন্যেও বিলাতের শিল্পপতিরা নানা জিনিষ তৈরী ক'রতে পারেন, আর তা তাঁদের বাধ্য হ'য়ে তৈরী ক'রতে হবেই। তা না ক'রে উপায় নেই। কারণ, প্রধান রপ্তানিশিল্পগুলার ধ্বংস হ'লে রপ্তানির পরিমাণ ক'মবে। তার ফলে আমদানি ক'মবে। আমদানি ক'মলে বিলাতকে নিজের দেশে অনেক জিনিষ তৈরী ক'রে নিতে হবে।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক ক্লে বেকারের সংখ্যা কমাবার জন্যে জীর্ণ শিল্পগুলাকে নতুনভাবে গ'ড়ে তোলবার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু অধ্যাপক ক্যানান ব'লছেন, "ওগুলা একেবারে ম'রতে বসেছে, ওদের আর জীবিত করা সম্ভব হবে না। তোমরা নতুন শিল্প ধর। তা ছাড়া বিদেশের বাজারের ওপর তোমরা এতদিন পর্য্যন্ত যে রকম একাগ্র-ভাবে নির্ভর ক'রে এসেছ, তা আর চলবে না, এখন ঘরের বাজারের দিকে দৃষ্টিপাত করো, আর দেশের মধ্যেই কতটা বেচাকেনা বাড়াতে পারো তার চেষ্টা দেখো।"

ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি স্থাপনের সুফল

[মার্টিন কোম্পানীর রেলে চ'ড়ে হাওড়া হ'তে চাঁপাডাঙ্গা যাচ্ছিলাম। পথে বঙ্গবাসী কলেজের আই এস-সি শ্রেণীর একটি ছাত্রের (ঐ লাইনে অবস্থিত কলকাতা থেকে ২২ মাইল দূরবর্ত্তী ঝিঙ্গড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামের অধিবাসী) সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর সঙ্গে যেসব কথাবার্ত্তা হয়, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।]

প্রঃ—আপনাদের গ্রামে একটি ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি আছে বলছিলেন, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানতে আমি অত্যন্ত উৎসুক। সেই জন্যে আপনাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী আছেন কি ?

উঃ—যথাসাধ্য উত্তর দেবো। আপনি আপনার প্রশ্ন করুন না।

প্রঃ—আপনাদের সমিতির সভ্য কয়জন ?

উঃ—দেড়শত।

প্রঃ—এঁদের মধ্যে ভদ্রলোক কয়জন, ছোটলোকই বা কয়জন ?

উঃ—ভদ্রলোক ৫০ জন এবং ছোটলোক ১০০ জন।

প্রঃ—আপনাদের গ্রামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা কত ?

উঃ—৩০০ জন।

প্রঃ—তাহা হ'লে ত দেখছি গ্রামের শতকরা ৫০ জন আপনাদের সমিতির সভ্য ; এতগুলা লোককে সভ্য করা হ'ল কি প্রকারে ?

উঃ—অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে হাতে পায়ে ধ'রে তবে এদের সভ্য করা হ'য়েছে।

প্রঃ—সমিতির আয় কিরূপ ?

উঃ—মাসিক ৬০৲।৭০৲ টাকা।

প্রঃ—কে কিরূপ চাঁদা দেয় ?

উঃ—ভদ্রলোকেরা ৩৲, ২৲ বা ১৲ টাকা—যাঁর যেমন সামর্থ্য তেমন দেন। ছোটলোকেরা প্রত্যেক মাসে তাদের দুই বা তিন দিনের রোজগারের টাকা দিয়ে থাকে। অনেক ছোটলোক রোজগারের পয়সা না দিয়ে শারীরিক পরিশ্রম ক'রে (যেমন জঙ্গল কাটা) চাঁদা দিয়ে থাকে।

প্রঃ—ছোটলোকদের দলে ঢোকালেন কিরূপে ? তারা কি আনন্দের সঙ্গে চাঁদা দেয় ?

উঃ—অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে তবে তাদের ঢোকাতে পারা গেছে। চাঁদা এখন তারা আনন্দের সঙ্গেই দেয়। কারণ সমিতির উপকারিতা এখন তা'রা বুঝতে পেরেছে।

প্রঃ—এই সব বোঝানো পড়ানোর কাজ ক'রল কারা ?

উঃ—এ সব কাজ প্রধানতঃ স্কুলের ছাত্ররাই ক'রেছে; অবশ্য তারা জনকয়েক উৎসাহী বয়স্ক লোকের দ্বারাই চালিত হ'য়েছে। ছাত্রেরা শুধু যে সাধারণ লোকদের মুখের কথায় বুঝিয়েছে, তা নয়, তারা নিজ হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে উৎসাহের সঙ্গে লেগেছে। এই জন্যেই ছোটলোকদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রতে পেরেছে। ভদ্রলোকের ছেলেদের এইরূপ খাটতে দেখেই ছোট লোকেরা বুঝলে যে, ব্যাপারটি একেবারে ভুয়া নয়।

প্রঃ—আপনাদের সমিতির টাকা কি কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় ?

উঃ—একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলবার কথা আছে। সমিতির অর্দ্ধেক টাকা এই চিকিৎসালয় খোলবার জন্যে ব্যাঙ্কে জমা থাকে।

জঙ্গল পরিষ্কার করা, ডোবাগুলাতে কেরোসিন তেল ঢালা, এ সবের জন্য বাকী টাকা খরচ করা হয়।

প্রঃ—ডোবাগুলাতে কেরোসিন তেল ঢালবার উদ্দেশ্য কি?

উঃ—তা হ'লে ডোবাতে মশা জন্মাতে পারে না।

প্রঃ—কিন্তু তাতে জল খারাপ হ'য়ে যায় না কি?

উঃ—ডোবার পচা জল ব্যবহারের যোগ্যই নয়।

প্রঃ—আপনাদের গ্রামে খাবার জলের ব্যবস্থা কিরূপ?

উঃ—অধিকাংশ লোকই আজকাল টিউব ওয়েলের জল ব্যবহার ক'রে থাকে।

প্রঃ—টিবউ ওয়েল কি সমিতি তৈরী ক'রেছে?

উঃ—না, ওগুলা গ্রামের জনকয়েক অবস্থাপন্ন লোক তৈরী ক'রেছেন। আমরাই ত ৪।৫টা তৈরী করিয়ে দিয়েছি। টিউবওয়েল-গুলা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'লেও সাধারণকে ব্যবহার ক'রতে দেওয়া হয়।

প্রঃ—ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্যে সমিতি আর কি কাজ ক'রেছেন?

উঃ—একটি ছোট বায়স্কোপের কল কিনে বায়স্কোপের সাহায্যে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করবার চেষ্টা হ'য়েছিল। কিন্তু গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো নেই। ব্যাটারী কিনে বায়স্কোপ দেখাতে হ'লে খরচ বেশী পড়ে। তা ছাড়া আমাদের বায়স্কোপের কলটি যত ছোট, তদনুযায়ী ফিল্ম্ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

প্রঃ—রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চাটুয্যে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক আছে কি?

উঃ—আমাদের সমিতি উক্ত কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনেই কাজ ক'রছে।

প্রঃ—কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট আপনারা কি সাহায্য পেয়ে থাকেন ?

উঃ—আমরা ম্যালেরিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ ওষুধ এডওয়ার্ডস্ টনিক বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর কাছথেকে ও ঐ সমিতির হাত দিয়ে বিনা মূল্যে পেয়ে থাকি। এ ছাড়া সমিতির নিকট যেসব ওষুধাদি কিনি, তা বাজারের সিকি মূল্যে পেয়ে থাকি। সমিতি আমাদের ম্যালেরিয়া-সম্বন্ধীয় কয়েকটা মাসিক পত্র ও নানা পুস্তিকা বিনামূল্যে দিয়া থাকেন।

প্রঃ—আপনাদের সমিতি কয় বৎসর কাজ ক'রছে ?

উঃ—৪।৫ বৎসর।

প্রঃ—কাজের কোন সুফল পাওয়া গেছে কি ?

উঃ—যথেষ্ট। গ্রামে আগে যত ম্যালেরিয়া হ'ত, এখন তার ৮ ভাগের ১ ভাগে ক'মে গেছে। আগে গ্রামের লোকে ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতো, এখন অনেকে আবার গ্রামে ফিরে আসছে। শুধু আমাদের গ্রামে নয়, এই অঞ্চলে আরও কয়েকটি গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপিত হওয়ার ফলে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'য়েছে ব'লে আমার জানা আছে।

সংরক্ষণ শুল্ক ও মার্কিণ শ্রমিক-সঙ্ঘ

মার্কিণ শ্রমিকদের একটি সঙ্ঘ মোতায়েন আছে; নাম 'আমেরিকান ফেডারেশ্যান অব্ লেবার'। ১৮৮১ সনে এই সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। সংরক্ষণ শুল্ক বসানো সম্বন্ধে এই সঙ্ঘের মনোভাবটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'সংরক্ষণ বনাম অবাধ বাণিজ্য' সমস্যা নিয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক ও অন্যান্য দলের মধ্যে বেশ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হ'য়েছিল। মার্কিণ শ্রমিক-সঙ্ঘ দলাদলিতে যোগ না দিয়ে থাকা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। তখনকার অনেক শ্রমিক-নেতার ধারণা ছিল যে, সংরক্ষণ শুল্ক কলকারখানাওয়ালাদের, আর অবাধ বাণিজ্য শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপোষক।

১৯০৬ সনে সঙ্ঘের মনোভাব একটু ব'দলে গেল। সঙ্ঘ বলেন, "সংরক্ষণ শুল্ক বা অবাধ বাণিজ্য,—কোন বিশেষ মতের সঙ্গে আমরা মত মেলাতে চাই না, কিন্তু এমন যখন দেখব যে, সংরক্ষণশুল্ক অবলম্বন ক'রলে কোন বিশেষ শিল্প বহিরাক্রমণ ভাল ক'রে রোধ কর্‌তে পারে, আর ফলে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত হয়, তখন সংরক্ষণশুল্ক সমর্থন ক'রতে আমাদের কোন আপত্তি থাক্‌বে না।"

এই ভাবেই দিন চল্‌ছিল। কিন্তু ১৯২৮ সনের নবেম্বর মাসে আরও একটু পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া গেছে। ঐ সময়ে নিউ ইয়র্ক সহরে "সংরক্ষণবাদী মার্কিণ শ্রমিক" নামে উক্ত সঙ্ঘের মধ্যেই একটি দল গ'ড়ে ওঠে। এর সভ্য-সংখ্যা আড়াই লাখ,—সমগ্র সভ্য-সংখ্যার শতকরা ৮ বা ৯ অংশ মাত্র। সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ম্যাথিউ ওল্ এর

সভাপতি। যে সব ট্রেড ইউনিয়ান দেখ্‌ছে যে, বিদেশ হ'তে মাল এসে তাদের শিল্পের অবস্থা খারাপ ক'রে শ্রমিকদের অবস্থা খারাপ ক'রছে, প্রধানতঃ সেইসব ট্রেড ইউনিয়ানই এই নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছে।

" এই নতুন প্রতিষ্ঠান চেষ্টা ক'রলে কি সঙ্ঘের সংরক্ষণ শুল্ক সম্বন্ধীয় নীতিটা ব'দ্‌লে যাবে? প্রবন্ধ*-লেখক শ্রীযুক্ত লাইল ডাব্লিউ কুপার বলেন যে, সে সম্ভাবনা কম। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘকে বোঝানো চাই যে, সংরক্ষণ শুল্কের সাহায্যে অধিকাংশ মজুরের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা সম্ভব হবে, অন্ততঃ তাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বজায় থাকবে, তবেই সঙ্ঘকে স্বমতে আন্‌তে পার্‌বে। কিন্তু লেখক সমগ্র সঙ্ঘের মত বদ্‌লানো সম্ভব হবে ব'লে মনে করেন না। তাঁর মত এই যে, আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমেই বাড়্‌ছে ব'লে সংরক্ষণ শুল্কের প্রতি অত্যধিক আসক্তি ক'মতে পারে; তাছাড়া, যে সব শিল্প শুধু সংরক্ষণশুল্ক পাঁচীলের আড়াল পেলে বাঁচতে পারে, সেগুলি খোলা আবহাওয়ায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতা স'য়ে টিঁকে থাক্‌তে পার্‌বে না, তাদের সংখ্যা ক্রমাগত ক'মে যাবে; অধিকন্তু, যে সব শিল্পের রপ্তানি-বাণিজ্য বেশী —যেমন ব্যাঙ্কিং—সেগুলি সংরক্ষণ শুল্ক বিশেষ পছন্দ করে না। সংরক্ষণ-শুল্কের প্রতি মার্কিণদের অত্যধিক আসক্তি ছিল; কিন্তু লেখক মনে করেন যে, এই সব কারণে তার একটা প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই আরম্ভ হবে। সুতরাং সংরক্ষণ শুল্কের পক্ষপাতী প্রতিষ্ঠানের সফল হবার আশা কম। লেখক নতুন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল ব'লে মনে করেন না।

---

* আমেরিকান্ ইকনমিক রিফিউ; জুন, ১৯৩০।

সোভিয়েট রুশিয়ার আর্থিক নীতি

রুশিয়ায় সোভিয়েট শাসন স্থাপনের সময় লেনিন পূরাপূরি ধনসাম্য-বাদ চালাতে ও পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন ক'রতে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু দিন কয়েক পরে, দেশ তখনও তৈরী হয়নি বুঝে, তিনি পিছু হ'টতে বাধ্য হন, এবং নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে চাষবাস করা ও কেনাবেচা করা বে-আইনী নয়, এই মর্ম্মে এক নতুন আর্থিক নীতি জারি করেন। অনেকে তখন ভেবেছিলেন যে, বুঝি বা ধনসাম্য-বাদ ছেড়ে রুশিয়া পুঁজিতন্ত্রের দিকে আবার যাত্রা সুরু ক'রলে। প্রবন্ধ*-লেখক শ্রীযুক্ত ক্যালবিন বি হুবার বলছেন যে, সে আশা সুদূরপরাহত। রুশিয়া ধনসাম্যবাদ স্থাপনে বদ্ধপরিকর, কেবল অবস্থা-বৈগুণ্যে ত পারছে না। এর উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখাচ্ছেন যে, ১৯২৯ সনের শেষের দিকে চাষবাসকে ব্যক্তিগত ব্যাপার না রেখে সম্পূর্ণ সরকারী ও সাধারণের ব্যাপার ('কালেক্‌টিভাইজেশান') ক'রবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা হয়; সে জন্যে সম্পন্ন কৃষকদের ওপর যথেষ্ট বল প্রয়োগ হয়, তাদের চাষবাসের অনেক সাজ-সরঞ্জাম কেড়ে নেওয়া হয়, কৃষিজাত জিনিষের কেনাবেচা একেবারে বন্ধ থাকে। যারা ভোট দেবার অধিকারী তাদের টিকিট দেওয়া হয়; সেই টিকিট দেখালে তবে গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা যায়। এ ত গেল চাষের কথা। যারা ব্যক্তিগতভাবে দোকান চালাচ্ছিল, তাদের দোকান বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, তাদের মালপত্র সরকার নিয়ে যায়। লেনিন শেষ নীতিতে কাজের শ্রেণী-অনুযায়ী মাহিনা নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, কিন্তু সে নীতি রদ্ ক'রে ব্যবস্থা

---

* ইকনমিক জ্যার্ণাল; জুন, ১৯৩০।

হয় যে, কারখানার মজুরদের অর্জ্জিত অর্থ সমান ভাবে বণ্টিত হবে, না হয় প্রয়োজনানুযায়ী ভাগ করা হবে।

এই ভাবে ষ্টালিন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ পূরাপূরি কমিউনিজ্‌ম চালাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন। কিন্তু এই বছরের (১৯৩০) গোড়ার দিকে,—যখন তাঁরা অনেকটা কৃতকার্য্য হ'য়েছেন,—তাঁরা স্থির কর্‌লেন যে, উৎপাদন-প্রণালী ও উৎপন্ন ধনসম্পদ্‌ সর্ব্বসাধারণের ব্যাপার করা (কালেকটিভাইজেশান্‌) বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা যখন অল্প, তখন জোর-জবরদস্তি ক'রে দ্রুত অগ্রসর না হওয়াই ভাল, বরং একটু পিছু হটে পরে আস্তে আস্তে অগ্রসর হলেও চল্‌বে। এখন ধান ছাড়া আর সব কৃষিজাত জিনিষ নিয়ে কেনাবেচা ক'রবার অনুমতি দেওয়া হ'য়েছে। ইউক্রেন আর ককেসিয়া, এই দুই দেশ শস্য-উৎপাদনে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে—এই দুই জায়গা বাদে অন্য জায়গায় চাষারা এখন নিজেদের লাভের জন্যে ফসল উৎপাদন ক'রতে পারে।

সুতরাং রুশিয়া আবার একটু পিছু হটেছে। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক বলেন যে, এ পিছু হটা নামমাত্র। রুশিয়া পূরাপূরি কমিউনিজ্‌মের জন্য পাগল। সুযোগ পেলেই রুশিয়া আবার সেদিকে এগুবে।

স্থানবদ্ধ শিল্প-সমাবেশের সুফল

বস্ত্র-শিল্প, লৌহ-শিল্প, কয়লা-শিল্প—প্রত্যেকটির স্ব স্ব প্রধান নানা ফার্ম্ম বা কোম্পানী আছে। প্রত্যেক ফার্ম্ম বা কোম্পানীর অধীনে এক বা ততোঽধিক ফ্যাক্টরী চল্‌ছে।

এক শিল্পের অন্তর্গত অনেকগুলা ফার্ম্ম স্থান-বিশেষে বদ্ধ হ'লে, ইংরেজীতে তাকে বলে "লোক্যালাইজেশান্ অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্"। এই "লোক্যালাইজেশানে"র সুবিধা অনেক। কারখানাওয়ালাদের মধ্যে নানারকম আলোচনা চালানো সম্ভব হয়; মজুরেরা এক কারখানায় কাজ হারালে অন্য কারখানায় কাজ পেতে পারে; কলকারখানার আওতায় সাধারণ অভাব মেটাবার জন্যে অনেক ছোটখাটো কারখানা ও দোকান গ'ড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু 'লোক্যালাইজেশানে'র একটা দোষ এই যে, এতে বেকার সমস্যাটাকে তীব্র করে। কথাটা উল্টে বলাও চলে যে, একই স্থানে নানা শিল্পের সমাবেশ হ'লে বেকার-সমস্যা হ্রাস হয়।

যেখানে শিল্পের বৈচিত্র্য সেখানেই নানা শিল্পের আবির্ভাব হয় ব'লে বেকার কমে। বেকার কমবার অপর এক কারণ এই যে, কোন স্থানের শিল্পজীবনে বৈচিত্র্য থাকৃলে সেখানকার কারখানাওয়ালাদের মধ্যে নতুন নতুন লাইনে যাবার সাহস ও ক্ষমতা বেশী হয়। অন্য একটা কারণ এই যে, শিল্পজীবনের বৈচিত্র্য থাকাতে সেই স্থানটি নানাভাবে জাতির আর্থিক জীবনের সঙ্গে জড়িত থাকে, এবং সেই জন্যে নানা প্রকারের শিল্প-বাণিজ্যকে সেই স্থানে আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ হয়।

যেখানে শিল্প-জীবনের বৈচিত্র্য বেশী সেখানে কোন শিল্পের অবস্থা

খারাপ হ'লে মজুরেরা সে শিল্প ছেড়ে অন্য শিল্প অবলম্বন ক'রে আগের মত রোজগার না করুক, অন্ততঃ প্রাণটা বাঁচাতে পারে। যেখানে নানা শিল্পের অবস্থান, সেখানকার মজুরদের গতিশীলতাও বেশী, অর্থাৎ এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে যাবার জন্যে যে উদ্যম ও সাহস দরকার হয়, তাও বেশী।

একটি প্রবন্ধে * এই সব কথা আলোচনা ক'রবার পর শ্রীযুক্ত আলেন বলেন যে, স্থানে স্থানে এমনভাবে নানা শিল্পের সমাবেশ করা কর্ত্তব্য যে, যতদূর সম্ভব জাতির শ্রমশক্তির অপচয় নিবারিত হয়।

* ইকনমিক জ্যার্ণাল ; জুন, ১৯৩০।

নিখিল-জগৎ বাণিজ্য-আদালত

যুদ্ধের পর হ'তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার শুল্ক দেয়াল অনেক উঁচু ক'রেছে। তার ফলে বিদেশীরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইচ্ছামত মাল বেচ্‌তে পার্‌ছে না। যারা দেনদার তাদের দেনা শোধ দিতে হবেই অথবা সুদ পাঠাতে হবেই। কিন্তু মাল পাঠানোতে বাধা হওয়ায়, তারা সোনা পাঠাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে বেশী সোনা জড় হওয়ায় 'স্পেকুলেশন' বেড়েছে।

এ দিকে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও এক একটা শিল্পে এক একটা প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান সারা শিল্পের ওপর প্রায় একাধিপত্য ক'রছে বল্‌লেই চলে। প্রত্যেক শিল্পের কার্য্যকলাপ বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলা বিশেষরূপে দর শাসন ক'র্‌ছে। এবং তাদের নির্দ্দিষ্ট দরের নীচে কারুকে বেচ্‌তে দিচ্ছে না। যদি কেউ বেচে, তার সঙ্গে দরের যুদ্ধ ঘোষিত হয়। এক এক শিল্পের ভাগ্য এ ভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান দ্বারা চালিত হওয়ায়, এবং দেশের বাহির হ'তে প্রতিযোগিতা না থাকায়, উৎপাদনের পরিমাণ খুব বাড়ছে। অথচ বিক্রয় সেই পরিমাণ বাড়ছে না। মার্কিণ শিল্পীরা তাঁদের জমানো টাকা থেকে বিজ্ঞাপনের জন্য যথেষ্ট খরচ করালেন। তাতে অবস্থা ভাল হ'লেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। কিস্তিবন্দি-প্রণালীতে কেনা-বেচা চলতি হ'ল। কিন্তু যতদুর জানা যায়, অনেক সময়ে নিয়মিতভাবে কিস্তির টাকা আদায় হয় না। বিদেশেও সব শুল্কের পাঁচিল উঁচু কর্‌ছে কাজেই বিদেশে মাল বেচার ক্ষেত্রও ক্রমেই সঙ্কুচিত হ'য়ে আস্‌ছে।

এই সব কথা আলোচনা ক'রে শ্রীযুক্ত হাষ্টন্ টমসন্ বলেন যে, শুল্ক ইচ্ছামত বাড়ালেই হবে না। তার ফলাফল কি রকম হয়, সে বিষয়ে রীতিমত গবেষণা করা দরকার। অবশ্য এর জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে ট্যারিফ্ কমিশন আছে। কিন্তু, কোন শুল্ক বাড়ানো উচিত কি না, তা বিচার ক'রবার সময় ট্যারিফ কমিশন আমেরিকার কথাই বেশী ক'রে ভাবে। শ্রীযুক্ত টমসনের মতে তা কর্‌লে আর চল্‌বে না। বিদেশের ওপর প্রভাবটাও দেখ্‌তে হবে। জার্ম্মাণদের ক্রয়-শক্তি কমাতে তারা ডেন্মার্কের মাখন আমদানি কমিয়ে দিলে। তাতে ডেন্মার্ক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লাখ পাউণ্ডের জায়গায় ৮০ লাখ পাউণ্ড রপ্তানি বাড়িয়ে দিলে। রপ্তানি-বৃদ্ধি দেখে মাখনের উপর যে শুল্ক আছে, তা পাউণ্ড-প্রতি আড়াই সেণ্ট থেকে ৬-সেণ্টে বাড়িয়ে দেওয়া গেল। এতে মার্কিণ চাষীদের হয়ত সুবিধা হ'ল। কিন্তু ডেন্মার্ক এই ধাক্কা খেয়ে স্থির কর্‌লে যে, সে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলার বীজের কেক্ কিন্‌বে না, তার বদলে জার্ম্মাণি থেকে ফ্লাক্‌সের বীজের কেক্ কিন্‌বে। এর ফলে, মার্কিণ চাষীরা যেমন একদিক্ থেকে লাভ কর্‌লে, অপর দিকে তেমনই তাদের লোকসান হ'ল।

সেই জন্যে, শ্রীযুক্ত টমসন্ প্রস্তাব কর্‌ছেন যে, সারা জগৎ জুড়ে একটা বাণিজ্য-আদালত স্থাপন করা হ'ক। যখনই কোন আমদানি-শুল্ক স্থাপন করা বা বাড়ানো হবে, তখন তার ফলে কোন্ দেশের কি রকম ক্ষতি হ'তে পারে, কোন্ দেশ কি রকম প্রতিশোধ নিতে পারে, আর এই সব আলোচনা ক'রে শুল্ক স্থাপন করা বা বাড়ানো উচিত কি না, তা আদালত জানাবেন। আদালতের রায়ে ও সিদ্ধান্ত সারা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এই আদালতের মতামত যে কোন দেশকে মানতে বাধ্য করা হবে, তা নয়। কিন্তু বিশেষ শুল্ক স্থাপন বা বাড়ানোর আন্তর্জ্জাতিক ফলাফল বুঝে কোন দেশ সহজে আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে সাহস কর্‌বে না। তার

ফলে, বোকার মত অথবা সকল দিক্, বিশেষতঃ আন্তর্জ্জাতিক ফলাফল, ভাল ক'রে বিবেচনা না ক'রে শুল্ক-বৃদ্ধি করার প্রবণতা অনেকটা বাধা পাবে।

শ্রীযুক্ত টমসন্ এই সম্পর্কে আরও বলেন যে, বাণিজ্যরাজ্যের ধুরন্ধরদের আর একটা দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। বাণিজ্যের উত্থান-পতন ভোক্তাদেরই ক্রয়-সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কাজেই তাঁদের কার্য্য কলাপ যাতে ভোক্তাদের ওপর অত্যাচারে পরিণত না হয়, বরং তাঁরা যাতে ভোক্তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেতে পারেন তার জন্যে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সমাপ্ত